প্রথম অধ্যায়

কলিকাতায় শ্রীম

মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। দ্বিতলের সিঁড়ির পাশের ঘর। শ্রীম মেঝেতে মাদুরে পূর্বাস্য বসিয়া আছেন। ভক্তগণ সম্মুখে উপবিষ্ট। কয়েক মাস স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করায় শ্রীম-র শরীরের বেশ উন্নতি হইয়াছে। লংক্লথের পাঞ্জাবী পরিয়া সহাস্য বদনে ডাক্তার বক্সী, উকীল ললিতবাবু, ভাটপাড়ার ললিতবাবু, ছোট জিতেন প্রভৃতির সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। ক্রমে বড় অমূল্য, রমণী, মনোরঞ্জন আসিলেন। আরও অনেক ভক্তগণে গৃহ পরিপূর্ণ। বিনয় মঠে গিয়াছেন।

আজ প্রাতঃকালে শ্রীম মিহিজাম হইতে সাত আট মাস পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সারাদিনই সাধু ও ভক্তগণ যাতায়াত করিতেছেন। বহুদিন পর প্রিয় সন্দর্শনে ভক্তগণের আনন্দের শেষ নাই। শ্রীম-র বাসস্থল যেন আজ ত্রিবেণী-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে — শ্রীম, সাধু ও ভক্তগণের সম্মিলনে।

এখন সন্ধ্যা সমাগতা। শুকলাল, ব্রহ্মচারী রমেশ ও মোহন গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুকলালের সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইলে শ্রীম বলিলেন, 'কই, উনি কোথায়?' অন্ধকারে মোহনকে দেখিতে না পাইয়া এই প্রশ্ন করিলেন। মোহন অগ্রসর হইয়া সবিনয়ে উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞে এই আমি — এইখানে'।

শ্রীম (মোহনের প্রতি, ললিতকে দেখাইয়া) — এই দেখুন, ইনি ওকালতী করেন। এ পড়াতে দোষ নাই। তবে অর্থের জন্য সত্যকে মিথ্যা করা ভাল নয়। পড়া ভাল, প্র্যাক্টিস ভাল নয়। যদি বল 'ল' মিথ্যা পড়ে লাভ কি? এর উত্তর — না পড়াটা কি সত্য, এও যে মিথ্যা! ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা — সে এক অবস্থার কথা। শেষ কথা। যতদিন না ঐ অবস্থা লাভ হয় ততদিন এইসব নিয়ে থাকা।

তর-তম আছে। পড়া টড়া নিয়ে থাকা সহায়ক। ঈশ্বর লাভ হলে এ সবের দরকার হয় না। তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন এসব নিয়ে থাকা ভাল।

শ্রীম (সহাস্যে) — হরি মহারাজের নিকট একজন এসেছে সন্ন্যাস নিতে। জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন, এর স্ত্রী পুত্র কন্যা সব রয়েছে। হরি মহারাজ বললেন, 'এদের কষ্টে ফেলে কেন আসতে চাচ্ছ?' লোকটি উত্তর করলে, 'মশায়, ওসব স্ত্রী পুত্র মিছে।' আরো অনেক বড় বড় সব কথা বলতে লাগলো। ইনি সব শুনে বললেন, 'আচ্ছা, এও তো মিথ্যে। বিয়ে করেছো ছেলে পুলে হয়েছে — এখন এদের ফেলে চলে আসা? কি বল? একি আর সত্য এদের না দেখা?' ওদের কথা আলাদা যারা বিয়ে করে নি। তবুও বাপ মা থাকলে তাঁদের সেবা করা উচিত।

সন্ধ্যার আলো আসিয়াছে। শ্রীম যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। আর মৃদু হাততালি দিয়া 'হরি বোল, হরি বোল' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। তৎপর সকলে কিয়ৎকাল ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এইবার বড় জিতেনবাবু ও কবিরাজ বিরিঞ্চিবাবু আসিয়াছেন। বড় জিতেন ওকালতী পাশ — হাইকোর্টের বেঞ্চক্লার্ক। খুব ভক্তিমান আর সদাশয় ব্যক্তি। শ্রীম-র সহিত ইঁহাদের প্রাথমিক কুশল প্রশ্নাদি হইয়া গেল। ছোট জিতেন বড় জিতেনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'জিত্‌দা, আপনি কি বাড়ি বদলিয়েছেন?' বড় জিতেন উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ ভাই। বিশ বছর হয়ে গেল বৃন্দাবন মল্লিক লেনে, কিন্তু মনে হচ্ছে সেদিন।' এই কথা শুনিয়া শ্রীম অমনি কথার মোড় ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'আপনার বাহাদুরী নাই তা'তে। তিনি আপনাদের রেখেছেন তাই রয়েছেন। ভাইটি চলে গেল, তা তিনিই আর একটা সুবিধা করে দেবেন।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কত রকম প্রকৃতি আছে। কেউ কেউ ছিনা জোঁকের মত আছে (সংসারে), আর তলিয়ে যাচ্ছে। সত্ত্ব, রজঃ, আর তমঃ — এই তিন গুণের সংমিশ্রণে কত বিভিন্ন প্রকৃতি হয়েছে এই প্রকৃতিকে জয় করাই problem of life (জীবন সমস্যা)।

প্রকৃতির স্রোত একদিকে চলছে। উল্টো দিক থেকে আর একটা স্রোত এলে তবে তাকে জয় করা যায়। উল্টো স্রোত আসে তাঁর শরণাগত হলে। Poison and its antedote (বিষ ও তার প্রতিকার) এই দুই-ই তিনি করেছেন। Antedote (প্রতিকার) হলো সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস, তীর্থ, তাঁর কাছে প্রার্থনা — এই সব।

শ্রীম (কার্তিকবাবুর প্রতি) — হাঁ ডাক্তারবাবু, গীতার কি শ্লোকটা?

কার্ত্তিক — দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(গীতা ৭:১৪)

শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের সমস্ত গীতা কণ্ঠস্থ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই দেখুন, ভগবান বলেছেন, আমার মায়া 'দুরত্যয়া' — অর্থাৎ পার হওয়া প্রায় যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র আমার শরণাগত হ'লে হ'তে পারে। মায়া পার হওয়া কিনা সংসার জয় করা, প্রকৃতি জয় করা। এ শুধু তাঁর কৃপায় হ'তে পারে। তাছাড়া হয় না। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।

দেহ ধারণ করলে internal (ভিতরে) কাম, ক্রোধ, লোভ — আর external (বাহ্য) শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য — এসব থাকবেই। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করবে। ঠাকুর দশ মাস ক্যানসারে ভুগলেন। উঃ, কি কষ্ট! কেন এ ভোগ? শিক্ষা দিতে — দেহ ধারণ করলে থাকবেই এসব। বকুলতলায় একবার কাম হলো। মাকে বললেন, 'মা, এ যদি হয় গলায় ছুরি দেব।' দেখুন, এমন যে অবতার তাঁরও কাম হয়, রোগ হয়। একদিন ঠাকুর বললেন, 'কুমড়ো ফুল স্বপ্নে দেখেছি।' একজন ভক্ত বললেন, 'এনে দেবো কি খেতে?' তিনি উত্তর করলেন, 'না, কত কি ছাইভস্ম দেখি স্বপ্নে।' দেখুন, দেহ ধারণ ক'রে অবতারও ঠিক মানুষের মত সব করছেন — লাউ কুমড়ো স্বপ্নে দেখছেন। একেই বলে, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। কিন্তু তবুও ভগবানকে চাই।

প্রকৃতিও তিনি করেছেন, আবার প্রকৃতিকে জয়ও তিনি করান।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — এই তিনগুণ প্রকৃতির উপাদান। এদের কর্ম জীবকে সংসারে বদ্ধ করা। এদের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায়ও তিনি বলে দিয়েছেন। বলছেন, 'হে জীব, আমার শরণাগত হও, তা হলেই কেবল এই দুরতিক্রমণীয় মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে।' আর পথ নাই, এই এক পথ — 'শরণাগতি'।

তপস্যার মানে কি? — 'প্রকৃতি জয়ের চেষ্টার নামই তপস্যা'। সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস, নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বলা। এসব করতে করতে তাঁর কৃপা হলে প্রকৃতি জয় হয়। প্রকৃতি জয় মানেই 'ঈশ্বরদর্শন'।

শ্রীম — কিছুকাল নির্জনবাস ভাল। ঠাকুর তাই করতে বলতেন। এসব শহরের গোলমাল থেকে নির্জনে থাকা ভাল। তিনি বলতেন, ও-দেশে (কামারপুকুরে) গুড়ের নাগরি ছেঁদা করে তার নিচে গামলা বসিয়ে রাখে। ছ'মাস পরে কলসীর গুড় সব মিছরী হয়ে যায়। রস সব পড়ে যায়। হলোই বা রাত্রে, এই যেমন অনেকের discharge (বীর্যক্ষয়) হয়, তা বলে কি স্ত্রীসঙ্গ করতে হবে নাকি? বয়ে গেল। ও রকম বের হয়ে যা থাকবে, তা মিছরী হয়ে থাকবে।

তাই কিছুদিন এই বিষয়ের মধ্য থেকে — রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের ভিতর থেকে মনকে তুলে নিয়ে নির্জনবাস করতে হয়। ওর মধ্যে দিন রাত থাকলে তলিয়ে যাবে। Sights and scenery-তে (দর্শনাদিতে) মনে সব ভোগবাসনা উদয় হয়। ঠাকুর বলতেন, 'মাঠে দুটো গর্ত রয়েছে। এর একটার জল শুকিয়ে গেল, অপরটাতে রয়ে গেল।' কেন, এর মানে কি? না যেটাতে জল রয়ে গেল সেটার কাছ দিয়ে হয়তো নদীটদী বয়ে যাচ্ছে। তা থেকে জল ছেঁচিয়ে আসছে। একটার ফিডার (feeder — অববাহিকা) আছে নদীটদী, অপরটার তা নাই, তাই জল শুকিয়ে গেছে। এই রকম এ সবের ভিতর থাকা। বিষয় ফিডার। তা'তেই মন ডুবে যায়। বিষয়ের নামই মায়া। তাই নির্জনে থাকতে বলতেন। বিষয় থেকে তফাতে থাকলে ভিতর শুকিয়ে যায় — dross (ময়লা) সব পড়ে যায়, মন crystallised (নির্মল) হয়ে যায়। নির্মল মনে তাঁর দর্শন হয়।

ঠাকুর বলতেন, সাধু সন্ন্যাসীরা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দর্শন করবে না। গৃহস্থের বাড়িতে থাকবে না। Sights and scenery-তে (সঙ্গপ্রভাবে) ভোগবাসনা মনে আসে, এইজন্য। যে ঈশ্বরকে চায় এমন সাধু একলা থাকে — কারো সঙ্গে নয়।

গৃহস্থের সঙ্গে এক বিছানায় বসা, এক মশারীতে শোয়া উচিত নয়। এতে নেমে যায় মন। পশ্চিমের সাধুরা এক আসনে গৃহস্থদের বসতে দেয় না, পাছে এদের সংস্পর্শে মন মলিন হয়ে যায় তাই। এতে তাদের দোষ নাই। উভয়ের কল্যাণের জন্য এ নিয়ম ভাল।

প্রবর্তক যারা তাদের কত বেছে চলতে হয়। সবেতেই 'নেতি নেতি' করে যেতে হয়। প্রথমে ত্যাগ করতে হয়। ভগবান দর্শন হলে তখন ভোগ করতে পারা যায়। কিন্তু আগে সব ত্যাগ। অনেক ছাড়তে হয় beginners-দের (প্রবর্তকদের)। নচিকেতা কিছুই নিলে না। যম বললেন, রাজ্য নেও — 'আজ্ঞে না'। — 'স্ত্রী, পুত্র, চিরজীবিকা।' তাতেও ঐ উত্তর — 'আজ্ঞে না, কিছুই চাই না। আত্মজ্ঞান, শুধু এইমাত্র চাই।'

শ্রেয়, প্রেয় দু'টি আছে। শুধু শ্রেয় চাইতে হয়। শ্রেয় মানে ঈশ্বর। প্রেয় বিষয়ভোগ। নচিকেতা তাই শ্রেয় চাইলেন, প্রেয় নয়।

ভোগ কে করতে পারে? — যার সব ত্যাগ হয়েছে, যার ভগবান দর্শন হয়েছে। এর আগে সব ছাড়তে হয়। যোগবাশিষ্ঠে আছে, কচ বহুকাল ধরে নির্বিকল্প সমাধিতে থেকে নেমে এলেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কি দেখছেন?' 'সবেতেই তিনি রয়েছেন ওতপ্রোতভাবে' — এই উত্তর করলেন। সবই তিনি। ঠাকুরও বলতেন, 'এ অবস্থার পর ভোগ করলে দোষ নাই। তখন ভোগ, ভোগ হয় না।'

পঞ্চবটীতে একটা কুকুর গেল ঠাকুরের কাছে। অমনি ভাবলেন, মা ওর মুখ দিয়ে কিছু বলাবেন বুঝি। সবেতেই মা।

অনেক কষ্টে ছাদে উঠলে সিঁড়ির নিচের খবরও তখন বলা যায়। প্রথম কষ্ট করতে হয়। সমাধির পর, 'তিনিই সব' — এ জ্ঞান হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হেগেলিয়ান ফিলজফির মত — তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। উহা অবশ্য borrow (ধার) করা,

আমাদের বেদবেদান্তের ট্র্যানস্লেশন (অনুবাদ) থেকে। তার আবার exponents (প্রচারক) আছে আমেরিকায়। ওরা এর মানে করে, ঈশ্বরই যখন সব হয়ে রয়েছেন, তখন খুব ভোগ কর এ সংসার, যত পার (সকলের হাস্য)। ওরা তো জানে না, এ কথা কেমন করে এলো। ওদের কাছে borrowed idea (ধার করা কথা) এই সব। প্রথম কত ত্যাগ করতে হয়েছে। তবে তো এ দেশের ঋষিগণ ভগবান লাভ করে এ কথা বলেছেন। ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ — একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতস্বরূপ যে ঈশ্বর তাঁকে লাভ করা যায়। সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সাধুদের, প্রবর্তকদের সব ত্যাগ করতে হয়। সর্বস্বত্যাগ আর তাঁ'তে শরণাগতি।

ঠাকুর বলতেন, তিন রকম মানুষ আছে এ সংসারে। এক রকম আছে তারা অন্য কিছু চায় না — শুধু ঈশ্বরকে চায়, শুধু যোগ। এরাই ফার্স্ট ক্লাস — যেমন শুকদেব। আর এক রকম আছে তারা যোগ ভোগ দুই-ই চায়। এটিও ভাল। কত বড় বড় ভক্তরা রয়েছেন এই ক্লাসে — যেমন পাণ্ডবগণ। আর একদল শুধু ভোগ চায়। এরা ঈশ্বরকে চায় না। এ দলের লোকই বেশী। ওদিকে (মিহিজামে) কয় মাস থেকে দেখে এলাম জানোয়ারগুলোর ভেতর শুধু এই ভোগভাব রয়েছে। গরু, মোষ, কুকুর, বেড়াল এরা শুধু আহার নিয়ে ব্যস্ত দিন রাত। আহার, বিশ্রাম আর সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা, এই এদের কাজ। এ ক্লাসের মানুষে আর পশুতে প্রায় তফাত নাই। মানুষশরীরে ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে ইচ্ছা করলে, এইটুকু মাত্র তফাত।

একটা কেনেস্তারার নিচে একটা frog (ব্যাঙ) রয়েছে। যেই টিনটা উঠিয়েছি, অমনি তার দুটো বাচ্চার একটা চলে গেল। অপরটাকে পাছে মারি, তাই মা-টা লাফ দিয়ে গিয়ে ওটার উপর পড়ে রইল (হস্ত প্রসারণ করিয়া)। এতে তাঁরই হাত দেখলাম। তিনিই হাত বাড়িয়ে একে রক্ষা করছেন। একদিন একটা ছাগলের বাচ্চা কোলে তুলে নিলুম। মা-টা ডাকতে ডাকতে কাছে এসে দাঁড়াল। অন্য সময় শব্দ করলে দূরে সরে যায়। আজ কাছে দাঁড়িয়ে রইলো — নড়ছে না, ভয় নাই আজ। এসব অমূল্য জিনিস দেখে

এলাম এবার। ওসব স্থানে না গেলে এসব বোঝা যায় না। এই যে বেদাদি শাস্ত্র, এসব কি এখানকার মত স্থানে বসে লেখা হয়েছে! ওখানকার মত নির্জন মাঠে, বনে বসে লিখেছেন। এই যে 'ওষধি' 'বনস্পতি' — এসব কথা আছে শাস্ত্রে, শহরে এ হয় না। 'সবেতেই তাঁর হাত' — এবার এই দেখে এলাম। যারা ভগবানের জন্য ব্যাকুল তারা নির্জনে ঐ সব স্থানে থাকে। তাদের থাক্ই আলাদা — যেমন মৌমাছি শুধু ফুলেতেই বসে। অন্য মাছি পচা, ঘা, বিষ্ঠাদিতেও বসে। যারা শুধু তাঁকে চায়, তারা মৌমাছি।

ঠাকুর বলতেন, 'বিষ্ঠাতেও ছোলা পড়লে সেই ছোলাতে ছোলা গাছই হয়। আর সেই ছোলা ঠাকুরপূজায় লাগে।' এর মানে হলো, যার যেমন প্রকৃতি, তেমনি কাজ করবে। জন্ম যেখানেই হোক না কেন, ঈশ্বরভক্ত দেবসেবায় লাগবে। ঈশ্বরদর্শনে কুলশীলের অপেক্ষা থাকে না। ধনী-দরিদ্র ভেদ নাই। রাজা-প্রজা, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ভেদ নাই। উচ্চ-নীচ নাই সেখানে। ঠাকুর বলতেন, 'চাঁদ যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলের অতি আপনার, যে চায় সে-ই পায়।'

কলিকাতা। ১০ই মে, ১৯২৩ খ্রীঃ। ২৭শে বৈশাখ ১৩৩০ সাল।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাদশমী।

ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ — কৈবল্য উপনিষদ ১/২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতার আসেন ভক্তদের কর্ম কমাতে

১

সন্ধ্যা প্রায় সাতটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। বিনয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। পরনে মিলের দুভাঁজ ধুতি, মুক্তকচ্ছ। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। পাশেই বসিবার ঘর। ভক্তগণ বসিয়া আছেন। ছোট জিতেন, ডাক্তার, ললিত উকীল, ছোট নলিনী, শান্তি ও যোগেন। শুকলাল, রমণী, বীরেন এটর্নি, জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন এক সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। নবাগত বহু ভক্তে গৃহ পূর্ণ।

শ্রীম অল্পক্ষণ পর গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্বাস্য হইয়া পশ্চিম দেয়ালের গায়ে মাদুরে উপবিষ্ট হইলেন। সম্মুখে মেঝেতে ভক্তগণ বসিয়াছেন। আর পূর্ব দেয়ালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রতিমূর্তি বিলম্বিত। ঘরে আলো আসিতেই সকলে কিয়ৎকাল ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। কমল শ্রীম-র আদেশে ভজন গাহিতেছেন —

কে তুমি এলে হে এবার প্রেমিক উদাসীর ভানে।
তোমার যমুনা সরযূ কোথা লীলা গঙ্গাপুলিনে॥

আবার গাহিলেন —

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম।
অপূর্ব শোভন ভবজলধির পারে, জ্যোতির্ময়॥

শৈলেন গাহিতেছেন —

ফিরিয়ে নে মা তোর বেদের ঝুলি।
ও মা মজাস্‌নে আর আমায় কালী॥

শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে ভাববিভোর চিত্তে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, 'গান কি কম জিনিস গা! নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে গান গাইলে, ব্যাকুল হয়ে, ভগবান দর্শন হয়। রামপ্রসাদের হয়েছিল।' কাশীপুর বাগানে শেষ অবস্থায় বলেছিলেন, 'মা বদলে দিচ্ছেন। এখন তুমি আমি নাই, সবই দেখছি তিনি।' একটি সেব্য আর একটি সেবক — এভাব আর নাই, সবই সেব্য। কর্ম কমে গেছে, এখন লীলা ফুরাবে তাই এ অবস্থা। পূর্বের নৃত্য গীত, কথায় কথায় 'তুমি মা, আমি ছেলে' — এসব আর নাই এখন। সব চুপ, সব শান্ত। কয়দিন পরই দেহ গেল।

বড় জিতেন ইতিমধ্যে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি শুনিলেন, 'এখন তুমি-আমি নাই, সবই দেখছি তিনি।' তাই তিনি প্রশ্ন করিতেছেন প্রতিবন্ধক দূর করিবার ইচ্ছায়।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — মশায়, 'আমি'-টা যায় কি করে? এর জ্বালা যে অস্থির করে তুলছে। এখানেই শোনা গেছে 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি', আবার 'জীবকোটি' 'ঈশ্বরকোটি' — এগুলি কি, বুঝিয়ে দিন একবার!

শ্রীম (জিতেনের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, জীবের 'আমি' যায় না। ঈশ্বরকোটি, যেমন অবতারাদি, তাঁদের 'আমি' যায়। জীবের 'আমি' যখন যাবার নয়, তখন থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে — একথা বলতেন। আবার বলেছিলেন, জীব যেন অশ্বত্থ গাছ ; কেটে ফেল আজ, কালই আবার ফেকড়ী বেরোবে। অবতারাদি যেন মূলোগাছ, শেকড়শুদ্ধ উঠে আসে, 'আমি' থাকে না।

আমি মানুষ, আমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আমি অমুকের পুত্র, অমুক জাতি — এ হলো 'কাঁচা আমি'। আমি ঈশ্বরের দাস, ভক্ত, আমি তাঁর সন্তান, ইত্যাদি ভাব — কিংবা আমিই তিনি, এ হলো 'পাকা আমি'। ঠাকুর বলতেন, ভক্তের আমি, দাস আমি, ভাল। বজ্জাত আমিটাই যত খারাপ — যে 'আমি' দিনরাত বলে 'আমি অমুক, আমি তমুক'। জীবের যখন আমি যাবার নয়, তখন আর কি করা! তাঁর সঙ্গে যোগ করে রাখা — আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সব তিনি করেছেন। মানুষের এই যে

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি তাও তিনি করেছেন। আগেকার জাতিবিভাগ এই প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, করবো না বললেই হলো? তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার প্রকৃতিতে যুদ্ধ রয়েছে। তোমাকে তা করতেই হবে। তবে নিষ্কাম হয়ে কর, ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে। অনাসক্ত হয়ে সমস্ত ফল আমাতে সমর্পণ করে কর। তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্' (গীতা ৯:২৭)। এই পথ দেখিয়েছিলেন।

(ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর) — প্রকৃতির গতি বড়ই প্রবল। এ শক্তিও তাঁর দেওয়া। তাঁরই মায়াশক্তি জীবকে নানাভাবে নিযুক্ত করেছে। ওখানে (মিহিজামে) দেখে এলাম পশু-পক্ষী, গরু-মোষ, বিড়াল-কুকুর সবই প্রকৃতির শক্তিতে চালিত হচ্ছে। জানোয়ারগুলিকে দেখতুম সকাল থেকে কেবল খাচ্ছে। অবসর সময়ে তা-ই জাবর কাটছে। আবার এরই মধ্যে ঐটিও চলছে — reproduction, সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা। খাওয়া আর খাওয়া — এই জীবপ্রকৃতি। মানুষের আর ওদের সবই মিলে যাচ্ছে — দেবভাবটি ছাড়া। মানুষ-শরীরে ঈশ্বরকে ডাকা যায় — অন্য শরীরে তা প্রায় হয় না। আমাদের শরীরের ভিতর তিনটি শরীর আছে কিনা — স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ, তারপর মহাকারণ, অর্থাৎ ঈশ্বর। 'কারণ-শরীর' মানে spiritual body. ঠাকুর বলতেন, ভাগবতী তনু। এই 'কারণ-শরীর'-এর চিন্তা কেবলমাত্র মানুষ করতে পারে।

বড় জিতেন (সবিনয়ে) — শুনছি রোজ, বুঝতে পারি কই? কি করে হবে? ক্রমশঃ যে জড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে — এখন উপায় কি?

শ্রীম (ঝটিতি) — উপায় তো সব তিনি বলে দিয়েছেন। কতবার কত করে বলেছেন। পালনের চেষ্টা করে কই লোক? মণি মল্লিক, প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত ঠাকুরের কাছে যেতেন, সব শুনতেন আর মাঝেমাঝে বলতেন, 'মশায়, উপায় কি?' নূতন লোক, নূতন সাধু সবাই দেখা হলেই (ঠাকুরকে) ঐ এক কথাই বলতেন, 'উপায় কি'। উপায় তো ঠাকুর কতবার বলেছেন। কই, শোনে কে? তাঁর এক-একটি কথা এক-একটি মন্ত্র। সংস্কৃতে হলেই বুঝি মন্ত্র — বাংলায় হয় না? বেদ বেদান্ত সব আছে ওতে। কে শোনে? থাকুক তো তাঁর একটি কথা নিয়ে কেউ?

তিনি বলতেন, 'তাঁকে ডাকতে হয় বনে, মনে আর কোণে'। এই কথাটি নিয়ে থাকুক দেখি কেউ?

এত সব লোক আছে, কা'কেই বা বলি, কে করে? তিনি তো আসেনই এই জন্য। 'সম্ভবামি যুগে যুগে' (গীতা ৪:৮) — যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। কেন? — ভক্তদের তুলতে। ভক্তরা যখন বড্ড তলিয়ে যায় তখন তাদের তুলতে, তাদের পথ সোজা করে দিতে তিনি আসেন। কত সোজা করেছেন আবার কত নেমেছেন। বলেছেন তো, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, নির্জনবাস, তীর্থ — এসব করবে। এতদূর নেমেছেন যে তিন দিন নির্জনবাস করলেও হবে বলেছেন। মানে, তিন দিনে একটা taste (আস্বাদ) পাওয়া যাবে। পরে স্বেচ্ছায়ই যেতে চাইবে মন। এত ক'রে উপায় বলেছেন ঠাকুর — তা করে কই লোক? লোক কি বললেই করে? প্রকৃতি যে টেনে রেখেছে। সংসারীদের কি লজ্জা আছে? ভোগে ডুবে একেবারে বিড়াল-কুকুরের মত লজ্জা-শূন্য হয়ে গেছে।

তাঁর ইচ্ছা হলে অন্য রকম হয়। এই পাঁকের ভিতর থেকে পদ্মফুল ফোটে।

কেশববাবু, যারা তাঁর (ঠাকুরের) কাছে যেতো, তাদের বলতেন, 'ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) এতো যেয়ো না। মাঝে মাঝে যাবে। নয়তো কুটুস করে কামড়ে দেবে একদিন।' অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়ে নেবেন। এই কথা ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কেন, আমি কি তাদের সংসার ছেড়ে দিতে বলি? এ-ও কর, ও-ও কর, যোগ-ভোগ দুই-ই কর। বাবা, রক্ষে আছে, কলকাতার লোককে সব ছাড়তে বলা!' এখন দুই দিকই করুক, পরে যা হবার হবে। ছাড়তে হয় পরে নিজেই ছাড়বে তখন। এই যে এত করে বললেন ঠাকুর, তা ক'টা লোক শুনছে? প্রকৃতি উল্টো পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

২

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, আগেকার লোক

সব বিশ্বাসী ছিল। কর্তা কর্মচারীদের উপর minor matters (সাধারণ বিষয়) ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করতো। সংসারের minute (খুঁটিনাটি) সব দেখতে গেলে সময় কোথায়? ওদের ওপর ভার দিলে না হয় একশ টাকা বেশী লাগবে। কেউ কেউ আবার এমন, চাকরের সঙ্গে বাজারে যাবে ধামা নিয়ে। হয়তো দুই এক পয়সায় শাক-টাক আনবে। পয়সা বাঁচাতে বাজারে যায়। না হয়, ও নিলেই ক’পয়সা! আরে, ঈশ্বরের দাম কি ছ’ পয়সা! খালি ও নিয়েই আছে দিন রাত। তবে আর কি ক’রে সময় হয়? বুঝলেন, তাঁর উপদেশ — ‘কর্মচারীদের উপর ভার দাও। আর বাকী সময় তাঁর নাম কর।’ এমনতর বলতেন, ‘পূর্বে মুনি ঋষিরা সারা দিন রাত তাঁর নাম করেও তাঁকে লাভ করতে পারেন নাই।’ আর সংসারী লোক একটু leisurely (অবসর মত) ডেকেই তাঁকে পেয়ে ফেলবে। এতো সোজা নয়!

(জনৈক যুবকের প্রতি) — যাদের টাকা-পয়সা নাই তাদের না হয় সময় হলো না। স্ত্রী-পুত্র আছে, রোজগার করে তাদের খাওয়াতে হয়। কিন্তু যাদের খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, তারা কেন করে না বলতে পারেন, মশায়? তারাও বলে, এই সব বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে। আমি না দেখলে দেখে কে? মুখুয্যেকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিছুদিন না আসায়, ‘কেন আসেন নি’? তিনি উত্তর করলেন, ‘আজ্ঞে আমায় সব দেখতে হয় — বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি’। তার কিন্তু পুত্র কন্যা কেউ নাই। একি কাণ্ড! এত অবসর, ভাতের চিন্তা নাই, তবুও হয় না!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তিনি তো আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। করে কই লোক? তিনি বলেছেন, ‘আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, তিনি সব করে দেন।’ একদিন ঘরে অন্য কেউ নেই দেখে একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) বলেছিলেন, ‘এখানে অন্য লোক নেই কেউ, তাই তোমায় বলছি, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, তিনি সব করে দেন’। আরো কতদিন এই কথাই বলেছেন, ‘আন্তরিক হ’লে সব হবে’। (একটু চিন্তার পর) বাবুরাম বলেছিল ঠাকুরকে — তিনি তাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে থাকতে বলায়, — ‘নিয়ে আসুন না কেন?’

আন্তরিক বলেছিল তাই সাধু হলো। কতবার বলেছেন ঠাকুর, 'আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য, প্রেম-সমাধি এসব তাঁর ঐশ্বর্য।

ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হয়, আর প্রার্থনা করতে হয়। বলতেন, আমি যখন কাঁদতুম তখন লোক সব জড় হয়ে যেতো। আর আমায় বলতো, 'তোমার হবে'! তিনি খুব কঠোরতার ভিতর দিয়ে গেছেন কিনা! আর এঁর নিজের জীবনে সব ঘটেছে।

আন্তরিক তাঁকে ডাকতে ডাকতে কর্ম কমিয়ে দেন তিনি। কর্ম কম পড়লেই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে। ব্যাকুলতা এলেই সব হয়ে গেল। ঠাকুর বলতেন, যেমন অরুণোদয়ের পরই সূর্যোদয়, তেমনি ব্যাকুলতা হলেই তাঁর দর্শন হয়। কর্ম কম পড়া মানে ভোগান্ত। তাঁকে move (রাজী) করতে হলে ফি দিতে হয় যেমন কোর্টকে move (আবেদন) করতে হলে গোল্ড মোহর দিতে হয়। তাঁকে move (রাজী) করবার ফি, ভোগান্ত।

৩

শ্রীম (ভক্তগণের প্রতি) — অবতার আসেন কেন? না, কর্ম কমাতে। শ্রীকৃষ্ণ এসে এক ধাক্কা দিলেন। তিনি বললেন, যা কিছু কর নিষ্কামভাবে কর, ফলের আকাঙ্ক্ষা না ক'রে কর। অনাসক্ত হয়ে সব ফল আমাতে সমর্পণ ক'রে কর। 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।' 'মদর্পণম্' মানে আমার জন্য কর, তোমার নিজের জন্য নয়। তাহলে কর্ম তোমাকে আর বাঁধতে পারবে না। নয়তো কর্মের বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধ এসে আর এক ধাক্কা দিলেন। ঠাকুরও এসেছেন এই জন্যই — কর্ম কমাতে। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। অর্থাৎ 'আমি যুগে যুগে মানুষশরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হই, আর সোজা পথ বলে দি'। ভক্তরা যখন সব complicated (জটিল) হয়ে পড়ে তখনই তিনি নিজে আসেন। এতো আটকে পড়ে যে

তাঁকে নিজে আসতে হয়। তাঁর আসার পূর্বে লোক সব বৈদিক আচারাদি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে কেবল। অত জপ, এই পূজা, অতদিন ব্রত, উপবাস, অতদূর পায়ে হেঁটে চলতে হবে — এই সব বাহ্য নিয়মাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ধর্মের মূল যে ব্যাকুলতা, তাঁকে লাভ করবার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এইটি ভুলে যায় লোক। তিনি এসে এসব বদলে দেন, বাহ্য কর্ম কমিয়ে দেন। আন্তরিককর্ম — ব্যাকুলতা, বাড়িয়ে দেন। তিনি এসে বলেন, 'আমাকে আন্তরিক চিন্তা কর, আমার শরণ নাও, আমি তোমাদের সোজা পথে শীঘ্র নিয়ে যাব'। নূতন কাজে যাতে জড়াতে না হয়, সেই পথ দেখিয়ে দেন। অবতার যখন আসেন, বড্ড chance (সুযোগ), সব simplify (সহজ) করে দেন; shortest cut (সোজা রাস্তা) দিয়ে নিয়ে যান।

আর একটি কথা বলতেন ঠাকুর। এত সব কর্ম বিশ্ব পরিচালনে, কল্পান্তে সব গুটিয়ে নেন। সব নীরব। বলতেন, মায়ের ন্যাতা কাঁথার একটা হাঁড়ি আছে। তাতে সব বীজ তুলে রেখে দেন। (বড় জিতেনের প্রতি) দেখেন নি, গিন্নীরা সব রাখে? শশাবীচি, কুমড়ো বীচি, সমুদ্রের ফেনা এই সব হাঁড়িতে তুলে রেখে দেয়। ঠিক তেমনি। আবার যখন ইচ্ছে হয় তখন সব বীজ ছড়িয়ে দেন ব্রহ্মাণ্ডময় — তাঁর ভাবরাশি। কি majestic plan (উচ্চ পরিকল্পনা)! বাইরে থেকে মনে হয় যেন বিশ্ব automatic (স্বয়ং পরিচালিত), কিন্তু তা নয়। সব তাঁর ইচ্ছাতে চলছে। এইটি বুঝতে পারলেই problem (সমস্যা) প্রায় solved (সমাধান) হয়ে গেল। যখন যে অবস্থায়ই থাকা যাক আনন্দে থাকতে পারে মানুষ। তাঁর ইঙ্গিতে সব চলছে, এটা ভুলে যাওয়াই যত সব দুঃখের কারণ। তিনি যন্ত্রী, মানুষ যন্ত্র। (জগবন্ধুর প্রতি) এই যে সৌরমণ্ডল দেখছেন, যার জন্য আমরা বেঁচে আছি, সব তখন বন্ধ হয়ে যায়। এই সূর্য, নেপচুন (বরুণ), ইউরেনাস্ (প্রজাপতি), সপ্তর্ষি এতসব কাজ করছে, কল্পান্তে * সব নীরব। (স্বগতঃ) আবার মানুষের কি বুদ্ধি দিয়েছেন! বৈজ্ঞানিকরা কতক তত্ত্ব বের করে ফেলেছেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব,

---

কল্পান্ত — ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ (৪৩২ কোটি বৎসর)।

আকার, নেপচুন (বরুণ) দেড় হাজার বৎসরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে — এইসব কথা, এই বুদ্ধি দিয়ে স্থির করে ফেলেছে। এক বিন্দু বুদ্ধিতেই এই — আর তাঁর বিরাট বুদ্ধি কি ব্যাপার! বুঝতে পারলেন কিছু জিতেনবাবু? সপ্তর্ষি দেখবেন — ধ্রুবের চারদিকে ঘুরছে। রাতদিন ঘুরে four right angles (চার সমকোণ) তৈরি করে।

শ্রীম কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পুনরায় পূর্বানুবৃত্তি আরম্ভ করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অবতার এসে সব সোজা করে দেন। ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'Ask, and it shall be given unto you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you' (St. Matthew 7:7). আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে বল, অনলস হয়ে চেষ্টা কর, তিনি নিশ্চয় মনোবাসনা পূর্ণ করবেন — দর্শন দেবেন। ক্রাইস্ট এই সোজা পথ — প্রার্থনার পথ দেখিয়েছিলেন। এখন ঠাকুর এসেও এই কথাই বললেন, ‘আন্তরিক তাঁকে বল, তিনি সব করে দেবেন। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।’ ক্রাইস্ট নিরক্ষর ছিলেন, ঠাকুরও প্রায় তাই। ক্রাইস্টের সম্বন্ধে বড় বড় Doctors of Theology (ধর্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ) সবিস্ময়ে বলতেন, 'Is not this the carpenter's son? Whence then hath this man all these things? Never man spake like this man for he taught them as one having authority.' ইনি কি সূত্রধর জোসেফের পুত্র? নিরক্ষর হয়ে এত জ্ঞান কোথা থেকে এলো! আমরা তো এমন গভীর জ্ঞানের কথা কোথাও শুনি নাই। তখন তাঁর বয়স ছিল বার বৎসর মাত্র। ঠাকুরের কাছেও বড় বড় পণ্ডিতগণ কেঁচো হয়ে থাকতো। দিগ্বিজয়ী লোক হাত জোড় করে বসে থাকতো। অবতার যখন কথা কন, তখন জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

৪

শ্রীম কি ভাবিতেছেন; পুনরায় কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ‘ব্রহ্ম’ বৃহ্ ধাতু থেকে হয়েছে, মানে

বড় জিনিস। ‘জন্মাদ্যস্য যতঃ’ বলেছেন। যা থেকে জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ হয় তাঁর নাম ব্রহ্ম। তিনিই সব করেন। আবার সব গুটিয়ে নেন। তাঁ থেকেই আসে তাঁ’তেই যায়। তিনি কর্ম তুলে রাখেন — মাকড়সার মত। জাল বোনেন আবার সব সুতো গুটিয়ে নেন কল্পান্তে। আবার বোনেন। এই চলছে নিত্য। এর বিরাম নাই। নূতন সৃষ্টি যখন আরম্ভ করেন, তখন সকলকে co-operation (সহযোগ) করতে ডাকেন। শুকদেব সমাধিমগ্ন। তাঁকে ডেকে আনলেন — ভাগবত, অর্থাৎ তাঁর কথা জগৎ-কে শোনাতে হবে। এখানে non-co-operation (অসহযোগ) নেই। তাঁর কার্যে সকলকেই co-operate (সাহায্য) করতে হয়। লীলার সঙ্গী হতে হয়। নূতন সংসার পাতবার সময় সকলকেই কর্ম করতে হয়।

“কর্ম আর কি? দেহধারণ করার নামই কর্ম। দেহ মানে কর্ম। কামক্রোধাদি এগুলি কি? এইগুলিই তো কর্মে প্রবৃত্ত করায়। সমাধি জীবের normal state (সহজ অবস্থা)। কর্ম তার বিপরীত। সমাধি ও কর্ম two extremes (বিরুদ্ধ অবস্থা)।”

বড় জিতেন — আজ্ঞে, কর্ম কি করে কমান যায়? দিন দিন যে বেড়েই চলেছে!

শ্রীম — ডাক্তারের কথা শোনা। ঠাকুরের কথা পালন করা। তিনি বলতেন, গৃহস্থের বউ, পেটে তার ছেলে হয়েছে — ছ’মাস। তখন শাশুড়ী অনেক কর্ম কমিয়ে দেয়। সাত মাসে আর একটু কমলো। আট-ন’ মাসে প্রায় সব কমে গেল। দশ মাসে সম্পূর্ণ ত্যাগ হয়ে গেল। পেট থেকে যখন ছেলে বেরোলো তখন ওটি নিয়েই নাড়াচাড়া করে। একদিকে যেমন এগুবে অন্য দিক থেকে তেমনি পেছুবে। তাঁর দিকে এগুলেই কর্ম ক্রমশঃ ত্যাগ হয়ে যায়। আবার সমাধিতে একেবার ত্যাগ — সম্পূর্ণ ত্যাগ। তারপর কতকগুলি কর্ম রাখে কেবল দেহধারণের জন্য — যেমন স্নানাহার, শৌচ, নিদ্রা। আর কতকগুলি থাকে লোকশিক্ষার জন্য — যেমন জ্ঞান ভক্তি, তাঁর নাম-গুণকীর্তন, এইসব। ‘বিবেক চূড়ামণি’তে বেশ একটি দৃষ্টান্ত আছে, ঈশ্বরদর্শনের পর কিভাবে কর্ম থাকে। একটি পাঁচ বছরের

শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ের রাঁধতে দেরি হয়ে গেছে। ঘুমন্ত শিশুকে মা তুলে নিয়ে যাচ্ছে খাওয়াতে। শিশু হাত পা ছুঁড়ছে, কিন্তু মা ছাড়ছে না। তারপর মুখে আহার দিচ্ছে, নিচ্ছে না। তখন জোর করে গুঁজে দিচ্ছে। আর কি করে, তখন ঠেকে অনাসক্ত হয়ে খায়। সমাধির পর কর্ম এই রূপ — নিজের কর্তৃত্ব থাকে না, সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। আর এক রকম কর্ম আছে, সাধনের অবস্থায় তা করতে হয় — নিষ্কাম কর্ম। গুরুর শরণাগত হলে তিনি কর্মের ভিতর রেখেই কর্মত্যাগ করিয়ে নেন। অনাসক্ত কর্ম করিয়ে নেন। অনাসক্ত কর্ম করতে করতে কর্মক্ষয় হয়ে যায়। তখন নূতন কর্মে আর জড়াতে দেন না। যতদিন না প্রারব্ধ (পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল) ক্ষয় হয়েছে ততদিন নিষ্কামভাবে কর্ম করান — প্রকৃতি-ক্ষয়ের জন্য — ভগবানের জন্য — স্বর্গলাভের জন্য নয়।

ঈশ্বর এখন নররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সদ্‌গুরুরূপে ভক্তদের কর্ম কমিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সব জানা আছে, কোন হাঁড়িতে কি? যার যেরূপ প্রকৃতি তাকে তেমনি কর্মে নিযুক্ত করেছেন ভোগান্তের জন্য। অনাসক্তভাবে সব করিয়ে নিচ্ছেন যাতে তাঁর জন্য ব্যাকুলতা হয় শেষে। এখন যাদের হবে না, বুঝতে হবে তাদের কপাল মন্দ। বড্ড chance (সুযোগ), সব টাট্‌কা।

পূর্বে গুরু কেন এক এক শিষ্যকে এক এক রকম উপদেশ দিতেন? প্রকৃতি ভিন্ন, তাই। একজনকে বললেন, তুমি সন্ন্যাস ন্যাও। আর একজনকে বললেন, তুমি ব্রহ্মচারী হয়ে দিনকতক থাক। একজনকে বললেন, তুমি কিছুকাল তীর্থ পর্যটন কর। একজনকে বললেন, তুমি আমার কাছে থেকে সেবা কর। আর একজনকে বললেন, তুমি গিয়ে সংসার কর। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, তাই ভিন্ন পথ। গন্তব্য এক — ঈশ্বর। গুরুর কথায় বিশ্বাস হলে বেঁচে গেল। তাঁর শরণাগত হলে তিনি নিজে হাতে ধরে কর্ম করান। অন্তে একেবারে কর্ম ত্যাগ করিয়ে নেন। কর্ম-ত্যাগ হলে আর শব্দ নাই। মৌমাছি ভন্‌ ভন্‌ করছিল, যেই ফুলে বসেছে আর সেই শব্দ নাই — মধুপানে মত্ত। যতক্ষণ না ভগবানদর্শন হয়, ততক্ষণ কর্ম; দর্শন হলে সব চুপ।

বড় জিতেন — ভগবান গুরুরূপে এসে কর্মসংক্ষেপের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সত্য — কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম কি সবটাই ভোগ করতে হবে?

শ্রীম — তাঁর ইচ্ছায় সব সম্ভব হতে পারে। তাঁর শরণাগত হলে সব হতে পারে। প্রারব্ধও নাশ হয় তাঁর ইচ্ছায়। তা যদি না পারেন তবে সর্বশক্তিমান কিসে? কিন্তু শরণাগত হওয়া চাই। বাল্মিকী, বিশ্বামিত্রের প্রারব্ধ নাশ হয়েছিল। সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। General rule and special rule (নিয়ম ও ব্যতিক্রম) দুই-ই আছে। General rule (সাধারণ নিয়ম) প্রারব্ধ ভোগ। Special law (ব্যতিক্রম) তাঁর ইচ্ছা, তাঁর কৃপা। (জগবন্ধুর প্রতি) King's Prerogative (রাজ-অনুজ্ঞা) আছে না? যাঁর ইঙ্গিতে এ বিচিত্র জগৎ চলছে তিনি কি ইচ্ছা করলে ভক্তকে সব মাপ করতে পারেন না? ঠাকুর রামপ্রসাদের গান গেয়ে এই কথাটি বলতেন, ‘কপালে লিখেছে বিধি তাই যদি হবে, তবে ও মা তোর দুর্গা নাম কে নেবে?’ Exception proves the rule (ব্যতিক্রমই নিয়মের প্রমাণ)।

যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি।
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥ (চন্ডী, দেবীসূক্ত)

দেখুন, বেদ বলছেন, তাঁর ইচ্ছায় ব্রহ্মপদ, ঋষিত্ব লাভ হয়। ঠাকুর কখন কখন নৃত্য করতে করতে একটি গান গাইতেন।

শ্রীম ভাবোন্মত্ত হইয়া গাহিতে লাগিলেন —

আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মা মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশী নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক ব্রহ্মপদ ল’তে পারি॥
আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

কলিকাতা। ১১ই মে ১৯২৩ খ্রীঃ, ২৮শে বৈশাখ ১৩৩০ সাল।
শুক্রবার, কৃষ্ণা একাদশী।

তৃতীয় অধ্যায়

সরল জীবনযাত্রা ধর্মজীবনের সহায়

১

আজ শনিবার অপরাহ্ন। এই দিনে বহু ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে ইটালি (এন্টালী বা ইন্টালী) হইতে একদল ভক্ত আসিয়াছেন। ভাটপাড়ার ললিত, শুকলাল, ডাক্তার, শান্তি, জগবন্ধু, রাখাল, বড় অমূল্য, যোগেন আসিয়াছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই রমেশ ব্রহ্মচারী ও বিনয় আর ছোট জিতেন প্রবেশ করিলেন। শ্রীম মেঝেতে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। ইতিমধ্যে কথামৃতের 'আগরপাড়ার ছেলেটি' আসিয়া উপস্থিত হইলেন — আশুবাবু — এখন আর তিনি 'ছেলেটি' নাই, বৃদ্ধ। শ্রীম পরম সমাদরে তাঁহাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে কথা কহিতে লাগিলেন। শ্রীম-র ইচ্ছায় ভক্তগণ গান গাহিতে লাগিলেন। এখন সাড়ে ছয়টা।

গান॥ এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।
ও তাঁর বিবেক আর বৈরাগ্য ঝুলি
দুই কাঁধে সদাই ঝুলে॥

রমেশ ব্রহ্মচারী গাহিতেছেন—

গান॥ গাও রে জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম।

সকলে গাহিতেছেন —

জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল রে আমার মন।
যুগ অবতার যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ॥

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীম-র আদেশে বড় অমূল্য ঠাকুরের জীবনী হইতে 'সাধন সমর'-এর কতক অংশ পাঠ করিলেন। এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) ঠাকুর বলতেন, সব পথ দিয়েই গিয়ে

দেখেছি। এখন যেখানে আছি, এই সব চেয়ে ভাল। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি — 'নি'-তে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। কিছু নিচে থাকা ভাল। 'নি'-তে হলো ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। ভক্তি-ভক্ত — এ বেশ। সমাধির অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা যায় না। আরো অনেক সব মত আছে — সহজিয়া, ঘোষপাড়া, কর্তাভজা, কত কি! কিন্তু এ-পথই ভাল, শুদ্ধপথ। ঐ সব পথেও দুই এক জনের হয়েছে। তা বড় নোংরা পথ। বাড়িতে সদর দিয়েও ঢোকা যায়, আবার পায়খানার পথেও যাওয়া যায়। ওসব পথ, যেমন পায়খানার পথ। আমার মাতৃভাব। কেউ কেউ প্রকৃতিভাবে রমণ দ্বারা তুষ্ট করেছেন, কিন্তু ওসব নোংরা পথ। আমার কাছে মাতৃযোনী।

তিনি না এলে এ কথা কে শুনাতো আমাদের, কে এ পার্থক্য ধরে দিত? কার এ বহুমুখী দৃষ্টি আছে? ভাগ্যিস্ আমরা এই সময় এসেছিলাম। তাই এই অমূল্য কথা শুনতে পেলাম। তিনি না এলে জগতের ধর্ম-দ্বন্দ্বই বা কে মেটাতো। সকলেই আপন আপন ধর্মকে বড় বলে। তিনি বললেন, 'সব ধর্ম সত্য। আমি নিজে সাধন করে দেখেছি। সব ধর্ম এক একটা রাস্তাবিশেষ। শেষে সব ঈশ্বরে গিয়ে মিলে।' তাই তো এই গানে বলেছে, 'একোয়া, ওয়াটার, পানি, বারি নাম দেয় এক জলে। আল্লা, গড্, ঈশা, মুশা, কালী নাম ভেদে বলে॥' এই ধর্ম সমন্বয় তিনি আসাতেই হয়েছে। নিজ জীবনে সাধন করে দেখেছেন সব সত্য, তবে বলেছেন এ কথা।

কিন্তু তাঁর আসার প্রধান উদ্দেশ্য ভক্তগণকে তোলা। তারা এত জড়িয়ে পড়ে যে তাঁকে আসতে হয় এদের ওঠাতে। সকলের জন্যই তাঁর ভাবনা, কিন্তু ভক্তের জন্য ভাবনা বেশী। কারণ ভক্তদের দেখে তো লোক শিখবে, তাঁকে ডাকবে। তবেই তো শান্তি। দক্ষিণেশ্বরে এক দিন সব বসে আছে ভক্তগণ। ছোকরা ভক্তরাও রয়েছে অনেকে। তেজচন্দ্রকে বললেন, 'এই তোদের জন্যই যত ভাবনা — যারা বিয়ে করে ফেলেছে। একে তো নিজেই হাবুডুবু খাচ্ছে, তার উপর আবার আরও কতকগুলি (স্ত্রীপুত্রাদি) ঘাড়ে চেপে বসেছে। দেখুন, ভগবান কত ভাবেন যারা বিয়ে করে ফেলেছে তাদের জন্য। ওদের

case (অবস্থা) complicated (জটিল) কি না, তাই অত ভাবনা। একে নিজেই পথ পাচ্ছে না, তার উপর কতকগুলি কচি মনকে বোঝাতে হবে, চালাতে হবে — যাদের কোনও সাধন নাই, ভজন নাই। যারা আটকে গেছে সংসারে, তাদের জন্যই তাঁর ভাবনা বেশী।

বড় জিতেন — 'আমি ঐ খেদে খেদ করি, তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।'

শ্রীম (উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়া) — ঠাকুর বলতেন, ওসব গান কেন বার বার। এক আধবার হলেই তো হল। আনন্দের গান গাও — তাঁর নাম, রূপ, লীলা এই সব। যেমন 'বাজিল শ্যামের বাঁশরী যমুনায়, তোরা কে কে যাবি আয়।' দুঃখকষ্ট, এ তো সংসারে থাকলে আছেই। দেহ ধারণ করলে দুঃখ অনিবার্য। এই সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব তিনিই করেছেন। তবে তো লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত জীব তাঁর সংসারে। মানুষও একটি এর ভিতর। কেন এই মানুষ করেছেন? না — তাঁকে ডাকবে বলে। দুঃখকষ্টের আঘাত পেয়ে চৈতন্য হলে তবে তাঁকে ডাকবে — তবে শান্তি। তাই আনন্দের গান গাইতে বলতেন।

বড় জিতেন (বিনীতভাবে) — রামপ্রসাদ কেন তবে এ সব দুঃখকষ্টের গান গাইলেন?

শ্রীম — রামপ্রসাদ কি শুধু নিজের দুঃখ গানে প্রকাশ করেছেন? তিনি type of man — আদর্শ মানুষ। Humanity-র (মনুষ্য জাতির) দুঃখকষ্টের কথা বলেছেন এসব গানে। He is a representative man — তিনি মনুষ্যসমাজের প্রতিনিধি। দেখুন, এই দুঃখ কষ্টের গানের পরই বলছেন আবার, 'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী-কল্পতরুমূলে।' দুঃখ দুঃখ করলে দুঃখ যাবে না। তাঁর নাম নিলে, তাঁর কথা চিন্তা করলে, তাঁর দর্শন হলে, তখন সব দুঃখ দূর হয়। তাই দুঃখ কষ্টের গান না গেয়ে, তাঁর নাম, রূপ, লীলার গান, আনন্দের গান গাইতে হয়। রোগ রোগ করলে রোগ সারবে না। ডাক্তারের কথা শুনতে হবে, ওষুধ এনে খেতে হবে, তবে আরোগ্য লাভ হবে। দুঃখ কষ্ট তো ভবরোগ। এ সারাতে হলে তাঁর নাম

গুণগান চাই। সুখের গান গাইতে হয়। যে সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়িত নাই সেই সুখের গান দরকার — সেই সুখ শান্তি আনন্দের গান গাইতে হয়। তখন ভবরোগের নিবৃত্তি হবে, ত্রিতাপজ্বালার শান্তি হবে। তাই ঠাকুর সর্বদা আনন্দের গান গাইতেন। যেমন, 'মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ করো না।' আমাদেরও তাই সর্বদা আনন্দের গান গাওয়া উচিত।

একবার ঠাকুর ছিলেন সিন্দুরিয়াপট্টি — মণি মল্লিকের বাড়িতে। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব হচ্ছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী sermon (বক্তৃতা) দিলেন। তারপর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হলো। ঠাকুর বললেন,“বেশ! কিন্তু তোমরা এত 'পাপী পাপী' কর কেন? বরং বল, কি! আমি তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ!” আর একদিন একজনকে (কেশব সেনকে) বলেছিলেন, 'তোমরা তাঁর ঐশ্বর্যের কথা অত কেন বল? হে প্রভো, তুমি সূর্য করেছ, তুমি চন্দ্র করেছ, তুমি হেন করেছ, তেন করেছ। অত বলবার দরকার কি?' 'পাপ পাপ, পাপী পাপী করতে করতে তাই হয়ে যায়' বলতেন। আমাদের বলা উচিত, আমি তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! নাম-যজ্ঞ, নাম-মাহাত্ম্য তো আছে? একবার যখন তাঁর নাম করেছি তখন সব পাপ দূর হয়ে গেছে, এই বিশ্বাস চাই। চৈতন্যদেব দক্ষিণে রামেশ্বরে গিছলেন। পথে গোদাবরীতটে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন তাঁকে বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে বড়ই আনন্দ হলো। আবার যখন পুরীতে ফিরে আসবো, তখন আপনার সঙ্গে নাম-মহোৎসব করে আনন্দ করা যাবে। ভগবানের নাম করা শ্রেষ্ঠ মহোৎসব। তাই বৈষ্ণবেরা বেশ বলে, 'একবার হরিনামে যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে!'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ও-দেশেও (প্রতীচীতেও) ঐ এক কথা পাপ, পাপী। 'And thou shalt be cast into furnace of fire (hell)' (অনন্ত নরকে তোমার গতি হবে) যদি পাপ কর। পুণ্য কর, redemption (মুক্তি) হবে। ভোগের দেশ কিনা, তাই খালি অমন সব কথা। ওখানে (মিহিজামে) একখানা শেক্সপীয়র

পড়ে গিছলো হাতে। অনেক কাল পর আবার পাতা উল্টিয়ে দেখলুম। অত বড় কবি আর dramatist (নাট্যকার), কিন্তু কোথাও একটি কথাও প্রেমের, Gospel of love-এর বলেন নাই। শুধু sin, punishment, hell-fire আর redemption (পাপ, শাস্তি, নরক আর মুক্তি) এই সব কথা। ভোগী কিনা, ওরা তাই 'Punishment -punishment' (শাস্তি-শাস্তি) করে। ‘প্রেম’ — এই জিনিসটি এদেশের। অতবড় বই — কোথাও একটি লাইনও খুঁজে পেলাম না যেখানে প্রেমের কথা আছে। কিন্তু যীশুখ্রীস্ট তা জানতেন, শিক্ষাও দিয়েছিলেন Gospel of love (প্রেম)। Jesus knew what was in man; যীশু মানুষের হৃদয়বিহারী প্রেমময় ভগবানকে দেখতে পেতেন। তাঁর কতকগুলি ভক্ত স্ত্রীপুরুষও এই প্রেমময়কে জানতেন। ওঁরা বুঝেছিলেন এই প্রেমময়কে ভালবাসাই ধর্ম। ঠাকুরও তাই বললেন, কথাটা হচ্ছে, ‘সচ্চিদানন্দে প্রেম’। কিন্তু ওরা ভোগী তাই তা গ্রহণ করতে পারলো না। এদেশের keynote — (মূলমন্ত্র) ভোগ ত্যাগ কর, আর ওদের দেশের — ভোগ কর। কাজে কাজেই যারা ভোগে আছে তারা punishment-কে (শাস্তিকে) ভয় করে। আর যারা তা (ভোগ) চায় না তারা কাকে ভয় করবে? এই war-এ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) ও-দেশের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বুঝেছে, ভোগ কি ভয়ঙ্কর। তাই তারা India-র (ভারতের) দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে কিনা, এরাই (ভারতীয়রা) problem of life (জীবন সমস্যা) solve (সমাধান) করেছে ভাল।

শেক্সপীয়র বোঝেন নি Gospel of love (প্রেম) কি! কিন্তু কালিদাস বুঝেছিলেন। তাঁর নাটক পড়ে দেখ, সব highest ideal ভগবানকে নিয়ে লেখা। কিন্তু ম্যাক্সমূলার বুঝেছেন, প্রেম কি! তাঁর ‘হিবার্ট লেকচারে’ ধর্মের definition (সংজ্ঞা) দিতে গিয়ে একে একে সব ধর্মকে examine (পরীক্ষা) করেছেন। শেষে চৈতন্যদেবের কথা সার বলে নিয়েছেন। চৈতন্যদেব ধর্ম define (সংজ্ঞা) করেছেন — যাতে ভগবানে প্রেম হয়, তাই ধর্ম। ম্যাক্সমূলার comparative religions-এর (বিভিন্ন ধর্মের সমালোচনার) authority (সুযোগ্য

অধিকারী)। ইনি বুঝেছেন চৈতন্যদেবকে। আর ইনি তো এদেশেরই লোক কিনা!

যতক্ষণ ভোগ রয়েছে ততক্ষণ তাঁকে ভাল লাগে না। ভোগান্তে তাঁর জন্য ব্যাকুলতা হয়। তখন তাঁকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। এরই নাম প্রেম।

২

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — এবার আপনি ওখান (মিহিজাম) থেকে message (সংবাদ) পাঠিয়েছিলেন, simple life lead করতে (সাদাসিধেভাবে চলতে)। তা না হলে ধর্ম হবে না।

শ্রীম — কি করে হবে? দিন রাতই যদি অন্য চিন্তা থাকে তাহলে তাঁ'তে প্রেম হবে কি করে? তাই অন্য চিন্তা যত কমানো যায় ততই ভাল। আহার বিহারেই যদি সব সময় যায় তাহলে তাঁর চিন্তা হবে কখন? তাই simple life (অনাড়ম্বর জীবনের) দরকার। অধ্যাত্ম চিন্তায় যে ভারত জগতের মুকুটমণি, এর গোড়ায় ছিল এই কথা — "plain living and high thinking" (সরল জীবন, উন্নত মনন)। ঋষিদের জীবন অতি সরল ছিল। তাই তাঁরা ঈশ্বরচিন্তায় সমস্ত সময় অতিবাহিত করতে পারতেন। মন তো একটা, একে যেদিকে দাও সেদিকে যাবে। আর সাঁওতালদের দেখলাম, এই শরীর। সারাদিন পাথর ভাঙ্গছে, কি পরিশ্রম! কাউকে জিজ্ঞাসা করতুম, কি খেয়েছ? বলতো, আজ্ঞে, খালি ভাত। কেউ হয়তো বলতো, ফেন ভাত। কেউ বা সীমভাত। ডাল যেদিন হলো সেদিন খুব হলো। কি strong-built (দৃঢ়) শরীর! শহুরে বাবুদের এটা চাই, ওটা চাই। এক পদ কম পড়লে তো মহা বিপদ, হতাশ হয়ে পড়লো। একদিন ভাল খাওয়া হ'ল না তো এই কান্না! ছেলেবেলা থেকে পাঁচটা দিয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন কম পড়লেই সব অন্ধকার। অত সবের, পাঁচটার দরকার কি? এমনি তো সময় হয় না। ছেলেপুলের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করতে হবে। আবার খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হলে সময় হবে কোথা থেকে? শুধু ডাল আর ভাত — কি সুন্দর! তা যদি

আবার ভগবানকে নিবেদন করে দেওয়া যায় আরও ভাল। ভাত চাপানো হলো (জপের অভিনয় করিয়া) জপ কর; ডাল, জপ কর। এইভাবে থাকলে সর্বদা যোগে থাকা যায়। নয়ত যোগভ্রষ্ট হয়ে যায়। রান্না খাওয়া, সব সময়ই তাঁকে স্মরণ করতে হয়।

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
'যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥' (গীতা ৯:২৭)

আহার যজ্ঞ দান ব্রত তপস্যা যা কিছু কর, সব আমার উদ্দেশ্যে কর। তাহলে সর্বদা যোগে থাকবে। কর্মবন্ধনে পড়তে হবে না। গীতায় ভগবান এই কথা বলেছেন।

কি দরকার অত-র —পাঁচটার? নরেন্দ্রের বাবা এটর্নি ছিলেন — হঠাৎ মারা গেলেন। এদের অন্নবস্ত্রের বড্ড কষ্ট হলো। নরেন্দ্র একদিন ঠাকুরকে বললেন, 'আপনার মাকে অর্থাৎ জগন্মাতাকে বলুন যাতে আমার কষ্ট যায়'। কয়েক দিন পর, 'বলেছেন কিনা' নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ বলেছি, যদি ডাল ভাত হয় তবে হবে। এ পর্যন্ত হতে পারে।' এর মানে কি? ঈশ্বর যাকে ভালবাসেন তাকে আর এসব নানা want-এর (অভাবের) ভিতর রাখেন না। তার জন্য ডাল ভাত আগে থেকেই রক্ষা করেন। এ ব্যবস্থা যারা ঈশ্বরকে চায় তাদের জন্য। কিন্তু যারা ভোগ চায় তাদের জন্য অন্যরূপ। দেখুন না, সংসারী লোক। এরা বাজে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সব সময় কাটিয়ে দেয়। তাহলে সময় হবে কখন তাঁকে ডাকবার। আবার পাঁচ জনের মধ্যে রয়েছে। ওদের মনকেও তাকেই বোঝাতে হবে। ওদের জন্য responsible-ও (দায়ীও) নিজে। স্ত্রী-পুত্র পাঁচজন, একে তাদের মন যোগান, আবার নিজের খাওয়া নিয়ে থাকলে সময় কোথায়? সংসারীরা জেনেশুনেই তো এই ভার নিয়েছে। সংসারে থাকলেই মাগ ছেলে হবে। তা আবার খাওয়া আর খাওয়া করে পাগল হতে হবে? "Killing the soul for a mess of pottage?" খাওয়া নিয়ে পাগল হওয়া আর ঈশ্বরে মন না দেওয়াকে 'Killing the soul' — আত্মহত্যা বলা হয়েছে।

(সহাস্যে) আমরা কয়েকদিন জামতাড়া আশ্রমে ছিলাম। একজন

লোককে দেখলাম সাধুদের খাটিয়া বাঁধছে। আমরা বললুম, ‘তুমি বেশ সাধুসেবা করছো’। সে বললে, ‘না মশাই ওঁরাই তেলটেল, কত কি দেবেন আর খেতে দেবেন’। আমার তখন মনে হলো সীতা হরণের সময় শৃগালের কথা। রামলক্ষ্মণ সীতাকে খুঁজছেন। পথে একটি শৃগালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সীতার কোন সন্ধান বলতে পারে কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন এঁরা। শৃগাল বললে, ‘না মশায়, আমায় আহার নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব দেখবার সময় নেই’ (সকলের হাস্য)। সংসারীদের এই অবস্থা। আহার আর আহার, আর মাঝে মাঝে দেহসুখ।

বড় অমূল্য — সকলে যদি life (জীবনযাত্রা) এমনি simple (সরল) করে ফেলে তা হলে দেশের economic condition (অর্থনৈতিক অবস্থা) যে খারাপ হয়ে যাবে।

শ্রীম — হাঁ জী, হাঁ। সন্ন্যাসের কথা বললেও লোকে ঐ কথা বলে। বলে, হাঁ মশায়, যদি সব সন্ন্যাসী হয়ে যায় তা হলে সংসার থাকে কেমন করে? বয়ে গেছে সবার, কথা শুনতে। বললেই হলো? শোনে ক’টা লোক? কত তো বলা হচ্ছে, কিন্তু কে শোনে? প্রকৃতিতে থাকলে তো হবে — ‘প্রকৃতি স্ত্বাং নিয়োক্ষতি’ (গীতা ১৮:৫৯)। (অমূল্যের প্রতি) ও বিষয় আপনার ভাবতে হবে না। ‘ন মণ ঘিও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না’। এ কথাটি বুঝাতে ভগবানকে মানব দেহ ধারণ করে আসতে হয়। তবুও কি লোকে শোনে? তিনি এলে ব্যাকুলতা আসে সঙ্গে সঙ্গে। যাদের ভোগান্ত হয়ে গেছে তারাই আসে তাঁর কাছে। আর তাঁর কথা শুনে পালন করতে চেষ্টা করে। অবতার আসার পূর্বে লোক সব ভোগে অজ্ঞানে ডুবে থাকে। তিনি এসে বলেন, এর উপর আরও ভাল জিনিস আছে — eternal life — অমৃতত্বম্। তবে কারো কারো চৈতন্য হয়। ধর্মের গ্লানি অবশ্যম্ভাবী। অজ্ঞানতায় পূর্ণ হলে তখন তিনি আসেন। তাঁর creation (সৃষ্টি)-এর scheme-টি (পরিকল্পনাটি) এমনই যে তাতে গ্লানি, অজ্ঞানতা আসতেই হবে। তা না হলে তো নূতন করে আসা হতে পারে না। এসে বলেন, ‘ভোগ ত্যাগ করে আমার শরণ লও’। এটিই ঠাকুরের

— শ্রীভগবানের 'latest message' (শেষ কথা)। ঠাকুর বলেছিলেন, ঈশ্বর ছাড়া এমন কেউ নেই এই ভবসমুদ্র পার করতে পারে’। তাই তো বলেছিলেন, গুরু যিনি মন্ত্র দেন তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করতে হয়। গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি হলে কিছুই হবে না। মনে করতে হয়, সেই সচ্চিদানন্দ এঁর মুখ দিয়ে মন্ত্র দিচ্ছেন। তাই বলতেন ‘কথাটা হচ্ছে এই, সচ্চিদানন্দে প্রেম’। তাঁকে কেবল ভালবাসা চাই।

বড় জিতেন (হতাশভাবে) — Thy will be done (প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক)।

শ্রীম — ঠাকুরের সম্মুখে একজন হাইকোর্টের উকীল এই কথা বলেছিলেন। তিনি তো কারো মুখের দিকে চেয়ে কথা কইতেন না খুশী করবার জন্য। তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, ‘তোমার জ্যাঠামী করতে হবে না। শুধু মুখে বললে কি হবে? আন্তরিক প্রার্থনা কর। মুখে শব্দ উচ্চারণ না করে প্রার্থনা করতে হয়। না পার অভ্যাস কর’। আর বলেছিলেন, একজনের পেটে ক্ষিদে পেয়েছে, এখন মুখে না বললে কি আর ক্ষিদে পায়নি? তাঁকে প্রার্থনা করতে হয় অন্তরে।

একজন ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম (নবাগতের প্রতি) — বুঝলেন, simple life (অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা) না হলে ধর্মজীবন হয় না। তাই গান্ধী মহারাজের কথা ও-দেশের (পাশ্চাত্ত্যের) better minds (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা) নিয়েছেন। তাঁরা বুঝেছেন, এ দেশের এঁরাই problem solve (সমস্যার সমাধান) করেছেন। Simple life lead (সরল জীবন যাপন) করলে কারো অত গোলামী করতে হয় না পেটের জন্য। স্ত্রী-পুত্রের জন্য অতো ভাবতে হয় না। Life simple (সরল জীবনযাত্রা) হলে তো অনেক অগ্রসর হয়ে গেল। গান্ধী মহারাজ তো বলছেন, নিচ্ছে ক’টা লোক?

৩

রাত্রি নয়টা। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া একটি সুবৃহৎ বরযাত্রীর শোভাযাত্রা দক্ষিণ দিকে যাইতেছে।

বাদ্যযন্ত্রের বিবিধ মধুর শব্দে চতুর্দিক মুখরিত হইয়াছে, আর সহস্র আলোকমালায় দিক্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত। শ্রীম ভক্তদের কারুকে

কারুকে উহা দেখিতে পাঠাইয়া দিলেন। বর রাজবেশে বিচিত্র আলোকমালায় পত্রপুষ্পে সুশোভিত ময়ূরযানে উপবিষ্ট। ভক্তগণ দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই দেখুন, তাঁরই বিধানে এরা যাচ্ছে সংসারে প্রবেশ করতে। তবে তো সৃষ্টি থাকবে। এদিকে আবার বলছেন, সংসার জ্বলন্ত অনল। কেবল পাকা খেলোয়াড় হলে কতকটা গা বাঁচিয়ে চলতে পারে। তার জন্য শিক্ষা চাই। বলতেন, কিছুদিন সৎসঙ্গ করে, নির্জনে তাঁকে ডেকে ভক্তি লাভ করে সংসারে গেলে তত ভয় থাকে না। ভক্তি লাভ না হলে, সদসৎ বিচার না জন্মালে মুশকিল। আবার এরই মধ্যে কতকগুলিকে টেনে বের করে নিয়ে যান। সৃষ্টির কাজে এদের লাগান না, পরমানন্দের ভাগী করান। ঠাকুর বলতেন কিনা, 'যে মাগ-সুখ ছেড়েছে সে জগৎ-সুখ ছেড়েছে'। তাই সে পরম সুখ পরমানন্দের উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ, ইচ্ছা করলে ঈশ্বরলাভ করতে পারে। এ সংসারের আনন্দ, এও তাঁরই আনন্দ। কিন্তু স্বল্পানন্দ — আজ আছে কাল নাই, ক্ষণস্থায়ী। যে তাঁর জন্য এ আনন্দ ছেড়ে দেয় সে-ই পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দের অধিকারী। (একজন অবিবাহিত ভক্তের প্রতি) কোন্‌টা? বিষয়সুখ কি পরম সুখ? আপনারা পরম সুখের অধিকারী।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মিহিজামে দু'টি বিয়ে দেখেছি। একটিতে বর যাচ্ছে বিয়ে করতে, সামান্য বাজনা। পুরোত নেই। বললে, পিসে কি মামা বর-কনের হাত মিলিয়ে দেয়। আর একটি দেখলাম, কনে যাচ্ছে বিয়ে করতে। একজনের স্ত্রীর মৃত্যু হলে বড়বোনকে বলছে, 'ওগো তোমরা আমায় বিয়ে দিয়ে দাও, আমি বরং শুধু চেটাইয়ে থাকবো তাও ভালো, তবু বিয়ে দিয়ে দাও।' এই বিচিত্র সংসার কেউ ধরে, কেউ ছাড়ে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বললে, তাঁর শরণাগত হলে, তিনিই আবার এরই ভিতর সব সুবিধা করে দেন। এই পাঁকের ভিতরই পদ্মফুল ফোটে।

কলিকাতা, ১২ই মে, ১৯২৩ খ্রীঃ; ২৯শে বৈশাখ ১৩৩০ সাল।
শনিবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান

১

আজ রবিবার। সারাদিন ভক্তসমাগম হইয়াছে। মর্টনের দ্বিতল গৃহ। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। ডাক্তার বক্সী, রাখাল, শান্তি, যোগেন, রমেশ ব্রহ্মচারী, ছোট জিতেন, জগবন্ধু, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ছোট নলিনী, তারক, বিনয়, অমৃত, বড় নলিনী, বড় ললিত, ছোট ললিত, আরো অনেকগুলি ভক্ত পরিবৃত হইয়া শ্রীম মেঝেতে মাদুরে উপবিষ্ট। এখন সন্ধ্যা। আলো আসিয়াছে। শ্রীম যুক্তকরে প্রণাম করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে কয়েকটি ভজন সঙ্গীত হইল। সকলে গাহিলেন, 'জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম' এই বন্দনাটি; তারপর, 'এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে'। ছোট ললিত গাহিলেন, 'মহাদেব পরম যোগীন, মহতানন্দে মগন'। পুনরায় শ্রীম-র ইচ্ছায় সকলে গাহিতেছেন, 'ডমরু হর-করে বাজে বাজে' — স্বামীজীর রচনা।

ত্রিশূল ধর অঙ্গ ভসম ভূষণ, ব্যাল মালা গলে বিরাজে।।
পঞ্চবদন পিনাক-ধর শিব, বৃষভ-বাহন ভূতনাথ,
মুণ্ডমালা গলে বিরাজিত অজর অমর দিগম্বর রে।।

ভজন শেষ হইল। বড় জিতেন ইতিমধ্যে আসিয়াছেন। ছোট ললিত তাঁহাকে কানে কানে বলিতেছেন, "জিত্‌দা, আজ সারাদিন কথা হচ্ছে, আজ এঁকে আর বকাবেন না।" ইহা শ্রীম-র কর্ণেও প্রবেশ করিল।

শ্রীম (ললিতের প্রতি) — না, কই আর তেমন। সেণ্ট জনের গস্‌পেলের শেষে আছে — তাঁর কথা যদি লেখা যেত তবে সংসারে ধরবে না। ব'লে কি শেষ হয় তাঁর কথা — না তৃপ্তি মিটে? 'But there are also many other things which Jesus did,

the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written.' (St. John 21:25) ক্রাইস্টের সম্বন্ধে বলেছিলেন এই কথা সেণ্ট জন, তাঁর প্রেমিক ভক্ত। আবার আছে (শিব) মহিম্নস্তবে, 'অসিত গিরি সমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে'। তারপর কি? (ভক্তগণ কেহ কেহ বলিতেছেন শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন) —

সুরতরুবর শাখা লেখনী পত্রমুর্বী॥
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং।
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হিমালয় পরিমাণ কালি, সমুদ্র দোয়াত, কল্পবৃক্ষ কলম, পৃথিবী পত্র; লেখক স্বয়ং সরস্বতী। অনন্তকাল ধরেও যদি লেখেন তবুও তাঁর গুণের কথা শেষ হবে না। দেখুন, এমনতর ব্যাপার তাঁর কথামৃত। তবে —

'স্বল্পমপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২:৪০)

এই একটু ভরসা। অমৃতসাগরের জল ঘড়া ঘড়া খেলেও যা, খড়কে দিয়ে একটু খেলেও তা — অর্থাৎ অমর হবেই। এই ভরসা। তাঁর কথা কইতে কি কষ্ট হয়, না আশ মিটে!

আমার একবার অসুখ হলো। একমাস ভুগছি। সত্যশরণ চক্রবর্তী ডাক্তার, বাড়ির লোকদের বললেন, 'ওঁর যা ভাল লাগে শুনতে বা কইতে, তাই করতে দিন। তবেই শীঘ্র ভাল হবেন।' অন্য ডাক্তাররা কথা বন্ধ করে দিছলেন। তাতেও এক মাস জ্বর বন্ধ হয় না। কিন্তু সত্যবাবুর এই ব্যবস্থার পর জ্বরও বন্ধ হলো আর শীঘ্র আরাম হয়ে গেলাম। উনি ভক্ত কিনা, তাই বুঝতে পারেন। যে কথা প্রাণ, তা না বললে বা না শুনলে নাড়ি আসবে না যে। এ এক ডিপার্টমেন্ট ভগবানের। যারা এখানকার লোক তারা তাঁর কথা না বলে না শুনে থাকে কি নিয়ে? মরে যাবে যে! যারা পেনসান্ নেয় তাদের অনেকেই ফস্ করে মরে যায়। কাজে থাকলে হয়তো আরও কতক দিন বেঁচে থাকতো। তাই অনেকে পেনশান্ পেয়েও চাকরী খোঁজে। কেন? না,

সেটা যে অভ্যাস হয়ে গেছে। একটা মাছ ডাঙ্গায় পড়ে মর মর হয়েছে, জলে ছেড়ে দাও অমনি সোঁ করে দৌড়। প্রাণ পেয়েছে যে জলে পড়ায়। ঠিক এমনি ঈশ্বরের কথা। এ যাঁদের শুনতে বা বলতে ভাল লাগে তাঁদের না শুনলে বা না বললে যে প্রাণ থাকে না। যাঁদের ঋষি জীবন, ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁরা বাঁচবেন কি করে তা না করলে? এটা second nature-এ (স্বভাবে) পরিণত হয়ে গেছে — তাঁর নাম গুণকীর্তন। অন্য কথা, অন্য ভাব তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। দক্ষিণেশ্বরে একটি পাগলী আসতো, ভক্ত। ঠাকুরকে বলতো, 'আমার মধুর ভাব'। একদিন ঠাকুর খাচ্ছে আর সেই সময় এসে উপস্থিত। যেই বলা, 'আমার মধুর ভাব' অমনি ঠাকুর যন্ত্রণায়, যেন বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলেন। আর বললেন, 'ওরে রামলাল শোন — ও কি বলছে মধুর ভাব, মধুর ভাব'। এরপর যখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কাশীপুর বাগানে রয়েছেন অসুখের সময়, তখন একদিন unguarded (একাকী) আছেন, সেই সময় পাগলী সুযোগ পেয়ে ফস্ করে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে ঢুকে পড়লো। অন্যরা তখন এসে সরিয়ে দিলে। ঠাকুর পরে বলেছিলেন, 'ও যদি তখন আমায় স্পর্শ করতো, তখনই দেহ যেতো।' এমনতর সব ব্যাপার। ভক্ত — শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত যাঁরা, তাঁরা ধরলে দেহ থাকে। এই যে অসুখ বিসুখ — এইজন্যই তো। কত রকমের লোক যেতো — কাউকে ফেরাতেন না কিনা! মনে কত কলুষ ভাব নিয়ে তারা যেতো আর স্পর্শ করতো, তাইতে অসুখ। তা নইলে তাঁর আবার অসুখ কিসের!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যারা এ ডিপার্টমেন্টের লোক তারা ঈশ্বরের কথা-বই, পবিত্র ভাব-বই থাকতে পারে না। ছট্‌ফট্ করে। একবার অশ্বিনী দত্তের বাবা, বরিশালের ব্রজমোহন বাবু রিটায়ার্ড সদরওয়ালা, ঠাকুরের কাছে কয়দিন রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কথাবার্তা হচ্ছে, পাঁচমিশেলী কথা, যেমন লোকদের হয়ে থাকে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসে আছেন — সমাধিস্থ। ব্যুত্থিত হয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা আর

এসব কথা বলবেন না; ঈশ্বরের কথা কন।’ যাই বলা অমনি ব্রজবাবু করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিবেদন করছেন, ‘প্রভো, আমাদের রোগ তো জেনেছেন, এখন কৃপা করে ওষুধ দিন।’ এই অবস্থা যাদের তারা ঈশ্বরের কথা-বই থাকতে পারে না। পুরীতে চৈতন্যদেব রয়েছেন — সমাধিস্থ। যেই ভগবানের নাম কর্ণে প্রবেশ করতো, অমনি বাহ্য চেতনা ফিরে আসতো। ঠাকুরেরও উ-টি দেখেছি, অন্তর্দশা একেবারে বাহ্য জ্ঞানশূন্য; যা-ই ঈশ্বরের নাম হয়েছে অমনি চেতনা। ঈশ্বরের নাম এম্‌নি ভিতরে ঢুকে কাজ করে।

ছোট জিতেন — আজ মঠে খোকা মহারাজ বলেছিলেন, ‘স্বামীজী, মহারাজ এঁরা থাকতে মহাপুরুষ এত কথা কইতেন না। এখন এমন বকছেন ফুরোয় না, কষ্ট হয় না। মাথা খারাপ হয়ে যাবে যে আমার, এত বকলে।’

শ্রীম — না, তাঁর কথায় কি মাথা খারাপ হয়? এতে জীবনীশক্তি বাড়ে। কেউ কেউ ঠাকুরকে বলতো, ‘আপনি এই যা দর্শনাদির কথা বললেন, এসব hallucination, মনের ভ্রম’। ঠাকুরের বালকের স্বভাব, বালক যেমন মায়ের কাছে সব কথা বলে, ঠাকুরও তেমনি জগন্মাতার কাছে বললেন, ‘মা, আমার দর্শনাদি এরা সব মনের বাতিক বলছে।’ জগন্মাতা বললেন, ‘মনের ভ্রম কি করে হয় বাবা, যা বলছো সব মিলে যাচ্ছে যে! তুমি যা বলছো সব সত্য।’ ভ্রম কি করে হবে? ঈশ্বর যে কথা ক’ন। দক্ষিণেশ্বরে, একঘর লোক, ঠাকুর বলছেন, ‘এই যে মা এসেছেন, এই যে মা এসেছেন — মাইরি বলছি মা এসেছেন।’ আর মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে। একদিকের কথা, অর্থাৎ ঠাকুরের কথা সব শুনতে পারছে। এত করে বলছেন, এত কথা বলছেন, তবুও কি লোকের চৈতন্য হয়?

একজন (শিবনাথ শাস্ত্রী) বলেছিলেন, ‘সব সময় ঐ নিয়ে থাকলে মাথা যে বেহেড হয়ে যাবে।’ ঠাকুর তখন শুনে উত্তর করিলেন ‘তা কি করে হয়? যাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য তাঁকে চিন্তা করে বেহেড হয় কখনও?’ বিষয় চিন্তা করে যদি বেহেড না হয়, জগৎ চৈতন্যকে চিন্তা করে বেহেড হয়?

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গুরুর শরণাগত হলে বেচালে পা পড়ে না। তিনি সর্বদা রক্ষা করেন — সর্বদা পিছে পিছে চলেন। ঈশ্বরই গুরু, তিনি-বই আর কেউ গুরু নাই। তাঁকেই ঠাকুর 'মা' বলে ডাকতেন। কেউ কিছু বললে, অমনি বলতেন, 'আমার ভাবনা কি, মা রয়েছেন — সব দেখছেন, সব জানেন, সব করাচ্ছেন তিনি। আমি খাই দাই, আর মা মা করি।' গুরু এমন জিনিস — তিনি ভক্তের জন্য ব্যাকুল, সব দেখেন। আচ্ছা, আমরা ভাবছি বেশী তাঁর কথা, না, তিনি ভাবছেন বেশী আমাদের কথা — কোন্‌টা? তিনি ভাবেন বেশী আমাদের জন্য। আমাদের অত ভাবতে হয় না। এই ঠিক করে স্থির হয়ে বসে থাকা ভাল। তবে, তিনি যা বলেছেন তা করতে হয় — জপধ্যান এইসব। বিদ্যেসাগর মশায়ের কথা, তাঁর দয়ার কথা শুনেছেন লোকমুখে, অমনি নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখে নিজেই এসে হাজির তাঁর ওখানে। হরিতকীবাগানে একটি ভক্ত নির্জনে গোপনে ঈশ্বরকে ডাকতেন। ওমা, তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির! কোন খবরাদি না দিয়েই গিয়ে হাজির। ভক্তটি তো একেবারে অবাক — আর মিনতি করে বলতে লাগলেন, 'কোথায় আমি যাব আপনার কাছে, না আপনিই খুঁজে খুঁজে এসে উপস্থিত।' ঠাকুর বলতেন, 'তাঁকে একটু একটু ডাক, তা হলে তিনি এসে বলে দেবেন এই এই কর।' তাইতো অত ব্যাকুল হতেন ভক্তদের জন্য। নরেন্দ্ররা ওখানে না গেলে গাড়ী করে ওদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতেন। এই কয়েক দিন না গেলেও গিয়ে হাজির হতেন। আবার যারা বিয়ে করে ফেলেছে এমনতর ভক্তদের বাড়িতে গিয়েও উপস্থিত হতেন, খবর নিতে। এইরূপ প্রায়ই হতো। আমরা তাঁর কথা কি ভাববো — আর কতটুকুই বা বলতে পারি। একসেরে ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? লুনের পুতুল সব আমরা — জানেন তো গল্পটা? একটা লুনের পুতুল অতি সাহস করে সমুদ্র মাপতে গিছলো, কিন্তু বেচারী আর ফিরে এসে কোন খবর দিতে পারলে না — no message! তিনি কর্তা

আমরা অকর্তা। তাঁর কথা শুনতে হয় — ধ্যানজপ করতে হয়।

অত করে বলেছেন, তবুও কি চৈতন্য হয় লোকের? কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাসেরই আবার ডিগ্রি আছে বলতেন। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। গুরুর মুখে, শাস্ত্রমুখে শুনে বিশ্বাস এক, নিজের কতক ধারণা হলে এক। আবার যখন ঈশ্বরদর্শন হয় তখনই এক। দুধ খেয়েছে মানে, তাঁর দর্শন হয়েছে, কথাবার্তা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। এ পাকা বিশ্বাস — বিজ্ঞানীর অবস্থা। এই বিশ্বাস নিয়েই ক্রাইস্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন।

বড় জিতেন — ঈশ্বরের কথা যত শোনা যায় তৃপ্তি হয় না।

শ্রীম — ও কি আর হয়, কত বড় সাগর। ঈশ্বর অনন্ত, কি করে হবে তৃপ্তি!

শ্রীম পুনরায় গুরুমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একবার একজন ভক্ত (শ্রীম) সংসারের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে ঠাকুরের ওখানে গেছেন আর বলছেন life is not worth living, মরাই ভাল এসব সাংসারিক দুঃখকষ্ট ভোগ করার চাইতে। ঠাকুর শুনে বললেন, 'কেন যাবে তুমি মরতে, দায় পড়েছে? তোমার যে গুরু রয়েছেন তিনি সব দেখছেন।' গুরু কি চারটিখানি কথা। বললেই কি মরা হয়? ঠাকুর বলেছেন, গুরুকে মানুষ জ্ঞান করলে কিছুই হবে না। কুলগুরুরা বা অন্যরা যে মন্ত্র দেন, মনে করতে হবে ঈশ্বরই ওঁদের মুখ দিয়ে বলছেন, ওঁরা যন্ত্রমাত্র। ঠাকুর বলতেন, এই সংসার-সমুদ্র এক গুরুই পার করতে পারেন; আর কারও সাধ্য নাই। গুরু মানে, ঈশ্বর।

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' — (গীতা ৭:১৪) আমার শরণাগত হলেই কেবল মায়াপাশ ছিন্ন হতে পারে, অন্য পথ নাই।

আমার সেকেণ্ড দর্শনের সময় গেছি, তর্কপ্রবৃত্তি আছে ভিতরে। ঠাকুর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার?' আমরা বললাম, নিরাকার। আরো বললাম, মাটির মূর্তি পূজাতে কিছুই নাই, ভগবানকে উদ্দেশ্য করে (ঐ মূর্তিতে) পূজা

করা উচিত। এই কথা লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। এসব কথার তখন খুব লেকচার হতো কিনা কলকাতায়। অমনি আমায় নির্বাক করে দিলেন এই বলে — 'তোমাদের কলকাতার লোকদের ঐ এক দোষ, খালি লেকচার দেওয়া। নিজে করবে না কিছুই, কিন্তু অন্যকে বোঝাতে যাবে।' বললেন, 'ও-বিষয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। এই জগৎ দেখ। তিনি সূর্যকে রোজ পাঠিয়ে দেন, ঋতু সব করে দিয়েছেন। বর্ষায় জল হয়। তাতে শস্য হয়। তা খেয়ে লোক বাঁচে। জন্মাবার পূর্বেই মায়ের মাইয়ে দুধ দিয়েছেন। সব বন্দোবস্ত ঠিক করে রেখেছেন। Spiritual world (ধর্মজগৎ) দেখ, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দেবালয়, তীর্থ, শাস্ত্র, সাধু — এ সব করে রেখেছেন। যারা এ পথ চায়, এই সব নিয়ে থাকবে। তিনি সকলের জন্য ভাবছেন। আমাদের ভাবতে হবে না কিছু।' এইসব কথা শুনে আমি তো অবাক্, একেবারে নিরুত্তর। তর্ক বন্ধ হলো চিরতরে। তাই তিনি কর্তা আমরা অকর্তা।

আর কি নিয়েই বা আমরা কর্তা বলি! এই শরীরটা নিয়ে তো! কিন্তু এটাও যে তিনিই দিয়েছেন। দেখুন না, কি সুন্দর system (নিয়মপ্রণালী) এর digestive power (পরিপাক শক্তি), লিভার স্প্লীন, nervous system (স্নায়ুমণ্ডলী) কত কি করে দিয়েছেন। তাই কলেবর বলে। Sensual instinct (রিপুর পীড়ন) যার জ্বালায় সব অস্থির, এও তাঁর করা। একটু পরিশ্রম হলো, অমনি নিদ্রা। এতসব কাণ্ড করে দিলেন তিনি, আর আমরা বলি, কর্তা আমি।

ঠাকুর নিজে নিজে বলতেন, লোক এই 'কর্তা কর্তা' বলে কি করে? আমি তো দেখছি সবই তিনি। কিন্তু 'আমিটা' যাবার নয়। তাই আমি তাঁর দাস, এ ভাব নিয়ে থাকতে বলতেন। তিনি সব করেছেন, আবার সকলকে দেখছেন। একটা মুটে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সামনে কালীবাড়ি পড়লো। মাথায় মোট রেখেই আড়ষ্ট হয়ে প্রণাম করবে। তিনি তাও দেখছেন, তার জন্যও ভাবছেন। হয়তো একেবারে সামনে এসে দর্শন দিচ্ছেন। দেহটাও মোট। তাঁকে নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে বলতে হয়। তাতে তাঁর কৃপা হয়, কৃপা হলেই হয়ে

গেল সব — নিশ্চিন্তি। তাঁকে ডাকলে কর্ম কমে যায়, কর্ম কম হলেই কর্তাও কমে, এ দুটো relative (পরস্পর-সম্বন্ধ)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তিনি বলতেন, মা, আমাকে 'বিদ্যার আমি' দিয়ে রেখেছেন তাই আছি। 'বিদ্যার আমি' মানে, তাঁর নাম — গুনগান কীর্তন, ভক্তি ভক্ত, এই সব নিয়ে থাকা। শেষ অবস্থায় কাশীপুরে দেহ যাবার কয়দিন পূর্বে বলেছিলেন, " 'আমিটা' খুঁজে পাচ্ছি না, সবই দেখছি তিনি।" যতক্ষণ কাজ করাবেন ততক্ষণ অবতারের 'আমি' রেখেছিলেন। এখন কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাই উঠিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু জীবের 'আমি' যায় না — ফেক্ড়ী বেরোতেই থাকে অশ্বত্থ গাছের মত। অবতার যেন মূলো গাছ, শিকড়শুদ্ধ উঠে আসে — 'আমি' থাকে না। তাই ঠাকুর বলছেন, 'আমিটা' খুঁজে পাচ্ছি না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর যে কতবড়, তা কি আমরা বুঝতে পারি? নিজের তুলনা নিজেই। আর নিজেই নিজেকে চিনেছিলেন। গীতায়ও এই কথাই রয়েছে

"স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম্," (গীতা ১০:১৫)।

"স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে" (গীতা ১০:১৩)।

অর্জুন বলেছিলেন, 'তুমি নিজেই নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রচার করছো, তাই বিশ্বাস করছি। আবার আছে,

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' (গীতা ৯:১১)।

আমি যে অব্যয় অক্ষর পুরুষ, এই কথা না জেনে মূর্খগণ আমাকে মানুষ জ্ঞান করে। ঠাকুর বলেছিলেন ভক্তদের, 'তোমাদের কিছুই করতে হবে না। এখানে এলে-গেলেই হবে।' এ কথা কে বলতে পারে? তিনি নিজে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, নিজে এ কথা জানতেন, তাই ঐ কথা বলেছিলেন। জপতপের উদ্দেশ্য তাঁকে লাভ করা, এখানে সাক্ষাৎ লাভ হচ্ছে, তা হলে ও-সবের আর দরকার কি? তাঁর কথায় বিশ্বাস হলে হয়ে গেল।

শ্রীম-র এই অপূর্ব ঈশ্বরীয় ভাবপ্রবাহে অভিভূত হইয়া বড় জিতেন আজও বলিয়া উঠিলেন, 'Thy will be done', জীবের

আমি যাবার নয় অথচ 'দাস আমি'-ও হচ্ছে না। তাঁর কথায়ও বিশ্বাস স্থায়ী হয় না — এ দোটানায় পড়িয়া বুঝি জিতেনবাবু আর্তস্বরে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শ্রীম আজও যেন পূর্বদিনের মত পুনরায় অঙ্কুশবিদ্ধ করিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, জ্যাঠামী বন্ধ কর। প্রার্থনা কর মনে মনে ব্যাকুল হয়ে। শুধু মুখে বললে কি হবে? কাঁদ, নির্জনে গোপনে। 'Ask and it shall be given to you'. ব্যাকুল হয়ে চাইলে তিনি সব করে দেন। '... What man is there of you, whom if son ask bread, will he give him a stone? ..... if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children; how much more shall your Father which is in heaven, give good things to them that ask Him?' (St, Matthew VII : 7,9,11) ক্রাইস্ট বলেছিলেন এই কথা। মানুষই যদি সন্তানের প্রার্থনামত সব করে দেয়, তাহলে ঈশ্বর কি ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারেন না? অন্তরের সহিত বলতে হয়, মনে মনে। তিনি সব পূর্ণ করেন।

কলিকাতা। ১৩ই মে ১৯২৩ খ্রীঃ, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৩০।
রবিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন — দাসীর মত সংসারে থাকা, — উপায়

১

শ্রীম মেজেতে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। মর্টনের দোতলার ঘর। নিত্যকার ভক্তগণ ছাড়াও বহু ভক্ত-সমাগম হইয়াছে। খড়দহ হইতে একজন গোস্বামী আসিয়াছেন। দেওঘর হইতে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দও রহিয়াছেন। তিনি বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে নানা পরামর্শ করিতেছেন। সন্ধ্যার আলো আসায় শ্রীম কথা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইবার রমেশ রামকৃষ্ণ-বন্দনা গাহিতেছেন। শান্তি গাহিলেন, 'শ্মশানে কেন মা শ্যামা।' শ্রীম-র পৌত্র অরুণ গাহিতেছেন, 'বিকল্পবিহীন সমাধি মগন ব্রহ্মে চিরদিন আসন তোমার।' ভজন শেষ হইল। শ্রীম-র মন বুঝি শেষের সঙ্গীতের রামকৃষ্ণ-ভাবসাগরে নিমজ্জিত। তিনি তাঁরই কথা কহিতেছেন আবেগভরে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সাধন ভজন যতই কর test (পরীক্ষা) হলো তাঁর সঙ্গে আলাপ করা দর্শন করে। একটু ধ্যানট্যান চোখ বুজে ক'রে বললেই হলো না, আমার realisation (ঈশ্বরদর্শন) হয়ে গেছে, আমি সব দেখে ফেলেছি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে একঘর লোক বসা — বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ছিলেন। ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন।' এই হলো test (পরীক্ষা) — দর্শন ও আলাপ।

চারজন ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (নবাগতদের প্রতি) — বুঝলেন, সাধন ভজনের test (পরীক্ষা) হলো দর্শন করে আলাপ করা। কল্পনায় নয়, সাক্ষাৎকার করে কথা কওয়া।

শ্রীম (বড় জিতেন প্রবেশ করিলে) — শুনছেন জিতেনবাবু!

সাধন ভজনের test হলো, সাক্ষাৎ করে কথা কওয়া। একটু চোখ বুজে বললেই হবে না আমার দর্শন হয়ে গেছে; — দর্শন, স্পর্শন, আবার কথা। জগতের মায়ের সঙ্গে কথা কইতেন একঘর লোকের সামনে। আবার প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন।' এক পক্ষের কথা সকলে শুনতে পাচ্ছে। এমনতর ব্যাপার! এসব কেন করলেন তিনি — ঢং করে নয়। মানুষ বলে কিনা, আমার ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে, কিংবা অমুক ঈশ্বরদর্শন করেছেন। তাই স্পষ্ট করে সব বলে গেছেন। এই অবিশ্বাসের যুগে যতটা সম্ভব সকলকে দেখানো, তাই দেখিয়ে গেছেন। এ যেন public demonstration of God, জনসাধারণকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী করানো, চোখের সামনে এনে ধরে দিয়ে। একঘর লোক বসা। সেও আবার কেমন, সকলেরই প্রায় modern sceptical outlook (সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গী), ইংরেজী শিক্ষায় যা হয়। শীঘ্র বিশ্বাস করতে চায় না লোক। তাই তাঁকে এইরূপ পরীক্ষা দিতে হয়েছে! এতে আর কিন্তু নাই। তাই ডিগবী (Digby) সাহেব বলেছেন, 'He revealed God to weary travellers' — রাস্তার ক্লান্ত পথিককে পর্যন্ত ঈশ্বর দর্শন করিয়েছেন।

এটর্নি বোস আসিয়াছেন।

শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — শুনছেন বীরেন বাবু! একঘর লোক, তাতে বিজয় গোস্বামী রয়েছেন। ঠাকুর বললেন, 'মা এসেছেন'। তারপর আবার কথা কইতে লাগলেন। তাই সাধন ভজন যত কর test (পরীক্ষা) ঐখানে। দর্শনের পর কথা — একেই realisation (ভগবদ্দর্শন) বলে।

বড় জিতেন — আচ্ছা, আমাদের অন্তরাত্মাই তো কথা ক'ন?

শ্রীম (উপহাস করিয়া) — উ-উ, অতদূর থেকে কি বলা যায়? এসব হাটের মধ্যে না ঢুকলে বলা চলে না। দূর থেকে (হাটের) শোঁ শোঁ শব্দ মাত্র শোনা যায়। ঢুকলে সব দেখা যায় — স্পষ্ট ক'রে সব বোঝা যায়। ইজি চেয়ারে বসে, চুরুট মুখে দিয়ে বলবার কথা

এসব লয় (নয়)! হাস্য।

বড় জিতেন — আজ আসতে দেরী হয়ে গেল — বাজে কথা কইতে কইতে।

শ্রীম — না, আপনারা বাজে কথা কেন কইবেন? মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর দেয় — রাবড়ী খেলে রাবড়ীর। আপনারা রাবড়ী খেয়েছেন তারই ঢেকুর দেবে।

বড় জিতেন (বিনীত ভাবে) — আপনি কারো সেবা নেন না। তাই দেখে আমিও তাই অভ্যাস করছি কিছু কিছু। স্ত্রীকে বলেছি, নিজেই সব করবো।

শ্রীম — ও — না, না; আপনি সেবার মানেই বোঝেন নি। সেবার মানে হলো — প্রত্যেকের ভিতর নারায়ণ আছে, তাঁর সেবা নিজে করা — অন্যকে না করতে দেওয়া। তাতে নিজেরই লাভ। আমি কি আমার সেবা করি? উত্তম ভক্ত দেখেন সর্বত্র ভগবান বিরাজমান। তাই সকল জীবকে সম্মান আর সেবা করেন। নিজের ভিতরও ভগবানকে দর্শন করেন, তাই তাঁর সেবা করেন নিজেই। লোকের মন শুদ্ধ নয়, তাই সবেতে তাঁকে দেখতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ, তাই বড় বড় কয়েকটা বেছে নিয়েছেন — যেমন অশ্বত্থ, হিমালয়, চন্দ্র, সূর্য, সাগর। এইগুলিতে তাঁর বেশী প্রকাশ।

(জনৈক ভক্তের প্রতি) চোখই বোজ আর যাই কর, test (ঈশ্বরদর্শনের পরীক্ষা) হলো ঐ — কথা কওয়া; দর্শন, স্পর্শন ও আলাপন।

১৪ই মে ১৯২৩ খ্রীঃ; ৩১শে বৈশাখ ১৩৩০; সোমবার, কৃষ্ণা চতুর্দশী।

২

পরদিন শ্রীম ঐ ঘরেই মেজেতে বসিয়া আছেন ভক্তসঙ্গে। আজ মাসপ্রথম, তাই অনেক ভক্ত। এখন সন্ধ্যা-ধ্যানের পর ভজন হইতেছে। রাখাল গাহিলেন, 'রামকৃষ্ণ চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।' অপর একজন গাহিতেছেন 'তুমি ব্রহ্ম রামকৃষ্ণ। তুমি

কৃষ্ণ, তুমি রাম।’ শ্রীম-র সর্দি হইয়াছে। তিনি ভক্তগণকে কথামৃত পাঠে নিরত রাখিয়া আহার করিতে তিনতলায় গেলেন। ডাক্তার বক্সী পড়িতেছেন, ‘মণির গুরুগৃহে বাস।’ এখন ৮॥ টা। শ্রীম আসিয়া আবার ভক্তসভায় বসিয়াছেন।

ডাক্তার (পড়িতেছেন) — শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, — ‘ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার। নরলীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল, নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে — নলের ভিতর দিয়ে আসছে। কেবল ভরদ্বাজাদি বারজন ঋষি রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।’

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভগবানকে অবতার হয়ে আসতে হয় জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য — আর শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁর আগমনের পূর্বে শাস্ত্রের অর্থ কদর্থ হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ এলেন, এসে গীতায় সর্বশাস্ত্রের মর্ম প্রচার করলেন। গীতা সর্বশাস্ত্রসার। গীতার সব সত্য। ঠাকুর বলেছিলেন, ‘গীতার প্রত্যেকটি কথা সত্য — এতে আঁচড় দেবার যো নেই।’ অনেকে বলেন, শাস্ত্রাদিতে অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত — interpolation, কিন্তু গীতার কথা বলেছেন, সব ঠিক। ভগবান না এলে কে বোঝাবে শাস্ত্র? — পণ্ডিতের কর্ম নয়। সাধনভজন না করলে অর্থবোধ হয় কৈ?

শুধু শাস্ত্রে কি হবে? ওতে তো আর ভগবান নাই। প্রথম প্রথম একটু দেখে নিতে হয়, তারপর, সাধন। সাধনশিক্ষা দিতে অবতার আসেন। ‘আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে শাস্ত্রের ভাব সাধন কর’ এসে এই কথা বলেন। আর যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের বিভিন্ন শাস্ত্র জানা দরকার। বিবেকানন্দ ও-দেশে (পাশ্চাত্ত্য) শুধু quote (উল্লেখ) করতেন authority (মহাজন-বাক্য) — ক্যান্ট এই বলেছেন, হেগেল এই বলেছেন। তা নইলে লোক কথা নেয় না যে!

তিনিই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারেন যিনি গুণাতীত — colourless, সাদা চশমা যার পরা আছে। ঠাকুরের ঐ-টি ছিল, শ্রীকৃষ্ণেরও ছিল। তা নইলে লাল চশমা পর, সব লাল দেখবে। নীল,

হলুদ, যে যে রকম চশমা পরে সেইরূপ দেখে। আপন আপন ভাবের হবে। গীতায় নিরপেক্ষ অর্থ দেখা যায়। ঠাকুর যেকালে বলেছেন গীতা ঠিক — It is a Gospel truth (ধ্রুবসত্য)।

জনৈক ভক্ত — আজ্ঞে, সংসারে কিভাবে থাকা উচিত?

শ্রীম — বড়লোকের বাড়ির দাসীর মত। ঠাকুর এই কথা একজন ভক্তকে বলেছিলেন। 'আমার হরি', 'আমার ঘর' — এই সব কথা বলে থাকে দাসী, আর সব কাজ করে সংসারের। কিন্তু মন পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে নিজের কুটীরে, নিজের ছেলেমেয়েদের উপর। তেমনি সব করতে হবে সংসারের, কিন্তু মন থাকবে ঈশ্বরে।

কচ্ছপের মত সংসারে থাকবে — এও বলেছিলেন। কচ্ছপ ডিম পাড়ে আড়ায়। নিজে থাকে জলে। কিন্তু মন পড়ে আছে ডিমে।

নষ্টা স্ত্রীলোকের মত সংসারে থাকতে হয়, — এই কথাও বলেছিলেন। নষ্টা স্ত্রী সংসারের সব কাজ করছে, কিন্তু মনটা পড়ে আছে উপপতির উপর। তেমনি সংসারের সব করা আর মনে মনে জানতে হবে, আপনার কেবল এক ঈশ্বর। পাঁকাল মাছের মত থাকা সংসারে। পঙ্কে থাকে কিন্তু গা মসৃণ — একটুও পঙ্ক লাগে নাই। আর বলতেন, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়, তা হলে আঠা লাগে না। জ্ঞানভক্তি লাভ করে সংসারে থাকলে আর ভয় নাই।

কথাটা হচ্ছে ঈশ্বরে মন রেখে সব কর। কিছুদিন নির্জনে গোপনে সাধন ভজন করে ভক্তিলাভ করে তখন সংসারে যাও সংসার কর। এতে অনিষ্ট হবে না। তখন সংসার, সংসার থাকে না।

ঠাকুর বলেছিলেন, যেমন চুণ দিলে জোঁক পড়ে যায়, তেমনি ভক্তিলাভ হলে কাম, ক্রোধ, মোহ এ সব খসে পড়ে যায়। কঠিন বটে, কিন্তু অভ্যাস করলে সহজ হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, নির্জনে গোপনে। আর সৎসঙ্গ করতে হয় — মাঝে মাঝে নির্জনবাস। এই সব উপায় বলেছিলেন।

ভক্ত — এত সব জেনে শুনেও কেন ভুল হয়ে যায় কাজের বেলায়?

শ্রীম — এটি তাঁর চাতুরী — তাকেই মায়া বলে। এ না হলে সৃষ্টি যে রক্ষা হয় না। সৃষ্টির পুষ্টির জন্য, তার লীলার জন্য এ-টি হবেই। ভুল-ভ্রান্তি না থাকলে জগৎ চলে কি করে? সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ফেললে, তখন সৃষ্টি থাকে কিরূপে? তাঁর scheme-টি (পরিকল্পনা) এমন যে অজ্ঞানতা থাকবেই। উপায় তাঁর শরণ। শরণাগত হলে আর সংসারে বদ্ধ করেন না, তখন ভুল হয় না।

সকলেই তো ভুলে রয়েছি। দৈবাৎ দু একজনের ভুল ভেঙ্গে গেছে দেখা যায়। মানুষগুলি দেখুন না কি করছে, সকাল থেকে অর্থোপার্জনের চেষ্টা, আহার, বিশ্রাম আর সন্তানোৎপাদন এই নিয়ে ব্যস্ত। কয়জন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল? মিহিজামে ছাগলগুলোকে দেখতাম বাচ্চা নিয়ে বের হয়েছে, এদের ঘাস খাওয়া শিখাচ্ছে, আর আত্মরক্ষার জন্য ঢুঁ-মারা শিখাচ্ছে মা। এমনি কাণ্ড!

সৃষ্টির scheme-এ (পরিকল্পনায়) অজ্ঞানতা না থাকলে তিনি আসেন কি করে? কলুষভাব যখন খুব বেড়ে যায় তখনই আসেন — 'সম্ভবামি যুগে যুগে' (গীতা ৪:৮)। ভুল-ভ্রান্তি থাকবেই এইটা জেনে চলতে হবে। তাই দেবতারা দেবীর স্তব করছেন,

'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তি-রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥' (চন্ডী ৫:৭৪-৭৬)

তিনিই ভ্রান্তি করেছেন, তিনিই আবার শান্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (গীতা ৭:১৪) তাঁর শরণ গ্রহণ করলে এই ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে উদ্ধার হওয়া যায়। ঠাকুর বলতেন, 'মা পরদা সরিয়ে নেন্, তখন তাঁর মুখ দর্শন হয়। ভুল-ভ্রান্তি তখনই যায়।'

৩

আজ একটি ভক্ত উত্তরাখণ্ড হইতে আসিয়াছেন। তিনি ঋষিকেশ, স্বর্গাশ্রম, হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি তীর্থস্থান ও সাধুদর্শন করিয়াছেন। পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ডের গঙ্গাজল ও প্রসাদ ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীম দর্শন, স্পর্শন,

ও সেবন করিতেছেন। আর তপোভূমি ও মহাত্মাদিগের কথা পরমাগ্রহে শ্রবণ করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেছেন। কেহ উত্তরাখণ্ডে যাইবে শুনিলে শ্রীম আনন্দে আপ্লুত হন। আর কেহ ফিরিয়া আসিলে মনে করেন যেন আপন জন আপন গৃহ হইতে আসিয়াছেন। আর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধু, তীর্থ, দেবালয় ও হিমালয়ের কথা শ্রবণ করেন। কেহ হিমালয়ে বাস করিলে শ্রীম তাহাকে বলেন 'বড় ঘরের ছেলে'। তিনি বলেন, উত্তরাখণ্ড যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ, যক্ষের ধনের ন্যায় স্বীয় বক্ষে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে চায় অকাতরে তাকে দেয়। দর্শনেই কত পুণ্য আর যারা ঐ স্থানে থাকিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করেন তাঁদের কথা কি! ঐ স্থানে থাকিয়া নির্জনে গোপনে ঈশ্বরারাধনার সঙ্কল্প করিলেই বলিয়া থাকেন — It is a sight for the Gods to see (এই দৃশ্য দেবগণেরও বাঞ্ছনীয়)। আজ শ্রীম-র ভক্ত-মজলিসে অন্য কথা নাই। অন্য চিন্তা নাই। হিমালয়, গঙ্গা, সাধু, তীর্থ, তপোবন, তপস্যা এই সব পবিত্র বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা প্রদীপ আসিয়াছে। অল্পক্ষণ ঈশ্বর চিন্তার পর পুনরায় উত্তরাখণ্ডের কথা উঠিয়াছে। শ্রীম-র হাতে একখানা পত্র। পত্রখানা মাথায় ঠেকাইতেছেন। একজন সাধু লিখিয়াছেন হরিদ্বার হইতে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন মাহাত্মাদের এই প্রসাদ। প্রসন্ন হয়ে যা দেন তাই প্রসাদ। এই সাধুটি আড়াই বৎসর পূর্বে সংসার ত্যাগ করেছেন — লুকিয়ে লুকিয়ে সাধুসঙ্গ করতেন। পয়সা নেই ছেলেমানুষ, হেঁটে হেঁটে এখানে, মঠ, উদ্বোধন এই সব স্থানে যাতায়াত করতেন। পাঁচ মাইলের উপর হবে এখান থেকে বাড়ি। তিনজন আসতেন, দুজন সাধু হয়েছেন। ঠাকুরের এক একটি মঠ, আশ্রম হচ্ছে, আর কত ছেলে তৈরি হচ্ছে। আহা কি serious (দৃঢ় সংকল্প), ঈশ্বরের জন্য একেবারে ব্যাকুল! সন্ন্যাসী হয়েছেন এখন। চিঠি লিখেছেন, তা কেমন অভিমানশূন্য। এই হলো concrete example (ব্যাকুলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত)। এই সব সম্বন্ধে discussion

(আলোচনা) academic discussion (কেতাবী আলোচনা মাত্র) হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ হলো practical life (কার্যকর জীবন)। সব ভোগবাসনা ছেড়েছেন — কেবল ঈশ্বরকে চান। আবার কি রকম লিখেছেন, 'এই জীবনেই যেন তাঁকে পাই। আর ঠিক ঠিক সাধুজীবন যেন যাপন করতে পারি।' কি রকম দেখতুম — দুপুর রৌদ্রে পায়ে হেঁটে ঘামতে ঘামতে এসে উপস্থিত — হাতে মা কালীর প্রসাদী ফুল। এমন না হলে কি এতো serious (ব্যাকুল) হয়।

'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' (গীতা ৬:৪০) — এঁদের কি ঈশ্বর কল্যাণ না করে থাকতে পারেন?

বড় জিতেন গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ ভক্তপরিপূর্ণ — সকলে শ্রীমকে ঘিরিয়া উপবিষ্ট।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — আজ a voice (একটি বাণী) উত্তরাখণ্ডের থেকে এসেছে। ঠাকুরই পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের শোনাবার জন্য — শিক্ষার জন্য। আহা, এরূপ হবে না, কি ideal (আদর্শ)! 'শুধু তোমাকেই চাই আর কিছু না' — এ ideal (আদর্শ) ধরে থাকলে হবে না তো কি?

ঠাকুর তাই বলতেন, যারা বিয়ে করে নাই তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। (তর্জনী দিয়া শূন্যে একটা রেখা টানিয়া) এই একটা লাইন আছে। এর এপারে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এই সব আছে। এটি cross (অতিক্রম) করলে দেবত্ব। লাইনটি হলো ভোগের। ভোগ ত্যাগ করলেই একেবারে দেবত্ব। এঁরা তাই করেছেন।

আর যারা বিয়ে করে ফেলেছে তাদেরও chance (সুযোগ) খুব। কেননা এখন যে অবতার এয়েছেন। সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এইটি ধরে থাকলেই হয়ে যাবে। একটু একটু করে আলো পায় — slow but sure, আর যারা সংসারে প্রবেশ করেনি তারা যেন একেবারে মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে — একেবারে flood of light! তাইতো কেশব সেনকে বলেছিলেন, 'ঘরে রয়েছো একটা chink (ফাঁক) দিয়ে আলো পাচ্ছ। মাঠে দাঁড়াতে পাচ্ছ না, সেখানে আলোর ছড়াছড়ি।'

৪

একজন গৃহস্থ ভক্ত — আমাদের আশা নাই; এদিক ওদিক কোনটাই হলো না। তাঁর কথা পালন করতে পারছি কৈ?

শ্রীম — ঠাকুর একজন ভক্তকে বলেছিলেন, 'তোদের জন্যই যত ভাবনা, বিয়ে করে ফেলেছিস। ওরা বিয়ে করেনি অত ভাবতে হয় না ওদের জন্য।' দেখুন যারা বিয়ে করে ফেলেছে ঈশ্বর তাদের জন্যও ভাবেন। বেশী ভাবনা, তাই বলছেন। তাদের case complicated (জটিল) কিনা! মাথায় মোট — মা কালীকে নমস্কার করছে এঁকেবেঁকে। তার জন্য মা ভাবেন বেশী। মুখে সিগার, হাতে ছড়ি, সামনে পড়লো একটু 'নড়্' করলে — এও একরকম ভক্ত আছে। তাঁকে আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করা উচিত। তা হলেই বাকিটা তিনি করবেন। 'পঙ্কে বদ্ধ কর করী (হাতী), পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি।' Complicated, difficult case — কঠিন জটিল অবস্থা যদি সহজ না করতে পারেন তা হলে অবতার কেন? শরণাগত হলে 'দুরত্যয়া' মায়া থেকেও পরিত্রাণ লাভ হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভোগ মহাপুরুষদের মধ্যেও থাকে দেখা যায়। ভোগ-ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। সে গৃহে থেকেও হয়। খুব কঠিন কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় হয়। দেখছি এমন কেউ কেউ আছে — নাই বা নিলে গেরুয়া, শুধু গেরুয়া সাইন বোর্ড বই তো নয় — ঘরে থেকে ভোগ-ত্যাগ করে আছেন। এমন সব মহৎ লোকও আছে। তাই তাদেরও chance (সুযোগ) এখন। কারণ এখন যে অবতার এয়েছেন। এদের একটু একটু করে ছাড়িয়ে নেন। আর ওরা, যারা বিয়ে করে নাই, একেবারে মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে — আলোর বন্যায় একেবারে।

একজন ভক্তের প্রকৃতিতে একটু ভোগ ছিল। ঠাকুর একটু একটু করে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। বিয়ে করেছিল, মাঝে মাঝে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। আর রাত দুপুরে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করতেন, 'মা ওকে ডুবিও না।' ওদিকে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন, আর এদিকে কল টিপছেন। মাছ ধরতে ভালবাসতো; ঠাকুর বলেছিলেন, অমুকের সঙ্গে

আলাপ রাখবি, তাহলে মাছ ধরতে দেবে। একটু কাজ বাকি থাকলে, ভোগ থাকলে, গুরু তা করিয়ে নেন। শেষে একেবারে ত্যাগ।

শুকলাল — আচ্ছা ভোগের তো শেষ নাই, অফুরন্ত — একটার পর আর একটা আসে। শেষ হবে কি করে?

শ্রীম — ঈশ্বর যে ধরে রয়েছেন, গুরু সর্বদা পাছে পাছে ধরে আছেন। ভোগ কি ঐ ভক্তটি করেছে? ঠাকুর করিয়ে নিলেন। কেন, না — নিশ্চিন্ত হবার জন্য। গুরু ধরা থাকলে আর ভয় নাই। যেমন ছেলে খাচ্ছে, মা জানে কতটা খেলে পেট ভরবে, কতটা খেলে অসুখ করবে। পেট ভরলেই অমনি সরিয়ে নেয়।

ঈশ্বরই ভাবেন আমাদের জন্য বেশী, আমরা কতটা চিন্তা করি তাঁর জন্য! (ভক্তদের প্রতি) আমরা ভাবি, কি তিনি ভাবেন বেশী, কোনটা? তিনিই ভাবেন বেশী। পঙ্গুকে দিয়েও তিনি গিরি লঙ্ঘন করাতে পারেন। আর একজন ভক্ত দুঃখকষ্ট পেয়ে দেহত্যাগ করতে গিছলো, ঠাকুর শুনে বললেন, 'কেন তুমি তা করতে যাবে? তোমার যে গুরু রয়েছেন, ভাবনা কি?'

"যীশুর কাছে একটি ধনী ভক্ত গিয়েছেন। খুব ধর্মপ্রাণ, দান ধ্যান করেন, সত্যপালন, সংযম এই সবই পালন করেন — Ten Commandments. তাঁকে দেখে বললেন — তোমার সবই খুব ভাল তবে একটা জিনিসের অভাব আছে — 'One thing thou lackest... Give (your all) to the poor... and come... and follow me.' (St. Mark 10:21) — বিষয় সম্পত্তি সব ছেড়ে আমার কাছে চলে এসো। তখন তোমায় ধর্ম শিক্ষা দেব। ভক্তটি পারলেন না — আসক্তি প্রবল ছিল তাই। এর এই অবস্থা দেখে অন্য ভক্তরাও গালে হাত দিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় তাঁরা বললেন, 'প্রভো, আমাদের অবস্থাও ঐরূপ — ভিতরে ভোগবাসনায় পূর্ণ। উনিই না হয় ধরা পড়েছেন।' ক্রাইস্ট তখন অভয় দিয়ে বললেন — 'ও-বিষয় তোমাদের ভাবতে হবে না, আমি সব জানি। যেহেতু তোমরা ঈশ্বরে শরণ নিয়েছো, আমি সব দূর করে দেব — সব বাধা। তোমাদের কোনও ভয়

নেই।' অসম্ভব সম্ভব হয় তাঁর ইচ্ছায় — insuperable difficulties, দুর্লঙ্ঘ্য বিপদও দূর হয় তাঁর কৃপায় — 'With men this is impossible, but with God all things are possible.' (St. Matthew 19 : 26) বাজীকর হাত নাড়িয়ে দড়িটার হাজার গাঁট খুলে ফেললে। কিন্তু দশ হাজার লোক ছিল — তারা একটাও খুলতে পারলে না কেউ। এমনতর ব্যাপার। তাই গুরুর শরণাগত হতে হয়। গুরু মানে ঈশ্বর। তিনি সদ্য অবতার হয়ে এসেছেন। ধনীদের কথায় বলেছিলেন — তারা না পারে ভোগ ছাড়তে, না ঈশ্বরের শরণ নিতে — 'It is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.' (St. Matthew 19 : 24) ছুঁচের ভিতর দিয়ে উটের যাতায়াত সম্ভব, কিন্তু ধনাসক্তের ঈশ্বরলাভ অসম্ভব।

সাধুর পত্রখানা শ্রীম-র ইচ্ছায় ডাক্তার দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতেছেন। পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। শ্রীম পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, কি ব্যাকুল! লিখেছেন যেন এ জীবনেই হয় — ঈশ্বরদর্শন। তাইতো বলি, এখনও যারা বিয়ে করেনি তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। ইচ্ছা করলেই এই অতুল সম্পদের অধিকারী হতে পারে। অফুরন্ত শান্তিসুখ লাভ করতে পারে। বিয়ে হয়ে গেলে একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। পথ অত সোজা থাকে না। এদের কেরমে (ক্রমে ক্রমে) হয়। আর ওদের, যেমন এই সাধুটির, চট্ করে হয়ে যায়। মাঠের মাঝে যেন দাঁড়িয়ে আছে — আলোর অভাব নাই, চারিদিকে ছড়াছড়ি।

ঈশ্বর সকলের জন্যই ভাবেন। যোগীদের জন্যও ভাবেন — যেমন এই সাধুরা। আবার এই যোগী-ভোগী — যেমন পাণ্ডবগণ, তাঁদের জন্যও ভাবেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা থাকতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও War Council-এর (যুদ্ধ সভার) প্রেসিডেন্ট, আবার অর্জুনের সারথি। ঈশ্বর ভোগীদের জন্যও ভাবেন। তবে

ভক্তের জন্য তাঁর ভাবনা বেশী।

১৬ই মে ১৯২৩ খ্রীঃ।

৫

অপরাহ্ন সাড়ে ছয়টা। মর্টন স্কুলের দোতলার ঘরে শ্রীম ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন। 'আগরপাড়ার ছেলেটি' — এক্ষণে ঠাকুরের বৃদ্ধ ভক্ত — আশুবাবু আসিয়াছেন। আর ঢাকা হইতে একটি প্রাচীন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্ববঙ্গে ঠাকুরের ভাব প্রচারের কথা হইতেছে।

শ্রীম (ঢাকার ভক্তের প্রতি) — হাঁ, পূর্ব্ববঙ্গে এ ভাব নিয়েছে বেশী। তাদের রোখ্ আছে। এ দেশের লোক অনেক বুঝে সুঝে তবে নেবে। আজকাল মঠে বোধ হয়, অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের লোক।

ঠাকুর ও-দেশে যেতে চেয়েছিলেন। কারুকে কারুকে পাঠিয়েও দিছলেন দেখতে। পদ্মা দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল। তিনি পূর্ব্বের বারে (পূর্ব্বাবতারে) ওখান থেকে, সিলেট থেকে এসেছিলেন কিনা, তাই পূর্ব কথা মনে হওয়ায় দেখতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দকে একদিন বলেছিলেন, তখন নূতন যাওয়া আসা করেন — বছর উনিশ বয়েস, "গৌরাঙ্গের নাম শুনেছিস, এই যে লোকে 'গৌর গৌর' করে আমি সেই গৌরাঙ্গ।" বিবেকানন্দ শুনে ভেবেছিলেন, লোকটা পাগল নাকি, বলে কি? পরে বন্ধুদের (শ্রীমকে) এই কথা বলেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছিলেন, 'ধ্যান করবার সময় আমি আপনাকে দেখেছি ঢাকায়, এই যেমন পাশে বসে আছেন।' বিবেকানন্দ প্রথমটা একটু 'ই' (দর্শনাদিতে অবিশ্বাসী) ছিলেন। পরে বলতেন, 'কি করে আর অস্বীকার করি।' অর্থাৎ তাঁরও দর্শনাদি হয়েছে।

ঈশ্বরীয় দর্শনের কথা বেশী বলতে নেই। ঠাকুর যদি দেখতেন, কেউ ফড়র ফড়র করছে, তা হলে তাকে ধমক দিয়ে বলতেন, 'আমাকেও বলবি না দর্শনাদির কথা।' ঈশ্বর গোপনের ধন — গোপনে রাখতে হয়। নয়তো ভাব নষ্ট হয়ে যায়। নির্জনে গোপনে তাঁকে ডাকতে হয়। আর দর্শন হলে তখন,

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।

(ও মন) তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥'

ঈশ্বর-দর্শনের sign (লক্ষণ) আছে — বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ ও পিশাচবৎ হয়ে যায়। কর্ম সব কমে যায় —

'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি।' তখন অন্য বাসনাও থাকে না। আর সংশয় সব চলে যায়। বেদে আছে এই সব কথা —

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'। (মুন্ডক উপঃ ২:২:৮) জিতেন্দ্রিয় হয় — কামক্রোধ জয় হয়। শুচি অশুচি থাকে না — হয়তো বাহ্যে বসেছে, সামনে একটা কুল পেল, অমনি মুখে দিয়ে খেয়ে ফেললো। ঠাকুরের এই সব অবস্থা হতো।

ডাক্তার, বিনয়, বঙ্কিম ঘোড়ই ও বীরেন বোস একসঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় জিতেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীম ক্ষণকাল অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন। কথা বন্ধ হইয়া গেল। পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঐ শুনুন ঈদের বাজনা। তাঁর মুসলমান ভক্তগণ তাঁকে নিয়ে আনন্দ করছে। তাঁরা একটা religious community (ধর্ম সম্প্রদায়), তাই এতো রোখ্। এই একমাস রোজ রাত তিনটায় সব মস্‌জিদ থেকে priest-রা (মোল্লাগণ) ডাকতেন লোকদের — 'ওঠ, ওঠ, আর ঘুমিয়ো না। সময় যায়, আল্লার নাম কর। কি সুন্দর এ ডাকটি — grave moment-এ (গভীর রজনীতে)। এতে বড়ই উদ্দীপন করে। আর কি সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন মহম্মদ — রোজার একমাস উপবাস, তারপরই উৎসব। খালি হবিষ্যি ভাল লাগবে না, তাই উৎসব চাই।

মুসলমান ধর্মের এই কয়টি প্রধান করণীয়। পাঁচবার নামাজ, একমাস রোজা, হজ আর poor-rate (জাকাত - নির্ধন সহায়তা)। তাই সকলে রোজা করে। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে ভক্তগণ আনন্দ করছে। খুব নিষ্ঠা এদের। নামাজের সময় হলে সব কাজ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। গাড়োয়ান — সে গাড়ী থামিয়ে তার উপরই নামাজ করতে লেগে যাবে। কি সুন্দর ব্যবস্থা!

মহম্মদ বলেছিলেন, ধনজন জীবন সব ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ

কর। ঈশ্বরই সত্য, তাঁকে ডাক। তিনি ছাড়া অপর কাউকে ডাকা মিথ্যা। 'Allah is truth, and that which they call upon besides Him is falsehood. যে সকলের সেবা করে আল্লা তাকে ভালবাসেন — 'Allah loves those who do good to others.' আবার বলেছিলেন, তাঁর শরণাগত হওয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম — 'He who submits entirely to God, has the best of religions.' গীতার সারও তাই, 'মামেকং শরণং ব্রজ' — (গীতা ১৮:৬৬) আমার শরণ গ্রহণ কর। ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ঠাকুর তাই মহম্মদের ভাবে সাধন করেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ আনিয়ে পোলাউ প্রভৃতি ওদের মত রান্না করিয়ে সানকিতে খেতেন। ঈশ্বরের দর্শনাদিও হয়েছিল।

এক ঈশ্বরকে নিয়েই নানাদেশে, নানাকালে, নানাভাবে আনন্দ করছে, সব লোক। এইটা বুঝলেই সব আপন হয়ে যায়। তখন পর আর কেহ থাকে না। তাই ঝগড়াও থাকে না। এই কথাটা বোঝাতে ঠাকুর এসেছেন, আর নানা পথ দিয়ে সাধন করেছেন। সব রাস্তা দিয়ে গিয়ে শেষে এক স্থানেই পৌঁছেছেন। তাই বললেন, যত মত তত পথ; মত পথ। এই ভাব জগৎময় ছড়িয়ে যাবে, তবে শান্তি।

কলিকাতা, ১৮ই মে ১৯২৩ খ্রীঃ, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল।
শুক্রবার, শুক্লা চতুর্থী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঠাকুর যা বলেছেন সব মন্ত্র

১

মর্টনের দ্বিতল গৃহ। শ্রীম মেঝেতে মাদুরে উপবিষ্ট, পূর্বাস্য। চারিদিকে বহু ভক্ত ও সাধু। আজ বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অরূপানন্দ, ব্রজেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মচারী রমেশ, সূর্য ও আর একজন আসিয়াছেন। ভবানীপুর হইতে একদল ভক্ত আসিলেন। আগড়পাড়ার আশুবাবু আসিয়াছেন। তা ছাড়া নিত্যকার ভক্তগণ তো আছেনই। দুর্গাপদ ও সুরপতি পরে আসিলেন।

এখন অপরাহ্ন পৌনে সাতটা, গ্রীষ্মকাল। ভজনের সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — সময় ঠিক করে জপধ্যান করতে বলতেন। যখনকার যেটি ঠিক সেই সময় সেটি করবই এমন রোখ্ চাই। একজনকে বলেছিলেন, 'সন্ধ্যার সময় জপধ্যান করবি না, শেষে কি পরের ঘরের বউ ঝি টেনে বের করবি?' কাশীপুর বাগানে ছিলেন — অসুস্থ হয়ে তখন। তাই সন্ধ্যার সময় সব কাজ ফেলে তাঁকে ডাকা উচিত। বলতেন, ঋষিরা কত কষ্ট ক'রে তবে তাঁর দর্শন পেয়েছেন। সকালে আশ্রম থেকে বের হয়ে গভীর বনে চলে যেতেন — পাছে লোক এসে ভজনে ব্যাঘাত করে। আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। অত ক'রে তবে দর্শন পেয়েছেন। এখন তাঁদের কথা সব বেদমন্ত্র।

ঠাকুর যা বলেছেন তাও মন্ত্র — প্রত্যেকটি কথা মন্ত্র। মন্ত্র মানে ভগবান যা বলেন তাই। ঋষি, মহাপুরুষ, অবতারাদির মুখ দিয়ে তিনি কথা কন। তাই সব মন্ত্র এঁদের কথা। সংস্কৃতে হলেই কি শুধু মন্ত্র? বাংলায়ও হয়, অপর ভাষায়ও হয়। 'সবই তিনি হয়ে রয়েছেন

— জীবজন্তু, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব', ঠাকুরের এই একটি মন্ত্র। এটি আবার গায়ত্রীর সার। গায়ত্রী বেদের সার। দেবী ভাগবতেও এই কথা আছে। শুকদেব তপস্যা করছিলেন, তখন আকাশবাণী হলো — 'তিনিই সব হয়ে রয়েছেন — সংসারে যা কিছু।'

'মা আমায় এই অবস্থায় রেখেছেন তাই আছি — ভক্তি-ভক্ত নিয়ে।' আবার লীলা সম্বরণের কিছু পূর্বে বললেন, 'আমিটা খুঁজে পাচ্ছি না, এখন সবই দেখছি তিনি!'

বৃদ্ধ ভক্ত (ভবানীপুরের) — তখনই বুঝতে পারলেন ইনি অবতার। এবার অপ্রকট হবেন!

শ্রীম — না, না, আমরা কি বুঝতে পারি তাঁকে? আমাদের বুদ্ধি আর কতটুকু? একসেরে ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? অতবড় উচ্চ অধিকারী অর্জুন তিনিই বুঝতে পারলেন না। বলেছিলেন, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা বলছেন, তুমি অবতার। আর তুমি নিজেও বলছো — 'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে'। তাই বিশ্বাস হচ্ছে তুমিই ঈশ্বর। অর্জুনই যদি এই কথা বলেন, আমরা কি?

অবতারকে কেউ চিনতে পারে না — তিনি না চিনালে। তাঁর কৃপা হ'লে ধরতে পারে, নচেৎ নয়। অবতারতত্ত্ব এমনি রহস্যপূর্ণ। Man with limitations — a conditioned being (ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব) কি ক'রে বুঝবে তাঁকে? একি two plus two equal to four — finite things-এর (দুয়ে দুয়ে চার — জাগতিক বস্তুর) বিচার? তিনি infinite (অনন্ত), তাঁকে নিয়ে বিচার চলে না।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একজন জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুরকে, — উপায় কি? তৎক্ষণাৎ এক মুহূর্ত না ভেবে উত্তর করলেন, 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস'। এই আর একটি মহামন্ত্র। আর বললেন, 'গুরুবাক্য কেমন? না, উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সাগর, তাতে একজন হাবুডুবু খাচ্ছে; এমন সময় একটি ভেলা পেল। গুরুবাক্য সেই ভেলা।' সংসার-সমুদ্রে একমাত্র তরণী। গুরুবাক্য ছাড়া আমাদের আর কি সম্বল আছে! গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই।

(সহাস্যে) ঠাকুর বলেছিলেন, বৈদ্য তিন রকম — উত্তম, মধ্যম

ও অধম। অধম বৈদ্য ভিজিট (ফি) নিয়ে যায় — কেবল একখানা prescription (ব্যবস্থাপত্র) লিখে দিয়ে। মধ্যম বৈদ্য রোগীকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে বলে ঔষধ-পথ্য খেতে। আর উত্তম বৈদ্য, রোগীর বুকে হাঁটু গেঁড়ে বসে ঔষধ খাওয়ায়। তেমনি গুরুও তিন রকম বলেছিলেন। অধম গুরু মন্ত্র দিয়ে চলে গেল, আর খোঁজ নাই। মধ্যম গুরু একটু উপদেশ দেয়, ধ্যানজপ করতে, আর উত্তম গুরু জোর ক'রে করায়। ঠাকুর ছিলেন উত্তম গুরু, জোর ক'রে করাতেন সব।

বৃদ্ধ ভক্ত — আচ্ছা মশায়, সদ্‌গুরু কে?

শ্রীম — 'সৎ' মানে যা নিত্য, আর অসৎ, যা দুদিনের জন্য। সেই নিত্য সচ্চিদানন্দই সদ্‌গুরু। তিনিই অবতার হয়ে আসেন গুরুরূপে।

জনৈক ভক্ত — তা হলে hereditary (কুল) গুরু যাঁরা আছেন, তাঁরা কি?

শ্রীম — হাঁ, তাঁদেরও সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের রূপ মনে করতে হবে — ঠাকুর এই কথা বলতেন। মনে করতে হবে তিনিই এঁর মুখ দিয়ে আমায় মন্ত্র দিচ্ছেন। 'গুরুতে যে মানুষ-বুদ্ধি করে তার ছাই হবে' এই কথা বলেছিলেন। তাই গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করতে হয়।

জনৈক ভক্ত — আচ্ছা, গুরু যদি অন্যায় কথা বলেন?

শ্রীম — তাঁর অন্যায় দেখতে নাই। তা দেখবো কেন? আমার কর্তব্য আমি করবো।

অপর ভক্ত — আচ্ছা, গুরু যদি বলেন, কালী, কৃষ্ণ এসব ছেড়ে কেবল আমার পূজা কর, সেক্ষেত্রে কি করা উচিত?

শ্রীম — হাঁ, ঠাকুর আর একটি কথা বলতেন, গুরু করতে হয় অনেক দেখে শুনে। একবার করলে আর ছাড়বার উপায় নাই। গুরু কি ধোপার কাপড়, দশ জায়গায় বদলী হবে — একবার এখানে একবার ওখানে? আর মন্ত্র নিতে হয় যখন গুরুতে ভগবদ্‌ বুদ্ধি আসে। দশজনে নিচ্ছে আমিও নিচ্ছি — ওতে কিছুই হবে না। নিষ্ঠা

চাই ভিতরে। গুরুকে ঈশ্বর বলে যখন বোধ হবে তখন মন্ত্র নেওয়া যায়। একি দেখাদেখি নেবার ব্যাপার — ও নিচ্ছে তাই আমিও নিচ্ছি?

অন্য ভক্ত — মন্ত্র নেওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলতেন?

শ্রীম — কারুকে বলতেন, এখানে এলে-গেলেই হবে। কারুকে আবার জিহ্বায় লিখে দিতেন। কারুকে অন্য উপায়ে বলে দিতেন। যারা কুলগুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছে, তাদেরও দেখেছি বলতেন, এখানে এলে-গেলেই হবে!

ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন গুরুভক্তি সম্বন্ধে (মিহিজাম প্রসঙ্গ প্রথম ভাগ, দ্বাবিংশ অধ্যায়-২)।

এ গল্পটিতে কি আছে? না, শিষ্যা গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করেছিল। আর আপন কর্তব্য পালন করেছিল। তাই ভগবান তাকে দর্শন দিলেন। শিষ্যা গুরুকে পর্যন্ত ঈশ্বর দর্শন করালেন। শিষ্যা গুরু হলো। গুরুর দোষ দেখতে নেই। গুরু বলেছেন, জলে ডুবে মরতে, শিষ্যা তাই করতে গেল। কেননা, গুরুতে যে ঈশ্বর-বুদ্ধি হয়েছিল। গুরুর আদেশ ঈশ্বরেরই আদেশ — তাই জলে ডুবতে গিছলো। গুরুর দোষ দেখতে নেই।

২

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — অবতারকে দর্শন করলে ঈশ্বরকে দর্শন করা হলো — এই কথা ঠাকুর বলেছিলেন। ক্রাইস্টও তাই বলেছেন — 'He that hath seen me hath seen the Father' — (St. John 14:9). ....'I and my Father are one' (St. John 10:30). কেন বলতেন, এখানে এলে-গেলেই হবে, — না তাঁকে দর্শন করলেই উদ্দীপন হবে। জপ-তপ করা কেন? — ভগবানের উদ্দীপন হবে বলে। এখানে যে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন। একেবারে সাক্ষাৎকার হয়ে যাচ্ছে। মানুষ হয়ে বসে আছেন। তাই বলতেন, 'এখানে এলে-গেলেই হবে' নিজেকে নিজেই জানতেন।

(সহাস্যে) হাজরা একদিন মালা জপছে। ঠাকুর মালাটি চেয়ে

নিলেন তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন, 'এখানে বসেও মালা জপ'! মানে, মালা জপার উদ্দেশ্য যা — ভগবান দর্শন, এখানে একেবারেই তা হয়ে যাচ্ছে। জপের প্রয়োজন আর কি তা হলে।

একজন ভক্ত এসে এক দৃষ্টিতে চোখে চোখে চেয়ে থাকতেন। ভক্তটি চলে গেলে অন্যদের বলতেন, 'সবটা মন যদি কুড়িয়ে এখানে দিলে, তা হলে আর বাকী রইলো কি?' অর্থাৎ 'যার উদ্দেশ্যে সাধন ভজন তিনি যে আমি।' একজন ভক্তকে দিয়ে অপর একজন ভক্তের নিকট সংবাদ পাঠালেন, 'ওকে বলে এসো — আমাকে ধ্যান করলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না।' রাত্রিতে মার কাছে বলছেন, 'আচ্ছা, মা, ওকে এই কথা বলে পাঠিয়ে অন্যায় করেছি কি? আমি তো দেখছি মা তুমিই সব হয়ে রয়েছ — পঞ্চভূত মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সবই তুমি।' নিজেকে নিজে জানতেন তাই এ কথা। ঈশ্বর ছাড়া একথা বলার কার সাহস আছে? কে চিনবে তাঁকে, নিজেকে নিজে না চেনালে?

জনৈক ভক্ত — অবতারে ঈশ্বর-বুদ্ধি না এলে কি হবে?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে। তাঁকে না চিনলেও দর্শনের আনন্দ যাবে কোথায়?

স্বামী অরূপানন্দ — তাঁকে দেখে যে আনন্দ হয়েছে লোকের, এখন লাখ description (বর্ণনা) দিয়েও তার এক কণা পাওয়া যায় না।

শ্রীম — (অন্যমনস্কভাবে) তা আর বলতে!

একজন ভক্ত — গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতেন?

শ্রীম — একদিন ছোকরারা সব বসে। তার মধ্যে একজন বিয়ে করে ফেলেছে। তাকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'তোর জন্যেই ভাবনা বেশী, তুই বিয়ে করে ফেলেছিস!' ওদের জন্য তত নয়। মানে, বিয়ে করলে problem complicated (সমস্যা জটিল) হয়ে গেল, তাই তাদের জন্য ঈশ্বরের ভাবনা বেশী। মোট মাথায় করে চলতে হচ্ছে বলে।

অপর ভক্ত — বিয়ে করে ফেলেছে শুনলে কষ্ট পেতেন?

শ্রীম — তা আর পাবেন না? বলতেন, বিয়ে করা যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করা।

জনৈক ভক্ত — বেশী প্রকাশ হলেই চলে যান, তাই কি গোপনে থাকতে চাইতেন?

শ্রীম — হাঁ, কিন্তু অন্তরঙ্গদের সঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যবহার। তাঁদের জন্য ব্যাকুল থাকতেন, ডেকে ডেকে আনাতেন — তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতেন।

সূর্য ব্রহ্মচারী — জপ-ধ্যানের কথা কিরূপ বলতেন?

শ্রীম — জপের কথা — মন্ত্র পেলে জপ করতে বলতেন। ধ্যানের কথা খুব করে বলতেন।

অপর ব্রহ্মচারী — তিনি নিজে বলেছেন একথা, 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে'?

শ্রীম — হাঁ, অনেকবার। কতবার বলেছেন 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে'। দেখতে পেতেন কি না নিজেকে। গর্ভধারিণীর অন্তর্জলীর সময় বকুলতলার ঘাটে পায়ে ধরে কেঁদে বলেছিলেন, 'মা তুমি কে গো, আমায় গর্ভে ধরেছো'?

বৃদ্ধ ভক্ত — নিজেকে নিজে জানতেন যদি, তাহলে কাঁদলেন কেন পা ধরে, 'মা তুমি কে গো' বলে?

শ্রীম — নিজেকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলে জানতেন। তাই বলছেন, তুমি কে মা আমায় গর্ভে ধারণ করেছো? তিনি কি আর compare (তুলনা) করছেন? বলছেন, তুমি সাধারণ মা নও। কেন, না, অবতারকে পেটে ধারণ করেছেন যে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — '....He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.' (St. Matthew 5:45) ক্রাইস্ট বলেছিলেন, সূর্য যেমন সকলকে সমভাবে কিরণ দান করেন, মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করেন, তেমনি তিনি। তাঁর কৃপা সকলের উপর সমান, অযাচিত। তাঁ'তে কি আর অমুককে ভালবাসবো, অমুককে

না, তা ছিল? সকলকে ভালবাসতেন, সকলের জন্য ভাবতেন। এদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেতেন, আবার নববিধানেও যেতেন, আবার আদি সমাজে। 'সহজিয়া', 'কর্তাভজা' এদেরও বাদ দেন নি। বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সমভাবে তাঁর ভালবাসা লাভ করেছে। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান ভক্তগণকেও ভালবাসতেন একই ভাবে। রসিকের উপরও কৃপা সমভাবে বর্ষিত হয়েছিল। কেন যেতেন নানা ভক্তদের কাছে? তাঁরা যে ঈশ্বরকে ডাকেন। একবার একজন ভক্তের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভক্ত অপ্রস্তুত, বললেন, 'কোথায় আমি যাব, না আপনি এয়েছেন!' ঠাকুর হেসে বলেন, 'ছুঁচও কখনো কখনো চুম্বককে টানে।' কেন এরূপ আচরণ — সমদর্শন যে তিনি।

স্বামী অরূপানন্দ — মা বলতেন, 'এমন আনন্দময় পুরুষ আর কোথাও দেখি নি, যেন পাঁচ বছরের বালক। এমন কি আর হয়?'

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ। কেশব সেনের ওখানে খেয়ে এসেছেন। আমাদের বলছেন কাউকে বলো না, তাহলে কালীঘরে ঢুকতে দেবে না। পরের দিন দেখলাম, খাজাঞ্চী যাচ্ছে কাছ দিয়ে। ঠাকুর নিজেই বলতে লাগলেন, 'দেখ, কাল কেশব সেনের ওখানে গিছলাম। খুব খাওয়ালে। তা ধোপা কি নাপিত খাইয়েছে, তা জানি না। আচ্ছা, এতে আমার কিছু হানি হলো?' খাজাঞ্চী হেসে বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, আপনার কিছুতেই দোষ নেই।' কেমন বালক স্বভাব!

(সহাস্য) কেশব সেনের ওখানে যেতেন বলে কাপ্তেন বড় রাগ করতেন। কেশব সেন মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন কুচবিহারে, বিলেত গিছলেন, কাপ্তেন এই জন্য পছন্দ করতেন না। রোজ বলেন, তা একদিন এমন জবাব দিলেন যে মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বলেছিলেন, 'তুমি কেন যাও লাটসাহেবের কাছে হ্যাণ্ডশেক করতে? তুমি টাকার জন্য যেতে পার, আর হরিনামের জন্য গেলেই যত দোষ!' কাপ্তেন একেবারে চুপ। ইনি নেপালের রাজপ্রতিনিধি। ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। ইনি বলতেন, 'বাঙালিগুলো কি বোকা — কাছে মানিক (শ্রীরামকৃষ্ণ) রয়েছে, চিনলে না!' মানিক না হলে কি মানিক চিনতে পারে?

ঠাকুরের ভাব, কুলগাছে কাঁটা থাকবেই। আমার তা দেখার দরকার কি? কুল পেড়ে (হস্তে অভিনয় করিয়া মুখে দেওয়া) কুল খেতে এসেছি, কুল খাব।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের ভাবনা জগতের জন্য। তিনি এসেছিলেন সকল জীবের জন্য। (সহাস্যে) ব্রাহ্ম সমাজের দলটল দেখে pun (ঠাট্টা) করে বলতেন, 'আচ্ছা, দলটল কোথায় থাকে — গেঁড়ে পুকুরে, না?' নদী, সাগর এসবে থাকতে পারে না। ইঙ্গিত করেছিলেন, 'আমি সাগর, আমাতে দল নেই।'

আহা, তিনি-বই কি আর আমাদের উপায় আছে? কত ভাবতেন, 'ঢুঁ' মারাটি পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন। মিহিজামে দেখতুম ছাগলগুলো বাচ্চাকে ঢুঁ মারা শেখাচ্ছে — মাথা উঁচু করে। আত্মরক্ষা কি করে করবে তা শেখাচ্ছে। ঠাকুরও ভক্তদের আত্মরক্ষা করতে শিখিয়েছিলেন। নূতন ব্রহ্মচারী যারা সন্ন্যাস নেবে, তাদের কথায় বলতেন, তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। গৃহীদের বলতেন, 'এক বিছানায় শোবে না।' অন্তরঙ্গদের এমন করে শেখাতেন — মায়ের মত। তাঁরা পালন করলে অপরে শিখবে।

৩

জনৈক ভক্ত — ঠাকুর চলে গেলে, মায়ের কি অবস্থা হলো?

শ্রীম — যখন ঠাকুরের দেহ গেল, মা বললেন, এই তাঁর মায়া দেহ চলে গেল। চিন্ময় দেহ নিত্য বিরাজমান। (সহাস্যে) একবার হৃদয় মুখুয্যে বললেন, 'মামী মামাকে তুমি বাবা বললে, পাঁচ সের সন্দেশ খাওয়াব।' মা বললেন, 'বাবা, তোমার সন্দেশ খাওয়াতে হবে না। আমি ওমনি বলছি, 'তিনি আমার বাপ, মা, গুরু, সখা, পতি — সব তিনি।' সব অবস্থায়ই পেয়েছিলেন কিনা। কি বিশ্বাস মায়ের!

জনৈক ভক্ত — মাকে নাকি তিনি পূজা করেছিলেন।

শ্রীম — হাঁ।

স্বামী অরূপানন্দ — আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মাকে। তিনি বললেন, ফলহারিণী পূজার দিন হয়েছিল। যেখানে এখন গঙ্গাজলের

জালাটা আছে ঠাকুরের ঘরে, সেইখানে আসন হয়েছিল। একজন যোগাড় করে দিয়েছিল। ঠাকুর কাপড় পরিয়ে দিয়েছিলেন, পায়ে আলতা পর্যন্ত দিয়ে দিছলেন।

বৃদ্ধ ভক্ত — মায়ের লজ্জা হলো না?

শ্রীম — তিনি যে 'ভাবে' ছিলেন! তাঁর কি বাহ্যজ্ঞান ছিল?

স্বামী অরূপানন্দ — এ কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মা বললেন, 'আমার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান হলো তখন মনে মনে নমস্কার করলুম।'

এই কথা শুনিয়া শ্রীম দুইবার জিহ্বাদ্বারা আবেগসূচক ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মায়ের তখন উনিশ বছর বয়েস। ১৮৭২-এ পূজা হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল।

স্বামী অরূপানন্দ — মায়ের তখন ষোল বছর।

শ্রীম — না, রিপোর্ট পেতে তোমার ভুল হয়েছে। উনিশ বছর ছিল।

জনৈক ভক্ত — ঠাকুর আর মায়েতে কথা কইতে দেখেছেন, খাবার দিতে যেতেন যখন?

শ্রীম — কখন কখন ওদিকে গেলে ন'বতের ওখানে দাঁড়িয়ে কথা কইতেন দেখা যেতো। মা'র সঙ্গে গোলাপ মা, যোগীন মা, গৌর মা, এঁরা সব থাকতেন। বিন্দে ঝি মাঝে মাঝে আসতো — ঠিকামত ছিল। সাবির মা থাকতো। এইটুকু ঘর এতগুলি লোক। আবার এর মধ্যেই সব জিনিসপত্র রয়েছে।

স্বামী অরূপানন্দ — মা বলতেন, ঐ ঘরেই জিয়ান মাছ থাকতো ঠাকুরের জন্য। তার কলকল শব্দ হতো। মা দোতলার সিঁড়িতে বসে জপ করতেন। যোড়শীপূজার দিনে কাপড় পরানোর কথা উল্লেখ করে পরে লক্ষ্মীদিদি ঠাট্টা করে মাকে বলতেন, 'তোমার লজ্জা হলো না, ওটি কেমন করে করালে পতিকে দিয়ে?'

নবাগত ভক্ত — সাধন ভজনের কথায় কি বলতেন?

শ্রীম — একদিন একটি ভক্ত কতকগুলি ছোলা নিয়ে যাচ্ছে

জপের সংখ্যা রাখবে বলে। একশ আট হবে আর একটি আলাদা করে রাখবে। দেখে, ঠাকুর ছোলাগুলি চেয়ে নিয়ে গেলেন। আর বললেন, 'একি, এতে যে অহংকার হবে, কি আমি এত জপ করেছি। তার চাইতে বসে বসে খুব জপ কর। ছোলাগুলি বরং আমায় দিয়ে দাও রেঁধে খেয়ে ফেলবো' (সকলের হাস্য)। খুব জপধ্যান করতে বলতেন।

অহঙ্কার হবে বলে বেশী তীর্থ দর্শন করতেও বলতেন না। জিজ্ঞাসা করতেন, 'কাশী বৃন্দাবন হয়েছে তো?' তাহলেই হলো — একটি জ্ঞানের আর একটি ভক্তির স্থান। বেশী করলে গল্প করবে আমি এই করেছি, আমি সেই করেছি। কত করে রক্ষা করতেন!

যদু মল্লিকের বাড়িতে বড় সভা — অনেক লোক। কেশববাবুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, 'বল, আমার কতখানি (জ্ঞানভক্তি) হয়েছে, ওজন বল।' বার বার বলায় কেশববাবু সংশয় চিত্তে বললেন, 'ষোল আনা'। তখনই ঠাকুর বললেন, 'না তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না, তুমি নাম যশ, দেহ-সুখ নিয়ে আছ। নারদ, শুকদেব বললে বরং বিশ্বাস হতো।' দেখুন, জগতে যাঁকে মানছে সেই কেশববাবুর কথাই নিলেন না। আর সাধারণ লোকের কথায় — popular applause-এর কি মূল্য আছে! লোক পোক। তাঁকে চিনবার সাধ্য কার? নিজেকে নিজেই চিনেছিলেন।

সর্বদা সমাধিস্থ পুরুষ। সবই মা — সর্বদা মা মা। সীতার কথা বলে নিজের অবস্থার ইঙ্গিত করতেন। সীতা লঙ্কায় রয়েছেন বন্দিনী। হনুমান দেখে এসে বললেন রামকে, 'যম আনাগোনা করছে'। রামের চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে — প্রায় মরার মত। তাই যম আসা-যাওয়া করছে। যম তো সূক্ষ্ম শরীর নেয় — তা যে রামের চিন্তায় নিমগ্ন। এখন যম কি আর নেয়? তাই আসা যাওয়া করছে। ঠাকুরের অবস্থাও তাই — মা ছাড়া কিছু জানতেন না।

জনৈক ভক্ত — কিভাবে তাঁর চিন্তা করা উচিত?

শ্রীম — যে কোনও ভাবে করলেই হবে — রূপ, লীলা, মহাবাক্য। চিন্তা না জেনে করলেও উদ্দীপন হবে। মহেন্দ্র ডাক্তারের

কথায় বলতেন, ‘একে জপধ্যান কর, একথা বললে শুনবে না — ইংরেজী পড়া লোক যে।’ তাঁর দ্বারা অন্যভাবে চিন্তা করিয়ে নিতেন। মহেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, ‘কাল রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয়নি। শুধু ভয় হতে লাগলো, ঠান্ডা না লেগে যায় — জানালা সব খোলা।’ কাশীপুর বাগানে ঠাকুর তখন অসুস্থ। তাঁর চিন্তায় তো নিদ্রা হয় নি! এঁকে দিয়ে এই ভাবে চিন্তা করিয়ে নিতেন।

ভক্ত — ঠাকুরকে স্পর্শ করলে নাকি ‘ভাব’ হতো?

শ্রীম — হতো, তবে সকলের নয়। শুদ্ধসত্ত্ব যারা তাদের হতো। যাদের মন শুদ্ধ নয় তাদের হতো না। কিন্তু দেখলেই উদ্দীপন হতো।

এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। শ্রীম অরূপানন্দের হাতে জয়রামবাটির মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবের বিবরণী দিয়া বলিলেন, ‘উদ্বোধনে প্রকাশ হলে বহুলোকের কল্যাণ হবে।’ ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীম গাহিতেছেন — ‘জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম, গাওরে।’

কলিকাতা, ১৯শে মে ১৯২৩ খ্রীঃ, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল।
শনিবার, শুক্লা পঞ্চমী।

সপ্তম অধ্যায়

ক্যাণ্টের 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ

১

মিহিজামে শ্রীম-র স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছিল। কলিকাতার জলবায়ুতে আবার খারাপ হইতেছে। তিন চার দিন হয় সর্দি হইয়াছে — গলার স্বর মোটা। তথাপি দোতলায় বসিবার ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। এখন বেলা প্রায় ৬টা। শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, ছোট জিতেন ও নলিনী, আর জগবন্ধু রহিয়াছেন। একটি নূতন ভক্ত আসিয়াছেন, বয়স ত্রিশের উপর। তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (নবাগতের প্রতি) — মরুভূমিতে যেমন ওয়েসিস্ (মরূদ্যান) তেমনি সংসারের সাধুসঙ্গ। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হয়ে লোক ছটফট করে, আর সম্মুখে ওয়েসিস্ দেখে তাতে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তখন প্রাণ বাঁচে। সেইরূপ সংসারের যাতনায় অস্থির হয়ে লোক সাধুসঙ্গরূপ ওয়েসিসে আশ্রয় নেয়।

শ্রীম (নবাগতের প্রতি) — জিওগ্রাফি (ভূগোল) পড়েছেন তো? — ও-এ-এস্-আই-এস্। মরুভূমিতে ওয়েসিস্ দেখলে কি করে লোকে?

নবাগত — তাতে আশ্রয় নেয়।

শ্রীম (সঙ্গে সঙ্গে) — তাতে আশ্রয় নেয়। না নিলে কি হয়? — মরে যায়।

ভক্ত — মরে যায়।

শ্রীম — সেইরূপ সংসারের ওয়েসিস্ সাধুসঙ্গে আশ্রয় না নিলে মরে যায়।

এতক্ষণে যোগেন, শান্তি, অমৃত, বড় অমূল্য, সুখেন্দু, সুরপতি ও গদাধর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গোয়ালন্দ হইতে একটি ভক্ত

আসিয়াছেন। শ্রীম-র শরীর অসুস্থ, তাই ‘কথামৃত’ পাঠ করিতে বলিলেন।

ছোট নলিনী পড়িতেছেন — প্রহ্লাদ বালকের ন্যায় স্তব করিলেন। ভক্তবৎসল নৃসিংহ স্নেহে গা চাটিতেছেন।

শ্রীম — ভক্ত এমন প্রিয়। নৃসিংহের রুদ্র মূর্তি দেখে দেবগণ ভীত। সকলে পরামর্শ করে তাঁর অতি প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদকে সম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন। ভগবান বাৎসল্যে তাঁর গা চাটতে লাগলেন। তখন জগৎ শান্ত হলো। তাই ঠাকুর বললেন, ভক্ত আর ভগবান এক।

পাঠ চলিতেছে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন — ‘লজ্জা হয় না ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে আবার স্ত্রীসঙ্গ? ঘৃণা করে না পশুদের মত ব্যবহার? নাল, রক্ত, মল-মূত্র এসব ঘৃণা করে না? যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমা সুন্দরী স্ত্রী চিতাভস্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাকবে না — যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস — সেই শরীর নিয়ে আনন্দ — লজ্জা হয় না?’....

শ্রীম — গুরু কৃপা ব্যতীত এই কাম ক্রোধাদি জয় করা অসম্ভব। শূন্যে চলা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব। তাঁর কৃপা হলে, ভক্তি লাভ হলে, হয়। তিনি বলতেন চুন দিলে যেমন জোঁক খসে পড়ে যায়, তেমনি ভক্তি হলে ওসব চলে যায়। তাঁর প্রেমের একবিন্দু পেলে কামিনী কাঞ্চন তুচ্ছ হয়ে যায়।

পাঠক পড়িতেছেন — কিন্তু সংসারী লোকদের সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার। সকলেরই দরকার; সন্ন্যাসীরও দরকার। তবে সংসারীদের বিশেষতঃ। রোগ লেগেই আছে, কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে সর্বদা থাকতে হয়।

শ্রীম — সাধুসঙ্গ-বৈ উপায় নেই। এই একটিতে বাকী সব ঠিক করে দেয়। শাস্ত্র পড়বে — তার অর্থ বোধ হবে না, সাধুসঙ্গ না করলে। সাধুসঙ্গ করলে তপস্যা করার ইচ্ছা হয়, তখন ধারণা হয়। অনেকে শাস্ত্র কিনে নিজে নিজে পড়ে, কিন্তু ধারণা হয় না তাতে। Concentration (একাগ্রতা) কোথায়? সাধুসঙ্গ করলে ঐ-টি হয়।

(ভক্তদের প্রতি) এই যে আপনারা মঠে যাচ্ছেন, সাধুসঙ্গ করছেন, এতে হাজার শাস্ত্র পড়ার কাজ হয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর বলেছেন, ‘কামিনী কাঞ্চনই মায়া’। এতে যোগভ্রষ্ট করে। মন স্বভাবতঃ কামিনী কাঞ্চনে যায়। এ-টি মহাব্যাধি। কিন্তু ঔষধ খেলে আরাম হয়। ঔষধ সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা — নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা।

শুধু পড়ে কিছু হয় না — সাধন না করলে। সাধুসঙ্গ করলে সাধন করবার ইচ্ছা হয়; সাধুরা সাধন করেন তাই দেখে। যারা ধনী অথচ ভক্তিমান, বুঝতে হবে পূর্বজন্মে সাধন করতে করতে ভোগবাসনা আসায় যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। তাই এ জীবনে বাকী ভোগটা হয়ে গেলেই শান্তি।

পাঠক পুনরায় পড়িলেন — মণি একটু বেদান্ত দেখিয়াছেন। আবার বেদান্তের অস্ফুট প্রতিধ্বনি ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিতদের বিচার একটু পড়িয়াছেন।...

শ্রীম (সহাস্যে) — যাঁকে ক্যাণ্ট বলেন, unkown and unknowable (অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়) তাঁকেই ঠাকুর দর্শন করেছেন। আবার একঘর লোকের সামনে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, ‘মাইরি বলছি, মা এয়েছেন।’ এই বুদ্ধি দিয়ে জানতে গেলে ঐ পর্যন্ত। কিন্তু তিনি শুদ্ধ বুদ্ধি ও শুদ্ধ মনের গোচর। যেখানে ঋষিরা ছেড়েছেন, আর সাধন আরম্ভ করেছেন, সেখান পর্যন্ত ওঁরা (ক্যাণ্টাদি) মাত্র পৌঁছেছেন। এখনও সাধনের সংবাদ জানেন না। সাধনের অবস্থায় সব ছেড়ে যেতে হয় — ‘নেতি নেতি’। ছাদে উঠলে দেখা যায় — যে ইঁট সুরকি দিয়ে ছাদ হয়েছে তাতেই সিঁড়িও হয়েছে। তাঁকে দর্শনের পর বোঝা যায় তিনিই জীবজগৎ হয়ে রয়েছেন। কিন্তু সাধনের অবস্থায়, ‘নেতি নেতি’।

রাত্রি ৯টা। শ্রীম-র শরীর অসুস্থ। ভক্তগণ প্রায় সকলে চলিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন মাত্র আছেন। বড় অমূল্য শ্রীম-র নিকট নিজের দুঃখ নিবেদন করিতেছেন।

বড় অমূল্য (বিনীতভাবে) — মনটা এমন হয় কেন? — কখনও

উপরে উঠে গেল, কখনও নিচে নেবে যায়?

শ্রীম (কোমল স্বরে) — গিরিশ ঘোষও ঠাকুরকে ঐ কথা বলেছিলেন। ঠাকুর উত্তর করলেন, 'সংসারে থাকলে তরঙ্গ উঠবেই'। তাই তফাতে থাকতে চেষ্টা করা উচিত। এক বোতল মদ খেয়ে মাতাল হলাম কেন, এ প্রশ্ন বাতুলতা। তাই নির্জনে অনেক দিন থেকে গুঁড়ি মোটা করে এসে সংসার করলে দোষ নেই। জ্ঞানভক্তি লাভ করে সংসারে থাকা। তখন ভয় কিছু কম, কিন্তু ভয় থাকে। তবে যদি তিনি case (মোকদ্দমা) take up (গ্রহণ) করেন তবে আর ভয় থাকে না। তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি জ্ঞানীদের সংসারেও রাখতে পারেন। তাঁর দর্শনের পর, বেচালে পা পড়ে না। তাই যতদিন না তাঁর দর্শন হয়েছে, ততদিন সাধুসঙ্গ, মাঝে মাঝে নির্জন বাস, আর কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়। শরণাগত হয়ে থাকা।

পাণ্ডবদের এত বিপদ কিন্তু ভগবান সঙ্গে সঙ্গে। কেন? না, তাঁরা যে তাঁর শরণাগত। তিনি তাঁদের ভার নিয়েছেন। সকলেরই ভার তিনি নিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন কিনা — তুমি বল আর নাই বল। তাঁর look-out (কর্তব্য) সকলকে দেখা। তবে তুমি যদি শান্তি চাও, অভয় হতে চাও — তাঁর শরণাগত হও। এছাড়া পথ নাই।

'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং.....' (গীতা ১৮:৬২)

তাঁর কৃপাতে কেবল শান্তি লাভ হয়।

শ্রীম (অমূল্যর প্রতি) — গড়ের মাঠে ঠাকুরকে নিয়ে গিছলেন ভক্তরা। বড় সার্কাস্ এয়েছিল, তাই দেখাতে। একটা রিং-এর ভিতর দিয়ে বায়ুবেগে একটা ঘোড়া ছুটছে। একটি মেম্ এই চলন্ত ঘোড়ার উপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ছে আর একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া বেদম ছুটছে। আশ্চর্য মনে হয় দেখলে। বাইরে এসে ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, 'এই বিবি কত সাধনা ক'রে তবে এক পায়ে চড়তে শিখেছে। সেইরূপ আগে যারা সাধন ক'রে তপস্যা ক'রে জ্ঞানভক্তি লাভ ক'রে সংসারে থাকে, তাদের পড়বার ভয় থাকে না তত। তাই তাঁকে আপনার ক'রে সংসারে থাকা। তাঁকে বল।'

বড় অমূল্য — তাঁকে তো ডাকছি। প্রাণ থেকে কি মুখ থেকে,

বুঝতে পারছি না।

শ্রীম — এরও কষ্টিপাথর সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ করলে, বোঝা যায় আন্তরিক, কি কি। সাধুসঙ্গ চাই — সাধুসঙ্গ একমাত্র ঔষধ।

২০শে মে, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

গ্রীষ্মকাল। মর্টন স্কুল, দোতলার পশ্চিমের বারান্দা। অপরাহ্ন সাড়ে ছয়টা। শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন, রাস্তায় লোক চলাচল দর্শন করিতেছেন। সুখেন্দু, শান্তি, যোগেন, শুকলাল ও জগবন্ধুও সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন। নিবিষ্ট চিত্তে জনতা দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎ কাল পরে স্বগতঃ বলিতেছেন, 'বিকারের রোগী, বিকারের রোগীর কিছুই ভাল লাগছে না'। ইহা যেন শ্রীম-র ভাবসাগরের একটি লহরী। ক্ষণকাল মধ্যে মত্ত হইয়া দাশরথি রায়ের গান ধরিলেন — 'একি বিকার শঙ্করী পেয়ে চরণতরী।' গান গাহিতে গাহিতে ঘরে আসিয়া ভক্ত সঙ্গে বসিয়াছেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজকাল বড্ড chance (সুযোগ)। যারা বিয়ে করে নি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল আর অন্যের চাকর নয় তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। ঠাকুর কতবার বলেছেন অন্তরঙ্গদের, 'যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে।' যারা বিয়ে করে নি, তারা ইচ্ছা করলে অনায়াসে এই ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারে। যারা বহুদিন থেকে বিষয় ঘেঁটে আসছে তারা বিকারের রোগী, কিছুই ভাল লাগে না। ভোগ বাসনায় ডুবে রয়েছে, তাই সব আলুনী লাগছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। এতক্ষণে ডাক্তার, বিনয়, রাখাল ও মনোরঞ্জন আসিয়াছেন। ভক্ত সঙ্গে শ্রীম দেড় ঘন্টা ধ্যান করিলেন। তারপর ভক্তগণ সমস্বরে গাহিতে লাগিলেন, 'এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।' রাখাল গাহিতেছেন, 'রামকৃষ্ণ চরণ-সরোজে মজরে-মন-মধুপ মোর'। ভজন সমাপ্ত হইল। বড় জিতেন ও বিরিঞ্চি কবিরাজ

গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — শুনছেন জিতেন বাবু, যারা বিয়ে করে নি আর ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। অনেকে আছে বিয়ে করেনি — তা সব অন্যরকম। তাহ'লে হবে না — ব্যাকুল হওয়া চাই। যদি কেউ ইচ্ছা করে, এই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারে। যারা অনেক দিন থেকে বিষয় ভোগ ক'রে আসছে তারা বিকারের রোগী হয়ে গেছে, প্রলাপ করে, কিছুই ভাল লাগে না। এক ঘর ভরা মিষ্টি, ভাল ভাল সব খাবার আছে। একটি ছেলেকে ছেড়ে দাও। সে এটা খাবে ওটা খাবে। আর একজন বিকারগ্রস্তকে ছাড়, কোনটাই তার ভাল লাগবে না। 'রাবড়ী'? না। 'ভাল সন্দেশ?' না। 'আলুর দম?' না। কিছুই তার ভাল লাগে না। কেন এ অবস্থা? বহুদিন ধরে বিষয়ের মধ্যে থেকে অরুচি ধরেছে যে ভাল জিনিসে!

আজ সকালে একজন এসেছিলেন। এই সব কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। দেখলাম, বিকার কেটে গেছে। তা নইলে কি আর এ সব কথা ভাল লাগে? বলতে লাগলেন, 'এ ছেড়ে স্বর্গ আর কোথায়?' মঠে গিছলেন একদিন। মাঠে বসে আছেন। বিকাল বেলা সাধুরা দলে দলে বেড়াচ্ছেন। দেখে ভাবছেন, 'এ ছেড়ে আর স্বর্গ কোথায় পাব?' কি সব ভাবনা ভাবছেন! বিকার কেটে গেছে, তাই সব লাল দেখছেন।

বিষয়-বাসনা ভিতরে থাকলে — একবিন্দু থাকলেও সমাধি হয় না। বিষয়-বাসনা, শুধু টাকা পয়সার বাসনা নয় — রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই সব। যারা বিয়ে করে নাই ইচ্ছা করলেই তারা এই ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারে — জ্ঞানভক্তি, বিবেকবৈরাগ্য, প্রেম সমাধি লাভ করতে পারে।

কথামৃত পাঠ হইতেছে। 'মণির গুরুগৃহে বাস' পাঠ চলিতেছে। মণি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'আজ্ঞে, নিরাকার সাধন কি হয় না?' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'হবে না কেন? ও পথ বড় কঠিন। আগেকার ঋষিরা তপস্যাদ্বারা বোধে বোধ করতো, ব্রহ্ম কি বস্তু তা অনুভব

করতো। ঋষিদের খাটুনি কত ছিল। নিজেদের কুটীর থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে যেতো। সমস্ত দিন তপস্যা করে সন্ধ্যার পর আবার ফিরতো। তারপর এসে একটু ফলমুল খেতো।'

শ্রীম — এইসব কথা কেন বলেছেন? না, যদি উপস্থিতদের মধ্যে কারও চৈতন্য হয়, যদি কিছুও করে। ঠাকুর যা বলেছেন তার একটুও যদি কেউ করে, তবুও হয়।

বড় জিতেন — আচ্ছা, এ ছাড়া কি আর উপায় নাই?

শ্রীম (গম্ভীর ভাবে) — থাকবে না কেন? তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন? তবে আছে, সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, স্বপ্নসিদ্ধ। ঋষিমুনিরা সাধন ভজন করেছেন লোকশিক্ষার জন্য। একজনের ফস করে হয়ে গেল, কেন? না, তার কপাল ভাল ছিল তাই হয়ে গেল তাঁর কৃপায়। তা বলে কি সকলের এরূপ হবে? সাধন করলে সকলের হতে পারে। সেইজন্য ঋষিরা তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের দেখে যদি কেউ একটু করে।

বড় জিতেন — সংসারীদের case serious (অবস্থা গুরুতর), সুখ, দুঃখ কত কি!

শ্রীম — ও, না, না। সুখদুঃখ এগুলি অবস্থাভেদ বৈ তো নয়! আসলে সুখদুঃখ বলে কিছুই নাই — স্বপ্নের মতো। ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতাম গলা টিপে ধরেছে, নেমন্তন্ন খাচ্ছি, এইসব। স্বপ্ন ভাঙ্গলে দেখতাম সব মিথ্যা। এই সুখদুঃখও তেমনি। ঈশ্বরদর্শন হলে তখন এগুলির বোধ থাকে না। 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা....' (গীতা ২:২৮),

'......'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ' (গীতা ১৪:২৪) — মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণ সমান বোধ হয় ঈশ্বরদর্শন হলে! সব সচ্চিদানন্দ।

২১শে মে, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

শ্রীম দোতলার ঘরে মেঝেতে বসিয়া আছেন — পাশে একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও কয়েকজন ভক্ত। এখন অপরাহ্ন সাড়ে ছয়টা। সন্ন্যাসী

ঢাকা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীম আনন্দে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

সন্ন্যাসী (শ্রীম-র প্রতি) — তখনও আমার সন্ন্যাস হয় নাই। ঠাকুরকে দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু আমি বড় দুর্ভাগা। দর্শন করেও কিচ্ছু হলো না। এখন তাঁর কথাগুলি কিছু কিছু বুঝতে পারছি।

শ্রীম — আপনি পরম সৌভাগ্যবান। তাঁকে দর্শন করেছেন আর তাঁর কথা সব ধারণা হচ্ছে। অবতারকে দর্শন করা আর ঈশ্বরদর্শন করা এক। তাই ক্রাইস্ট বলেছেন, '...he that hath seen me hath seen the Father!' (St. John 14:9) দর্শন আবার তাঁর কথা ধারণা এ বড় কম সৌভাগ্যের কথা! তখন বুঝি আপনার সন্ন্যাস হয় নি?

সন্ন্যাসী — না, তখনও জানতাম না আমায় এ চাকরী করতে হবে। বেশ থাকা যাচ্ছে কিন্তু। এ চাকরীতে ইনকাম ট্যাক্স নাই, চৌকিদারী ট্যাক্স নাই, খাজনা টাজনা কিছুই নাই।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ।

এতক্ষণে শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, রাখাল, তারক, সুখেন্দু, ছোট জিতেন, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া জুটিয়াছেন।

সন্ন্যাসী — স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ ছিল। আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও স্নেহ করতেন। স্বামীজী যখন ঢাকা যান তখন গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত স্টীমারে এক সঙ্গে গিয়েছিলাম। তাঁদের দর্শন করেছিলাম আর এখন আপনাকে দর্শন করছি। কলকাতা এসে মা কালীকে দর্শন করা যেমন আপনাকে দর্শন করাও তেমনি।

শ্রীম (ঈষৎ হাস্যের সহিত) — না। আপনি তাঁকে দর্শন করেছেন, আপনি সৌভাগ্যবান।

মিষ্টিমুখ করিয়া সন্ন্যাসী বিদায় লইলেন। এক্ষণে সন্ধ্যা সমাগতা। সকলে ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। ধ্যানান্তে মুকুন্দ গাহিলেন, 'জয় জয় রামকৃষ্ণনাম গাওরে'। তৎপর অন্তেবাসী গাহিলেন, 'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম, অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে — জ্যোতির্ময়।'

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীম ছোট জিতেনের নিকট হইতে গত রজনীর মঠের বিবরণ শুনিলেন। জগবন্ধু আজ সকাল হইতে অপরাহ্নের বিবরণ বলিতেছেন।

বড় জিতেন প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে একজন পেনসনার।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — শুনুন, শুনুন জিতেনবাবু, মঠের সংবাদ শুনুন — সাধুদের কথা হচ্ছে। গীতায় আছে স্থিতপ্রজ্ঞের কথা। কি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার —

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

(গীতা ২:৫৪)

শ্রীম — 'স্থিতধী কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্' — মানে সাধুরা কি সব কথা কন, কিরূপে থাকেন, চলাফেরা কিরূপ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরও আরও একটা higher life (উন্নত জীবন) আছে। এইটার বিশ্বাস হলে তখন এই প্রশ্ন আসে। মঠে এইসব মহাত্মারা থাকেন যাঁরা 'স্থিতধী'। তাঁদেরই কথা হচ্ছে। তাঁদের কথা ছাড়া আমাদের সংসারীদের আর উপায় নাই। তাঁদের ঘড়ি right (ঠিক), আমাদের ঘড়ি wrong (ভুল)। তাই নিত্য মিলাতে হয় তবে শান্তি, তবে আনন্দ। এঁদের কথা শুনলে চৈতন্য হয়ে যায়।

জগবন্ধু — আজ মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, 'ঢাকা থেকে একটি যুবক এসেছিল এম-এস্‌সি পরীক্ষা দিয়ে। কয়দিন ছিল, চলে গেছে। বলছিল, আমার ভয় হচ্ছে, বিয়ের কথা হচ্ছে কিনা, তাই শুনে। তার বড় ভাই এম-এ পাশ। সে বলেছে বিয়ে করবে না। বাপ হেড্‌মাস্টার, পশ্চিমে — মির্জাপুরে।'

শ্রীম — হাঁ, এই রকমই চলছে সংসার। কেউ বিয়ের ভয়ে পালাচ্ছে, কেউ বিয়ের কথায় দৌড়ে আসছে। কেউ ছাড়ছে কেউ ধরছে। এ মহামায়ার খেলা। সংস্কার না থাকলে, চৈতন্য হলেও বিয়ে করে। এমনি খেলা!

ঠাকুর বলেছিলেন, একটি slender (সূক্ষ্ম) লাইন আছে। এটার এপার পশুত্ব মনুষ্যত্ব — পার হলেই দেবত্ব। লাইনটি হলো ভোগবাসনার অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনের। কামিনী কাঞ্চন ছাড়লেই দেবতা।

বড় জিতেন (হতাশভাবে) —

'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।'

শ্রীম — ঠাকুরকে একজন এই কথা বলেছিল, ঈশ্বরই যখন সব করছেন, তখন আমাদের কিছু না করলেও হয়। তখুনি ধমক দিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন, "তোমায় আর জ্যাঠামি করতে হবে না। যতক্ষণ 'আমি' রেখেছেন ততক্ষণ তাঁকে প্রার্থনা করতে হবে। 'আমি'টা যখন পুঁছে নেবেন তখন ঐ কথা। যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ডাকতে হয় তাঁকে। যতক্ষণ 'আমি' ততক্ষণ 'তুমি', ততক্ষণ প্রার্থনা।"

পেনসনার — আচ্ছা, একটা গানে আছে, 'এক ডাকেতে ফুরিয়ে দে মা, জন্মের মত ডাকাডাকি।' সে কেমন ডাক — কখন আসে?

শ্রীম — এমনি ডাকতে ডাকতেই আসে। মৌখিক থেকে আন্তরিক হয়। ঠাকুর বলেছিলেন, জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন প্রাণ আঁটুপাটু করে, তেমনি ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ যায় যায় হয়, তখনই সে ডাক আসে। ঠাকুর ডেকেছিলেন সে ডাক। মা দর্শন দিলেন। প্রথম মুখে মুখে ডাকতে হয়। শেষে ব্যাকুল হলে অন্তর থেকে আসে সে ডাক। তখনই তাঁর দর্শন।

বড় জিতেন — আজ্ঞে, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল', এটা কোন্ 'আমি'?

শ্রীম — বজ্জাত 'আমি' — বদমায়েস 'আমি'। ভক্তের 'আমি'তে দোষ নাই।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ডাকতে বললেন কেন? না, তিনি নিজে এসব করেছেন কি না! আর এটা সোজা পথ সব চাইতে। বলতেন, কলিতে অন্নগত

প্রাণ, আবার আয়ু কম। সময় কোথায়, অন্নের সংস্থান করতেই সব সময় কেটে যায়! ডাকবো ডাকবো করতে করতে এ দিক হয়ে যায়! তাই বলতেন, ‘কেঁদে কেঁদে খালি বল তাঁকে।’ আরও বলতেন, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে যা লাভ হয় — জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তি-কর্মযোগে যা লাভ হয়, কেঁদে কেঁদে ডেকে একবার মাত্র তাঁর দর্শন পেলে তা-ই লাভ হয়। তাই বলতেন, যো-সো করে তাঁকে দর্শন কর। সব পথেরই গন্তব্যস্থল তিনি। গোঁড়ায় এক। তাই বলতেন, ‘মা আমি অত শত জানি না। তুমি মা আর আমি ছেলে এই মাত্র জানি। তুমি যা বলবে তাই শুনবো; তাই করবো।’ উঃ কি ত্যাগ! কাপড়খানা পর্যন্ত শেষে বগলে উঠলো — দিগম্বর, যেন পাঁচ বছরের বালক। বলতেন, ‘বিচারটিচার অনেক হয়েছে। এখন ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে দিনকতক তাঁকে ডাকো।’ তাঁর দর্শন পেলে তখন সব জানা যায় — সব বোঝা যায়। সব সংশয় দূর হয়ে যায় —

‘ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।’ তখন মনে আর ‘কিন্তু’ থাকে না। এ সব চাইতে সোজা পথ, আর এ সময়ের উপযুক্ত পথ।

আহা, এমন হয়ে গিয়েছিলেন, অন্য কথা, অন্য চিন্তা সহ্য করতে পারতেন না — খালি ‘মা, মা’। একদিন ছোট খাটটিতে বসে আছেন সমাধিস্থ — দুপুরের পর। সমাধি থেকে নেমে এসে শুনছেন অশ্বিনীবাবুর পিতা অন্য সব কথা বলছেন। অমনি জোড় হাতে বললেন, ‘আপনারা এসব কথা বলবেন না, এতে আমার কষ্ট হচ্ছে; ঈশ্বরের কথা কন।’ শরীর মন এমন ছাঁচে গড়েছিলেন, অন্য কথা শুনলে গায়ে কাঁটা বিঁধতো।

বড় জিতেন — যার যে বিষয় ভাল লাগে, যাতে pleasure (আনন্দ) হয়, সেই বিষয় life-এর vitality (জীবনী শক্তি) বাড়ায়। 'Survival of the fittest' (শক্তিমানই বেঁচে থাকে) ডারউইনের এটা অন্যতম ‘ল’ (Law)।

শ্রীম — হাঁ, সত্যশরণবাবু ডাক্তার আমায় এ ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। বাড়ির লোকদের বলেছিলেন, ‘যা করতে ওঁর ভাল লাগে তা করতে দাও।’ অন্য ডাক্তাররা কথা বন্ধ করে দিছলো। এক মাস জ্বর ছাড়ে

না। সত্যবাবুর ব্যবস্থার পর ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলতে বলতে জ্বর বন্ধ হয়ে গেল, আরাম হয়ে গেলাম। ঠাকুর তাই ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা শুনতে বা বলতে পারতেন না। এই জন্য বলেছিলেন, 'ভক্ত একটি আলাদা জাত।' সাধারণ লোকের মত নয়, ভক্তরা ঈশ্বরীয় কথা বই থাকতে পারে না, প্রাণ যায় যায় হয়ে যায়।

বড় জিতেন — ঠাকুরকে তো দেখি নি, বালকের অবস্থা বুঝতে পারি নি। কিন্তু সেদিন দেখলাম জয়রামবাটির মায়ের মন্দিরের নক্সা আর উৎসবের বিবরণ নিয়ে যেন ছেলেমানুষের মত টানাটানি শুরু করে দিলেন (আপনি)।

শ্রীম — তিনি যে কি বস্তু ছিলেন — মা ঠাকরুন, তাতো আপনারা জানেন না! ঠাকুরকে পেয়েছিলাম পাঁচ বৎসর মাত্র; আর মা আমাদের পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে রক্ষা করে এসেছেন। সেই মায়ের কথা — তাঁর মন্দির!

কলিকাতা, ২২শে মে ১৯২৩ খ্রীঃ, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০।
মঙ্গলবার, শুক্লা অষ্টমী।

অষ্টম অধ্যায়

অর্থ থাকলে অর্ধ জীবন্মুক্ত

১

গ্রীষ্মকাল, অপরাহ্ণ পৌনে সাতটা। শ্রীম দোতলার ঘরে মেজেতে বসিয়া আছেন। নিত্যকার ভক্তগণ অনেকেই আসিয়াছেন। বেলুড় মঠ হইতে একজন সন্ন্যাসী ও নরেন ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। কুশল প্রশ্নাদির পর সন্ধ্যার আলো আসায় শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন। অল্পক্ষণ পর শ্রীম মঠাগত সাধুদের সহিত আনন্দে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহারা কতকগুলি প্রশ্ন করিতেছেন।

সন্ন্যাসী (শ্রীম-র প্রতি) — ঠাকুরের কোন্ কোন্ ফটো ঠিক ঠিক?

শ্রীম — যেটি এখন সর্বত্র পূজিত হয়। শিব মন্দিরের সিঁড়িতে বসে ছিলেন — গভীর সমাধিস্থ — তখন নেওয়া হয়। ভবনাথ ফটোগ্রাফার এনেছিলেন, ১৮৮২-তে। দাঁড়ানো একটি — এটি রাধাবাজারে ফটোগ্রাফারের দোকানে নেওয়া হয়। সেদিন তিনি ঝামাপুকুরে, আর. মিত্রের বাড়ি এসেছিলেন। ১৮৮১, ৯ই ডিসেম্বর, শনিবার। সেটিও উচ্চ সমাধির অবস্থা। আর একটি কেশব সেনরা নিয়েছিলেন, সঙ্গে হৃদয় ছিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের কাছে খুব যেতেন কিনা। সেখানেও দাঁড়ান সমাধিস্থ। মাঝে মাঝে এটিও দেখতে পাই।

সন্ন্যাসী — আপনি মথুরবাবুকে দেখেন নি?

শ্রীম — না, তিনি চলে যাওয়ার দশ এগার বছর পরে যাই। শম্ভু মল্লিককেও দেখি নি, নারায়ণ শাস্ত্রীকেও না। হৃদয় মুখুয্যে মশায়কে দেখেছি।

এমন অবস্থা হয়েছিল ঠাকুরের — ঈশ্বরের কথা বৈ আর কিছু ভাল লাগতো না। অন্য কথা শুনতে পারতেন না — জ্বালা হতো

শুনলে। কেউ অন্য কথা বললে জোড়হাত করে বারণ করতেন। ঠিক যেন জল-ছাড়া মাছের অবস্থা। মাছ ড্যাঙ্গায় রাখলে কি করে? ছটফট্ করে। জলে ছাড়লে আবার প্রাণ আসে। তেমনি ঠাকুরের অবস্থা — প্রাণ যায় যায় হতো অন্য কথায়। ঈশ্বরের কথা হলে প্রাণ ফিরে আসতো। পরবার কাপড়খানা বগলে, যেন বালক। আহা, কতখানি ভালবাসা হলে, এ অবস্থা হয়। 'মা, মা' মুখে — কাপড় বগলে। কখনও সীতার কথায় নিজের অবস্থার ইঙ্গিত করতেন। বলতেন, রাম সীতার খবর জিজ্ঞাসা করলে হনুমান বললেন, 'দেহটা ভূমিতে পড়ে আছে — আর যম আনাগোনা করছে।' যম সূক্ষ্ম দেহ নেয়। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার সূক্ষ্ম দেহে থাকে। সেই মন রামের চিন্তায় মগ্ন। যম আর কি করে — তাই আনাগোনা করছে। ঠাকুরও মায়ের চিন্তায় নিমগ্ন। প্রায়ই বলতেন, 'মাইরি বলছি মা এসেছেন' — একঘর লোকের সামনে। আবার কথা কইতেন!

সন্ন্যাসী — ঠাকুর সাধন-ভজনের কথা আপনাদের কিরূপ বলতেন?

শ্রীম — লাটুমহারাজ ঘুম থেকে দেরীতে উঠতো। ঠাকুর তাই একদিন তিরস্কার করেছিলেন। তাতে লাটু কলকাতায় পালিয়ে গেল — দেহ রাখবে না ব'লে। চার পাঁচদিন পর রাম দত্ত আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে অনুযোগ করে বললেন, 'লাটু দেহত্যাগ করতে গিছলো।' ঠাকুর বালকের ন্যায় উত্তর করলেন, 'আমি তো এমন কিছু বলি নি। বলেছিলাম বেলায় ওঠা কেন? শরীর খারাপ থাকে, হাতমুখ ধুয়ে ঈশ্বরের নাম করে আবার শুয়ে থাক।' লাটু থাকবে কি না, রামবাবু জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বললেন, 'ইচ্ছা হয় থাকতে পারে।' এরপরই নিজ হাতে সকলকে প্রসাদ দিলেন — লাটুকেও দিলেন। এমনভাবে শেখাতেন — strict (কঠোর) হয়ে। একজন সন্ধ্যার সময় ধ্যানজপ করতো না। একদিন সন্ধ্যার সময় কাছে বসিয়ে তিরস্কার করে বললেন, 'সকাল সন্ধ্যায় সব কাজ ছেড়ে ধ্যানজপ করতে হয়। এখন হৈ হৈ করে ঘুরছ — শেষে কি পরের ঘরের বৌ-ঝি টেনে বের করবে?' এমনভাবে discipline (ধর্মনীতি)

শিক্ষা দিতেন।

একজন ভক্ত একবার রাত্রিতে কলকাতায় গেলেন। পরদিন ভক্তটি এলে, কি করে রাত্রে যাওয়া হয়েছিল জিজ্ঞাসা করলেন। ভক্ত বললেন, 'এখান থেকে বের হয়ে বড় ফটক যেই পার হয়েছি, একটি গাড়ী পাওয়া গেল। ছ'পয়সার শেয়ারে একবারে বিডন স্কোয়ার। তা হবে না, আপনাকে দর্শন করে গেছি।' যাই একথা বলা, অমনি তিরস্কার করতে লাগলেন। বললেন, ওকি কথা তোমার! ঈশ্বর কি লাউ কুমড়ো ফল দেন? তিনি অমৃত ফল দেন, Eternal life — অমৃতত্ত্বম্। তাঁর কাছে লাউ কুমড়ো চাওয়া কিনা কামিনী কাঞ্চন চাওয়া।

গিরিশ ঘোষের চাকরের অসুখ। তাকে ঠাকুরের চরণামৃত খাওয়ান হলো। ভাল হয়ে যাওয়ার পর একদিন ঠাকুরকে ঐ কথা বলে বললেন, 'ভাল হবে না — আপনার প্রসাদ খেয়েছে যে!' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর, 'ওকি হীন বুদ্ধির কথা তোমার? ঈশ্বরের কাছে লাউ কুমড়ো ফল চাইতে হয়? তাঁর কাছে অমৃতত্ত্ব লাভ হয়। রোগ আরাম করা — তার জন্য তিনি ডাক্তার কবরেজ করে দিয়েছেন, ওষুধ করে রেখেছেন।' আহা, কি ideal (আদর্শ) — শুধু ঈশ্বর, আর কিছুই চাই না! কোথায় পাবে এ ideal (আদর্শ)!

পশ্চিমের সাধুরা সিদ্ধাই দেখায়। হয়তো দেয়াল থেকে পেঁড়া বের করলে। হেঁটে গঙ্গা পার হয়ে গেল। একটু ছাই দিয়ে রোগ সারিয়ে দিল। এই সব অনেকে করে। ঠাকুর এ সব আন্তরিক ঘৃণা করতেন।

একবার হৃদয় মুখুয্যে বলেছিলেন — কিছু শক্তি চাইতে। ঠাকুরের বালকের স্বভাব। তাই চাইলেন মায়ের কাছে। পরে ভক্তদের বলতেন, 'মা আমায় দেখিয়ে দিলেন ওসব বেশ্যার গু। দেখালেন ধামা পোঁদ বেশ্যারা পড়্পড়্ করে হাগছে। তখন হৃদয়কে বকতে আরম্ভ করলুম, কেন আমাকে শক্তি চাইতে শিখিয়েছিলে?'

সিদ্ধাই শক্তিকে বেশ্যার গু, অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ — তুচ্ছ জিনিস, কে বলতে পারে এ কথা তিনি ছাড়া? নাম যশের

কথায় বলতেন, — 'ঝাঁটা মারি লোকমান্যে।' রাধাকান্তের ঘরে গয়না চুরি হলো। মথুরবাবু ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে গেলেন, আর বলছেন, 'কি ঠাকুর, নিজের গয়না রাখতে পারলে না? হংসেশ্বরী কিন্তু চোর ধরিয়ে দিছলো।' যেই বলা, অমনি গর্জন করে উঠলেন, আর বললেন, 'ছিঃ সেজোবাবু — তোমার এ কি হীন বুদ্ধির কথা! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর পদ সেবা করছেন, তাঁর কিনা এ সবের অভাব? তোমার কাছেই সোনার গয়না — ঈশ্বরের কাছে মাটির ঢেলা বইতো নয়। তাঁর বয়ে গেছে তোমার এ কয়খানা গয়না রইলো কি গেল, দেখতে। তুমি এগুলিকে বড় দেখছো, তাঁর কাছে তুচ্ছ — অতি তুচ্ছ।' কে পারে এ কথা বলতে ঠাকুর ছাড়া?

কি অবস্থাই গেছে — টাকা কড়ি ছুঁতে পারতেন না। শুধু ছোঁয়া নয়, গ্রহণ করতেও পারতেন না — সঞ্চয় করা দূরের কথা। বরানগরে মহেন্দ্র কবরেজ, পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছলো রামলালের হাতে ঠাকুরের সেবার জন্য। শুনে ভাবলেন দুধের দরুন দেনা আছে দেওয়া যাবে। তার দু ঘন্টা পর 'রামলাল, রামলাল' করে তাকে ঘুম থেকে উঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাকা কাকে দিয়েছে — তোর খুড়িটুড়ীকে কি?' রামলাল বললেন, 'না, আপনাকে।' তখন বললেন, 'না, এ টাকা রাখা হবে না। যা, ফিরিয়ে দিয়ে আয় শীঘ্র।' রাত তখন বারটা। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তখনকার মত ক্ষান্ত করলেন। পরের দিন সকালে গিয়ে টাকা ফেরৎ দিয়ে এলো। ভক্তদের পরে বলেছিলেন, 'টাকা রাখায় বিল্লিতে যেন আমায় আঁচড়াচ্ছিল ঘুমুতে পারি নি।' এমন অবস্থা!

ডাক্তার ভগবান রুদ্র এম-ডি পাশ, একবার এয়েছেন। তাঁকে বললেন, 'দেখ দেখি, আমার এ কি হলো টাকাকড়ি ছুঁতে পারি না।' এই বলেই হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আর বললেন, 'তুমি একটা টাকা রেখে দেখ হাতের উপর।' যেই টাকা রাখা অমনি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আর হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল। দেখে তো ডাক্তার অবাক — তাঁদের সায়েন্সে এসব কথা নাই কিনা!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সর্বদা বলতেন, নির্জনে গোপনে কেঁদে

কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়। যত কম লোক জানে ততই ভাল। অন্তরঙ্গদের বলতেন, 'আমাকে চিন্তা করলেই হবে।' বলেছিলেন, 'যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' তাঁর ঐশ্বর্য — জ্ঞানভক্তি, বিবেকবৈরাগ্য, প্রেম, সমাধি। আহা, কি আদর্শ! টাকা কড়ি ছুঁতে পারলেন না। 'লোকমান্যে ঝাঁটা' মারলেন। সিদ্ধাইকে 'বেশ্যার গু' বললেন — আর সোনা রূপা 'মাটির ঢ্যালা'। ঈশ্বর ছাড়া — কে পারে বলতে এসব কথা?

বলতেন, 'মা, টাকা লোকের এত প্রিয় তা তাদেরই থাক্।' ওর কথা কইলে আর লোক আসবে না। তিনি তো লোকের মঙ্গল দেখতেন শুধু, তাই টাকাকড়ির কথা বলতেন না। সর্বদা 'মা-মা', করতেন। আর ভক্তদের কিসে কল্যাণ হবে তাই ভাবতেন। অন্য সাধুদের ওখানে যাও — এ চাইবে, ও চাইবে, আর যাওয়া হবে না। এখানে এসব কিছুই নাই। বলতেন, 'এখানে প্যালা নাই।' কিসে ভক্তদের অবসর হয় আর কর্ম ত্যাগ হয়, সেই চেষ্টা দেখতেন।

সন্ন্যাসী — আচ্ছা, দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর ধ্যানঘরে যে শিবমূর্তি আছে উহা কি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত? কেউ কেউ এরূপ বলে।

শ্রীম — না। ওখানে ওসব কিছুই ছিল না। কয়েকদিন হয়ে গেছে ঠাকুর চলে গেছেন। এর ভিতরই শুনতে পাই নানান রকম সব হয়ে গেছে! তাঁর সম্বন্ধে নানান কথা বলে। ওখানে এই ঘরই ছিল না — পরে হয়েছে। তাঁর সময়ে শুধু একটা মাটির ঘর মাত্র ছিল।

২

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — একবার বিশপ-অপ-নরফক (Bishop of Norfolk) 'টাইম' পত্রে একখানা চিঠি লিখেছিলেন — ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের বর্তমান অবস্থা আলোচনা ক'রে তাতে বলেছিলেন, যীশুখ্রীস্টের ধর্ম কি আর এখন কেউ পালন করে মিশনারিরা? এরা আছে এখন কেবল চাঁদা তোলা, চার্চ করা এই সব নিয়ে। কিন্তু যীশুর আদর্শে

তাঁর apostle-রা (শিষ্যগণ) vow of mendicancy (সন্ন্যাস) নিয়েছিলেন। আর এখন কি করছে মিশনারিরা? টাকাকড়ি, বাড়িঘর, subscription (চাঁদা) এইসব নিয়ে ব্যস্ত। আবার শেষে লিখেছেন আমার এ কথায় হয়তো অনেকে রাগ করতে পারেন, কিন্তু কি করব, সত্য যা তাই বললাম। যীশুর কখনও এ আদর্শ ছিল না।

আগে ভগবান-দর্শন, না চাঁদাতোলা, চার্চ করা এসব কাজ কর্ম? তাতে হলো কি? টাকা তুলে তা দিয়ে বড় বড় বাড়ি হলো। এতে নিজেদের সুবিধা হলো। দুখানা ঘর পাওয়া গেল। চাকর, গাড়ী সব হলো। নিজের সুখ খুব হলো। কিন্তু আসল কাজের কি হলো — ভগবান লাভের? যার জন্য সব ছেড়ে এ জীবন গ্রহণ, তার কি হলো?

অবতার যা শিক্ষা দেন তা কি আর ঠিকঠিক থাকে — গ্লানি আসবেই। ঠাকুর বলতেন, চৈতন্যদেব সবেমাত্র চার শ বছর হলো এসেছিলেন। এর মধ্যেই কি হলো দেখ! যে চৈতন্যদেব, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কয়েছিলেন বলে হরিদাসকে ত্যাগ করেছিলেন, সেই চৈতন্যদেবের অনুবর্তীরা কিনা এখন নেড়ানেড়ীতে পরিণত হয়ে পড়েছে! চৈতন্যদেব নিজে অবতার — তাঁর শিক্ষাই রইল না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের কাছে প্যালা ছিল না। কিসে ভক্তদের কল্যাণ হয় — তাদের কর্মত্যাগ হয় আর তাঁকে ডাকবার অবসর হয় তাই সর্বদা চিন্তা করতেন। টাকাকড়ির নামটিও নিতেন না। খালি কিসে তাদের চৈতন্য হয় সেই চেষ্টা ছিল। তিনি এমন ছিলেন, দেখলেই চৈতন্য হয়ে যেতো। অবতারের ঠিক ভাব থাকে না — শেষে গ্লানি আসবেই। (সন্ন্যাসীর প্রতি) প্যালার মানে জানেন?

সন্ন্যাসী — আজ্ঞে হাঁ, যাত্রাটাত্রা গানের দর্শনী।

শ্রীম — হাঁ, সেই প্যালা, ঠাকুর বলতেন, এখানে তা নাই। এখানে সব ফুরন (হাস্য)। লোকের কাছে টাকা চাইলে আসবে কেন? আগে আসতে থাকুক। এলে গেলে চৈতন্য হয়ে যাবে। টাকার কথা তুললে আর কে আসে? এত প্রিয় জিনিস টাকা। একটি গল্প বলেছিলেন, একখানে যাত্রা হচ্ছে। একজন দেখলে চুপি দিয়ে,

এখানে প্যালা দিতে হয়। অমনি পলায়ন। আর একখানে গিয়ে দেখে সেখানে প্যালা নাই। লোকের খুব ভীড়। অমনি কনুই দিয়ে এমনি করে (অভিনয় করিয়া) ঠেলেঠুলে মাঝখানে গিয়ে আসন করে বসল। আর গোঁফে তা দিয়ে গান শুনছে (সকলের হাস্য)। এখানে যে ফুরন, কিছু দিতে হবে না! ঠাকুরের কাছে তেমনি ফুরন, প্যালাটেলা ছিল না। (ব্রহ্মচারী নরেনের প্রতি) কি বলেন আপনাদের দেশে আছে এসব? — এদিকে আছে।

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে হাঁ, সর্বত্রই আছে এ প্রথা।

সন্ন্যাসী — এত সব করে দেখিয়ে গেলেন, তবুও লোকের চৈতন্য হয় কৈ?

শ্রীম — কঠোপনিষদে আছে শ্রেয় আর প্রেয়; প্রেয় হলো এই সংসার — সুখ-সুবিধা। শ্রেয় হলো ঈশ্বর। ঈশ্বর কয় জন চায়? সুখ-সুবিধাই খোঁজে লোক। আহা, তাঁর কথা কি বলবো — কি সব অবস্থা হতো! সর্বদা সমাধিস্থ — নানা রকমের সমাধি, যেন সমাধির demonstration (প্রদর্শনী)। চক্ষু স্থির — পলকশূন্য, মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়। মন কোন্ রাজ্যে বিচরণ করছে। চক্ষু কখনও নিমীলিত কখনও অর্ধ নিমীলিত, কখনও চেয়ে আছেন — নানা অবস্থা!

সন্ন্যাসী — একজন বলেছিল মায়ের মৃন্ময় মূর্তি, ঠাকুর বললেন চিন্ময় — মৃন্ময় নয়।

শ্রীম — হাঁ, তিনি দেখেছিলেন মায়ের চিন্ময় মূর্তি। মেজের মারবেল, চৌকাঠ, দরজা, বেদী সব চিন্ময় দেখেছিলেন একদিন। সে প্রথম — পরে সর্বদাই মাকে চিন্ময়রূপে দেখতেন। প্রথম দর্শনে একটা বিড়াল ছিল ঘরে তাকেও চিন্ময়রূপে দর্শন করেছিলেন। আর ভোগের লুচি খাওয়াতে লাগলেন। এও মা'র একটি রূপ, — তাই।

টাকাকড়ি চেয়ে নেওয়া দূরের কথা, কেউ যদি দিতে চাইতো বলতেন — 'না, এ দিয়ে বরং পরিবারের provision (বন্দোবস্ত) করে নিশ্চিন্ত মনে তাঁর নাম কর।' বলতেন, সর্বদা টাকার চিন্তা থাকলে অবসর হবে কখন? তাই কখন কখন বলতেন, 'যাদের অর্থ আছে তারা অর্ধ জীবন্মুক্ত।' ইচ্ছা করলে নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের নাম

করতে পারে। কারো উপর কোন বোঝা যাতে না পড়ে সর্বদা সেই লক্ষ্য রাখতেন। গৃহীদের জন্য তাঁর ভাবনা ছিল বেশী — যারা বিয়ে করে কর্মে আবদ্ধ হয়ে গেছে এদের অবসর কি ক'রে হতে পারে তাঁর নাম করবার, সর্বদাই সেই ভাবনা।

শম্ভু মল্লিককে বলেছিলেন, ঈশ্বর তোমার সামনে এলে, তুমি কি কতকগুলি হাসপাতাল ডিসপেনসারী চাইবে, না অমৃতত্ব চাইবে? আগে ঈশ্বর, কি এই সব কর্ম? ঈশ্বর কি আর কতকগুলি এরূপ কর্মে তুষ্ট! তিনি জ্ঞান, ভক্তি চান। কিসে ঈশ্বর লাভ করতে পারে, তাঁর চিন্তা করতে পারে, নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ডাকতে পারে তার চেষ্টা দেখতেন ঠাকুর। শুধু মন্দির, চার্চে তিনি সন্তুষ্ট নন। তাঁর শ্রেষ্ঠ মন্দির ভক্তের হৃদয়।

সাধুরা এইবার বিদায় লইতেছেন — মঠে যাইবেন। মিষ্টিমুখ করাইয়া একজন ভক্ত সদর ফটক পর্যন্ত হারিকেনের আলোতে পৌঁছাইয়া দিলেন। এখন রাত্রি সোওয়া আটটা।

৩

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মহাপুরুষরা সাধন করেন দীর্ঘকাল ধ'রে, তবুও দেখা দেন না। এর মানে কি? এর মানে, এতে লোকশিক্ষা হবে। লোক এঁদের দেখে তপস্যাদি করবে।

ভক্তদের জন্য ঠাকুরের কি ভাবনা! সেবা জানে না ভক্তেরা; পাছে অপরাধ হয়, তাই মা'র নিকট plead (প্রার্থনা) করছেন — 'মা এদের দোষ কি, এত সব কাজ ওদের তাই আসতে পারে না।' মা পাছে রাগ করেন তাই বললেন এই কথা। হাত ভেঙ্গে গেল একবার, তারের বেড়া ছিল তাতে লেগে পড়ে গিয়ে। মাকে বলছেন,'তার তো যাবার কথা নয় অতটা — তার দোষ কি মা।' রাখাল গাড়ু নিয়ে পঞ্চবটী পর্যন্ত যেতেন। বেড়া ছিল পঞ্চবটী আর ঝাউতলার মাঝখানে। ঠাকুর ঝাউতলায় বাহ্যে যেতেন। আহা কি করে রক্ষা করছেন!

একবার মণিকে নিয়ে পঞ্চবটীতে গেছেন। পুরান বটতলায়

যেখানে ডালটি ভেঙ্গে পড়েছে সেখানে প্রণাম করালেন। বললেন, এখানে কত ঈশ্বরীয় দর্শন হয়েছে — প্রণাম কর। যেন মা। একবার একজন ভক্তকে একটা জামা আনতে বলেছিলেন। তিনটা নিয়ে এলো। একটা রেখে বাকিগুলি ফেরৎ দিলেন। ভক্তের মনে পাছে কষ্ট হয়, তাই কেমন করে বোঝাচ্ছেন — বললেন, 'হ্যাঁগা ক'টার কথা বলেছিলাম?' ভক্ত বললেন, একটা। তখন তিনি বললেন, বরং এটা তোমার কাছে রেখে দাও। দরকার হ'লে নোবো। একটু পরে আবার বললেন, ওটাও নিয়ে যাও। তোমার কাছে রইলো, তুমি তো আর পর নও। দেখুন কি কথা! তখন তাঁর পূর্ণ সন্ন্যাস, সঞ্চয় করতে পারেন না। ভক্তকে বললেন, দেখ, আমার মনে কষ্ট হয় এমন কিছু তোমাদের করতে নেই। তাঁর মনে কষ্ট হলে ভক্তদের অকল্যাণ হবে, তাই এ সাবধান।

একজনকে একটা সতরঞ্চি আনতে বললেন। জানেন, ভক্ত অপরকে দিয়ে কিনিয়ে আনবে। তাই বলে দিলেন, 'নিজে গিয়ে কিনে আনবে।' কেন বলে দিলেন এই কথা? না, এই একটি দাগ তার মনে পড়ে থাকবে। সারা জীবন ভাবতে পারবে তাঁর কথা — আমি একটি সতরঞ্চি দিয়েছিলাম তাঁকে। (সহাস্যে) সতরঞ্চি কিনতে গিয়ে মহা বিভ্রাট। চাঁদনী চকে দোকান। একখানে জিজ্ঞাসা করছে, দাম কত? — সতরঞ্চি দেখছে। পাশের দোকান থেকে একজন বুঝি বললে, ওটা ভাল না, দাম বেশী। অমনি দুজনে ঝগড়া লেগে গেল। সেই ফাঁকে ভক্তটি পলায়ন করলো। পরে অন্য দোকান থেকে আনলো। আর একবার একজন ভক্তকে বললেন, কয়টা কলাই-করা বাটি আনতে। একজন বললেন, অমুককে যে বলা হয়েছে এর জন্য। ঠাকুর বললেন, 'হলোই বা, আনুক না।' তিনি কি নিজের দরকারের জন্য বললেন এ কথা? ভক্তদের কল্যাণের জন্য সেবা নিলেন। দু সেট বাটির কি দরকার তাঁর? একজনের একটু ভোগ ছিল। বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন তাকে। একটি ছেলেও হয়েছিল। দশ বছরের হয়ে মারা গেল। বাড়ি পাঠালেন বটে, কিন্তু এদিকে কল টিপছেন। রাতদুপুরে জগন্মাতার কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছেন,

'মা ওকে ডুবিও না।' লাগাম নিজের হাতে — এ দিক থেকে টানছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে এমনও আছে শোনা যায়, কেউ কেউ সন্তান দু একটি হয়ে যাওয়ার পর ভাই-বোনের মত আছে। এক বিছানায় শোবে না। ঠাকুর মাকে এনে এক বিছানায় আট মাস রাখলেন। কেন? ভক্তদের শিক্ষার জন্য। এক বিছানায় শয়ন অথচ দেহ-সম্পর্ক নাই — 'রমণীর সঙ্গে থেকে না করে রমণ।' তবে তো ভক্তেরা সাহস পাবে, উৎসাহ হবে ভাই-বোনের মত থাকতে! শুনছেন শুকলালবাবু, এমনও কেউ কেউ আছে শোনা যায়। মন খারাপ হয় সব সময় ঐ সব কথা চিন্তা করলে, ঠাকুরের আচরণ মনে করলে সাহস পাবে। এই জন্য তাঁর এসব আচরণ। তাঁর বিয়েই হলো, লোকশিক্ষার জন্য। বিয়ে করে কি ক'রে থাকতে হয় তা নিজে করে দেখালেন।

মাঝে মাঝে বলতেন, 'তাড়াতাড়ি সেরে নেও।' কখন হয়ে যায় ঠিক নেই। আর বলতেন, একটু দূরে নির্জনে চলে যেতে হয় মাঝে মাঝে। লোক নড়তে চায় না। আগে পঞ্চাশ হলে কাশী চলে যেতো। এখন আর ততটা দেখা যায় না। কত কান্নকাটি; গেলে চলে কি করে, এইসব। কেন আগে করতো কি করে? এই ভেবে করতে হয় — আজ আমি মরে গেলে চলবে কি করে ওদের? সারা জীবন খাটতে হবে সংসারের জন্য? তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করে সরে পড়া, আর বসে বসে তাঁর নাম করা।

৪

এইবার কথামৃত পাঠ হইতেছে। শুকলাল, ডাক্তার, বড় জিতেন, রাখাল, সুখেন্দু, সুরপতি, বিরিঞ্চি, ব্রহ্মচারী রমেশ প্রভৃতি রহিয়াছেন। শ্রীম 'মণির গুরু গৃহে বাস' বাহির করিয়া দিলেন। জগবন্ধু পাঠ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন — তোমাদের যোগও আছে ভোগও আছে। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি। ব্রহ্মর্ষি, যেমন শুকদেব — একখানি

বইও কাছে নাই। দেবর্ষি, যেমন নারদ। রাজর্ষি জনক, নিষ্কাম কর্ম করে।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, তিন থাকের লোক করেছেন ঈশ্বর। প্রথম যোগী। তাঁরা সর্বদাই তাঁর চিন্তায় মগ্ন। আর কিছু চায় না — যেমন শুকদেব, নারদ। আবার যোগভোগ। এও একটি থাক্, এও ভাল। দুই দিকেই আছে। তাঁকেও চায় আবার এদিকেও চায় — যেমন পাণ্ডবরা। এঁরা যেমন ভোগ করেছেন, তেমনি ভক্ত। ঈশ্বর এঁদের সঙ্গে সঙ্গে। আর শুধু ভোগ, এও একটি থাক্ আছে এরা খালি ভোগ নিয়ে ব্যস্ত। এঁদের দ্বারা এই creation (সৃষ্টি) রক্ষা করছেন। নাক সিঁটকাবার উপায় নাই — কাউকে ঘৃণা করা চলবে না। তিনি ভ্রান্তিরূপে এদের ভিতরে থেকে এ সব করাচ্ছেন। তাঁর মায়াতেই এসব ভাগ ভাগ হয়েছে। সকলেরই দরকার।

পাঠ চলিতেছে। ঠাকুর সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্মরণ মনন তো আছে?'

শ্রীম — আহা দেখুন কেমন সোজা করে দিয়েছেন। স্মরণ মনন থাকলেই হলো। কত নেমেছেন।

পাঠক পড়িতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন — একটু সাধন করা দরকার। গুরুই সব করেন, তবে শেষটা একটু সাধন করিয়ে নেন।...

শ্রীম — তিনি বলতেন সাধন করে কেউ কেউ সিদ্ধ হয়েছে। সঙ্গীত সাধন করে সিদ্ধ রামপ্রসাদ। ভক্তদের বলেছিলেন — নির্জনে কেঁদে কেঁদে গান গাইলে তিনি দেখা দেন।

ডাক্তার বক্সী — সাধন দ্বারা হয়?

শ্রীম — নিশ্চয় হয়। তা না হলে কেন গীতায় বলেছেন এই কথা — 'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।' (গীতা ৬:৪৫) তবে এক জন্মে নাও হতে পারে। কয়েক জন্ম পরে হতে পারে। মহাপুরুষদেরও সাধন করতে হয় — লোকশিক্ষার জন্য। ঠাকুর বেশ একটি গল্প বলেছিলেন, একজন শব সাধনা করবে। শবের উপর আসন করে বসেছে। আর একজন বাগান বেড়াতে এসে লুকিয়ে এসব দেখছে। এমন সময় একটা বাঘ এসে উপস্থিত। শবের উপর

বসা যে ছিল — তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। যে লুকিয়ে ছিল সে তখন এসে শবের উপর বসে মায়ের নাম জপ করতে লাগলো। দেবী সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘বর নাও’। লোকটি বলে, আগে একটি কথার জবাব দাও, পরে বর চাইবো। ‘এ লোকটি এত করে সব জোগাড় করলে আর তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আমি বাগান বেড়াতে এসে তার জিনিস দিয়ে তোমায় পেলাম। — এ কেন হলো?’ দেবী বললেন, ‘বাবা তোমার অনেক জন্মের সাধনা ছিল। একটু বাকী ছিল। তাই এখন হয়ে গেল। আর ওর সবে আরম্ভ।’ এমনি কাণ্ড। সাধন করেও সিদ্ধ হয় — তা-ই বেশী। কৃপাসিদ্ধ কম।

ভক্ত — সমাধি কাকে বলে — কয় রকম?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সমাধি কি চারটিখানি কথা! কত জন্ম জন্ম খেটে তবে হয়। সমাধি লাভকেই ঈশ্বরদর্শন বলে। একেই সিদ্ধাবস্থা, আত্মদর্শন, ভগবানদর্শন, ব্রহ্মদর্শন বলে। সমাধি সাধারণতঃ দুরকম — সবিকল্প আর নির্বিকল্প, অথবা সাকার বা নিরাকার। সমাধি মানে তাঁ’তে ডুবে যাওয়া। Time and space — দেশ কালের পারে যাওয়া, perfect detachment from the senseworld. সমাধি লাভই জীবের উদ্দেশ্য। ভোগবাসনা নিবৃত্তি হলে এ অবস্থা লাভ হয়। প্রথম দিন যখন যাই, দাঁড়িয়ে শুনছি। একঘর লোক বসা। ঠাকুর বলছেন, যার ঈশ্বরের কথা মনে হলে কিম্বা কথা শুনে চোখে জল আসে, আর পুলক হয়, বুঝতে হবে তার কর্ম ত্যাগ হয়ে এলো, বেশী বাকী নাই। কর্ম ত্যাগ হয়ে গেলেই সমাধি। সমাধিতে কি হয় কে জানে? যার হয়েছে কেবল সে-ই বুঝতে পারে — মুখে বলা যায় না। অবতারাদির হয় এ অবস্থা। দূর থেকে হো হো শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু হাটে ঢুকলে তখন বোঝা যায় কোনটা কি — কোনটা আলুর দোকান কোনটা পটলের দোকান। আমরা fortunate — যাঁর সর্বদা সমাধি হতো এমন একজনের সঙ্গে ছিলাম। তাই তাঁর কৃপায় কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। এসব বলবার কথা নয় — অন্তরে বোধে বোধ হয়। ঠাকুর

কৃপা করে তাঁর স্পর্শ দ্বারা কিংবা ইচ্ছামাত্র এ অবস্থা করে দিতে পারতেন। তাঁর ভক্তদের তিনি এ অবস্থা লাভ করিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্রে সমাধির কথা আছে — সে যেন বাজনার বোল মুখস্থ করা। কিন্তু হাতে আনতে পারে নি। হাতে আনতে হলে জন্ম জন্ম তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় লাভ হয়। সমাধি একবার লাভ করতেই অত কষ্ট, আর ঠাকুরের নিত্য মুহুর্মুহু এ অবস্থা হচ্ছে — যেন ভূতে পেয়ে বসেছে। সমাধি থেকে নামবার সময় বলতেন, 'এখন শুধু পণ্ডিতগুলোকে খড় কুটোর মত মনে হচ্ছে' অর্থাৎ তুচ্ছ, কিছুই নয়। আমরা ভাগ্যবান, তাঁর কৃপায় এসব কথার Glimpse (আভাস) পাওয়া গেছে — কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো, এসে আর খবর দিলে না — dissolve (দ্রব) হয়ে গেছে ; তখন কে আর খবর দেয়? এইটি Summum Bonum of life — মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

কলিকাতা, ২৩শে মে, ১৯২৩ খ্রী; ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৯৩০ সাল।
বুধবার, শুক্লা নবমী।

নবম অধ্যায়

এই পাঁকের ভিতর থেকেই পদ্মফুল ফোটে

১

গ্রীষ্মের পর আজ প্রথম বৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীম বর্ষা দেখিয়া খুব আনন্দ করিতেছেন। এই জলেও ভক্তগণ আসিয়াছেন। আট দশ জন নূতন লোক শ্রীম-র সহিত কথা কহিতেছেন। এখন বিকাল প্রায় ছয়টা।

শ্রীম (নবাগতদের প্রতি) — এই দেখুন বর্ষা হচ্ছে, এ তাঁরই বিধান। নইলে শস্য হবে না, তাই বর্ষা। এত সব দেখেও মানুষগুলি কি নিয়ে অহঙ্কার করে, বলতে পারেন আপনারা? ঠাকুর একজন ভক্তকে বলেছিলেন, তোমার এ সব ভাবতে হবে না। তুমি তাঁকে ডাক নির্জনে গোপনে। বল, দেখা দাও। ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। এ তাঁর look out (কাজ)। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তাঁর সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। জগৎ রক্ষা এই বৃষ্টিটি হলে হবে তাই এটি দিয়েছেন। যেমন বর্ষা তেমনি সব ঋতু তিনি করেছেন যখন যেটির দরকার। খালি বর্ষা হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে তাই অন্য সব ঋতু। কি বলেন? মানুষ চেষ্টা করলে এ সব করতে পারে? যদি না পারে তা হলেই আর কর্তাগিরি থাকছে না। কর্তাটা কোথায়, একবারও তা ভাবছে না। এই গ্রীষ্মে প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল। কৈ কেউ তো গ্রীষ্ম বন্ধ করতে পারলে না কর্তাগিরি করে? সব তিনি করে রেখেছেন — মাঝখান থেকে বলছে ‘আমি কর্তা’। এ তাঁরই মহামায়ার খেলা। তিনিই এই অজ্ঞান করে রেখেছেন, নইলে জগৎ চলে না। এই যে বৃষ্টি, এতে তাঁর হাত দেখতে পাচ্ছেন না?

মানুষ এত দুর্বল হলেও এই মন বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে লাভ করতে পারে। এই পাঁকের ভিতর থেকেই পদ্মফুল ফোটে। মোড় ফিরিয়ে

দেওয়া। যে মন-বুদ্ধি বদ্ধ করে তা-ই আবার মুক্ত করে প্রয়োগ জানলে। যে বিষ প্রাণ নেয় সে-ই অমৃত হয়। প্রয়োগ জানা চাই। ভগবান স্বয়ং আসেন মানুষ হয়ে এটা শিখাতে। ঠাকুর এই সবে এসেছেন। তিনি সব চাইতে সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। চলতে থাক — শীঘ্র কাজ হবে। বলেছিলেন, অত শত করতে হবে না তোমাদের, খালি নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে বল — দেখা দাও বাপ। আবার অন্তরঙ্গদের বলতেন, 'তোদের আর কিছু করতে হবে না — আমাকে ধ্যান করলেই হবে।' কিছু করতে হয়। কিছু করলেই তাঁর কৃপা হয় তখন সব বোঝা যায়।

বৃষ্টি থামিয়াছে। নবাগত ভক্তগণ বিদায় লইলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ধ্যান করিতে লাগিলেন। এখন রাত্রি সোওয়া আটটা। শ্রীম উঠিয়া বারান্দায় গেলেন। আহার করিতে উপরে যাইবেন। ভক্তদের বলিতেছেন, আপনারা সকলে গান করুন। সুখেন্দু ভক্তসঙ্গে গাহিতেছেন, 'এমন মধুমাখা হরিনাম, নিমাই কোথা হতে এনেছে'। তারপর ব্রহ্মচারী রমেশের সঙ্গে সকলে গাহিতেছেন, 'জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম, গাওরে'। শ্রীম আসিয়া এই বন্দনাটিতে যোগদান করিলেন। এইবার কথামৃত পাঠ হইতেছে। বেদান্তবাদী সাধুকে লইয়া রাম দক্ষিণেশ্বর আসিয়াছেন। একটু পড়া হইতেই শ্রীম কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীম — একবার পঞ্চবটীতে কয়েকজন সাধু এসেছেন। তাঁরা ঠাকুরের ঘরে গিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, 'আচ্ছা জী, আপনারা জপ ধ্যান নিষ্কাম হয়ে করেন, না? সাধু বললেন, 'হাঁ জী'। 'যা করেন সব নারায়ণে অর্পণ করেন, না?' আবার জিজ্ঞাসা করায়, তাঁরাও বললেন, 'হাঁ জী'। গীতায়ও তাই আছে — 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্' — আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবের ফল আমাতে সমর্পণ করে কর তা হলেই খালাস। বন্ধন হবে না আর। এর পরই ছোট খাটটিতে গিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন আর মুচকি হাসছেন। সাধুরা দেখে বলাবলি করছেন — 'ইসকো পরমহংস অবস্থা বলতে হ্যায়।'

ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালীই অন্যরূপ। সাধুদের কেমন করে শেখালেন।

ওঁরা বুঝতে পারলেন না যে তিনি শেখাচ্ছেন। এতে কেউ দোষ ধরতে পারে না। আর একটি, যে যাকে মানে, তার নাম ক'রে বলতেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে কথা হলে বিজয়ের নাম করতেন — 'বিজয় এই বলে'। এতে দু'কাজ হতো। বিজয়ের উপর এদের শ্রদ্ধা বাড়তো। আর ওদেরও শিক্ষা হয়ে যেতো। ঠাকুরের কথা হয়তো ওরা নিতো না।

একটু চুপ করিয়া রহিলেন। পুনরায় বলিতেছেন।

এইচ. বোসের বাড়ির ছেলেরা বন্দুক দিয়ে পাখি মারছে। উনি থাকতেও মারতো, বলায় বন্ধ হয়ে গিছলো। আবার মারছে। তাই ভাবনা হলো কি করে বন্ধ হয়। বাধা না দিলে পাড়ার সব ছেলেগুলি নিষ্ঠুর হয়ে যাবে। ভাবছি, এমন সময় মনে হলো একজন ব্রাহ্ম যদি পাওয়া যেতো, তা হলে হতো। ওমা, রাস্তায় যেই বেরিয়েছি অমনি একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তখনই ঐ বাড়িতে গিয়ে ওদের গিন্নীদের কাছে বলে এলেন আর পাখি মারতে বারণ করলেন। বাড়ির লোকেরা বললো, 'আমরা জানতাম না, ছেলেরা আর পাখি মারবে না'। আমি রাস্তায় তিন কোয়ার্টার দাঁড়িয়ে রইলুম। এসে আমায় সব বললেন। গুরুই সব করেন। তাই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া।

২৪শে মে, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

সন্ধ্যার ধ্যান হইয়া গিয়াছে। শ্রীম দোতলার মেজেতে ভক্ত-সঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলুড় মঠ হইতে কয়েকজন সাধু আসিয়াছিলেন। দুই একজন সাধু সংসারের অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা ভক্তগণ কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আন্তরিক হলে সব তিনি ঠিক করে দেন। মানুষের বুদ্ধিতে যা মনে হয় insuperable difficulty (দুর্লঙ্ঘ্য বিপদ) তাঁর ইচ্ছা হলে তাও দূর হয়। অভাবনীয়, অচিন্তনীয়,

স্বপ্নের অগোচর যা এমন সব ব্যাপারও সোজা হয়ে যায়। পথ পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর কৃপায়। তাই আন্তরিক হওয়া চাই। এঁরা সব আন্তরিক বলেছিলেন, তাই হয়ে গেল।

বড় অমূল্য — মঠে যত সব সাধু আছেন তাঁরা সকলেই কি আন্তরিক গেছেন?

শ্রীম — সন্ন্যাস-ই যে সব শেষ, তা তো নয়! পথে দাঁড়ান গেল। সেখান থেকে গন্তব্য স্থলে যাওয়া সহজ হয়। সম্পূর্ণ আন্তরিক কি আর এক দিনে হয় — চেষ্টা করতে করতে হয়। সাধুসঙ্গে ভোগ নাশ হয়, তা হলেই ঈশ্বরকে ভাল লাগে। ঈশ্বরকে ভাল লাগলে, তাঁর দিকে মন গেলে অন্য দিকে টান পড়বে। তখন বিষয় ভাল লাগে না, ভোগে মন যায় না। ধ্রুবের রাজ্য লাভ হলো, কিন্তু তা'তে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সৎসঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন। সৎসঙ্গ করলে ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য এ জ্ঞান হয়।

ভগবানদর্শন হলে, তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়। অন্য কিছু মনে থাকে না। ঠাকুরের এখানে অনেকে যেতো নানা রকম সঙ্কল্প করে। কেউ জপ করবে, কি ধ্যান করবে, কি স্তব পাঠ করবে। ওমা, যেই তাঁর সামনে যাওয়া অমনি সব ভুল হয়ে যেতো। দর্শন এমন জিনিস, এখানে এলে সব চুপ। ভগবানকে পেলে আর সব বিষয় থেকে মন উঠে যায়। যেমন, মৌমাছি যখন ফুলে বসে তখন অন্য দিকে লক্ষ্য থাকে না, মধুপানে মত্ত। তখন সব চুপ। ঠাকুর গল্প বলতেন, রাজদর্শন করবে একজন। এখন রাজা সাত দেউড়ির পর থাকে। দর্শক প্রথম দেউড়ি পার হয়ে দেখলে একজন স্থূলকায় ঐশ্বর্যশালী লোক বসে রয়েছে। মনে মনে ভাবলে, এই রাজা। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, এ রাজা নয়। আর এক দেউড়িতে গেল। এখানে আরও ঐশ্বর্যশালী আর একজনকে দেখতে পেলো। জিজ্ঞাসায় এবারও জানতে পেলো, এও রাজা নয়। এই রকম করে যতই এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য বাড়ছে, আর জিজ্ঞাসা করলে বলছে, আমি রাজা নই। খালি, না, না। সপ্তম মহল্লায় ঢুকে, আসল রাজাকে দেখে আর জিজ্ঞাসাবাদ দরকার হয় নি। সেখানে সব চুপ। ভগবান-দর্শন করলে সব চুপ হয়ে যায়।

যতদিন না দর্শন হচ্ছে ততদিন চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টার জন্য সন্ন্যাস নেওয়া, মঠে যাওয়া, সাধু হওয়া। চেষ্টা করতে করতে আন্তরিক হয়। সন্ন্যাস-আশ্রম, আর ব্রহ্মচর্য-আশ্রম, এই স্থান থেকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছান সহজ হয়। গন্তব্য স্থল ভগবান। চারটি আশ্রম আছে — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রথম আর চতুর্থটি থেকে সহজ হয়। দ্বিতীয় আশ্রমে হওয়া খুব শক্ত, প্রায় হয় না। তবে যীশু যেমন বলতেন, 'with men this is impossible; but with God all things are possible' (St. Matthew 19:26) — মানে তাঁর ইচ্ছায় সব হতে পারে, যেমন জনকাদির হয়েছে। তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ, তখন শরীর বৃদ্ধ হয়ে যায়, দেহ ও মনের শক্তি কম হয়ে যায়, তখনও পৌঁছান শক্ত।

ঈশ্বরদর্শন হলে কেমন হয় জানেন? যেমন পাঁচ বছরের বালক কোন গুণের বশ নয়। যেমন crystal (স্বচ্ছ স্ফটিক) জবা ফুলের সামনে ধর লাল দেখাবে, কয়লার সামনে ধর কাল দেখাবে। ত্রিগুণাতীত। তাই ঠাকুরকে দেখতাম কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ‘কেউ বলে ভট্চায, কেউ পরমহংস’। কোন গুণের ভিতর নাই। যখন ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে কথা বলতেন, তখন মনে হতো তিনি ব্রহ্মচারী। যখন দেশে যেতেন সকলে বলতো, ‘এইবার গদাই এসেছে — ঘর সাজাচ্ছে, সংসার করবে’। আবার যখন ভক্তদের সঙ্গে, কেউ দেখছে সন্ন্যাসী, কেউ পরমহংস। কোন গুণের বশ নয় যেন বালক — crystal.

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সাধুদর্শন করতে এলে হাতে করে কিছু নিয়ে আসতে হয়, তাই বলতেন। কেন? তা হলে মনে থাকবে আমি তাঁর সেবা করেছিলাম। ঠাকুর-দেবতা, সাধুকে নিজে সেবা করতে হয়। তাহলে impression (ধারণা) হয় বেশী। ঠাকুর ভক্তদের আবার কারুকে কারুকে বলতেন, ‘নিজে হাতে কিনে আনবে।’ দশটা টাকাতে যা না হয়, সামান্য একটি জিনিসে তার চাইতে ঢের বেশী প্রীতি হয়! ভক্তরা অনেকে গরীব — নড়েভোলা। তাই বলতেন ‘এক পয়সার এলাচ আনবে। কি দু’পয়সার বরফ

আনবে। অগত্যা একটি হরীতকী হাতে করে আনবে।' কখনও গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করতেন, 'বল, আমি পূর্ণ কি অংশ, ওজন বল।' তাঁর মানে হলো আমাকে যে যতটুকু জানবে ততটুকুই উপরে উঠবে। যে গুণাতীত বলে জানবে সে তাই হবে। গীতায় আছে 'তরন্তি তে' (৭/১৪) সংসার সমুদ্র পার হবে, যে তাঁকে জানবে। ওজনের কথা এমনি বলতেন না, এর significance (অর্থ) আছে।

ঈশ্বরের দুইটি ডিপার্টমেন্ট আছে, বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া। অবিদ্যামায়াই মনকে ঘুরায়। রামপ্রসাদ একবার বলেছেন, 'প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি'। মন তখন অজ্ঞানে পড়ে আছে। অবিদ্যার এলাকা। আবার বলেছেন, 'আয় মন বেড়াতে যাবি কালী-কল্পতরু মূলে'। এখন প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়েছে, অজ্ঞান অবিদ্যার নাশ হয়েছে। এ mystery (রহস্য) কার সাধ্য বোঝায় অবতার ছাড়া? এক ঠাকুর পারেন, আর কারো কর্ম নয়। তাঁকে যে যতটুকু বুঝবে সে ততটুকু উঠবে। নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলতেন অন্তরঙ্গদের, 'যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মনের অতীত তিনিই শরীর ধারণ করে এসেছেন।' তাই কতবার বলেছেন, 'যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' ইচ্ছা করলেই এই অতুল সম্পদ লাভ হতে পারে — জ্ঞানভক্তি, বিবেকবৈরাগ্য, প্রেমসমাধি।

কলিকাতা, ২৫শে মে, ১৯২৩ খ্রীঃ, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল।
শুক্রবার, দশমী।

দশম অধ্যায়

‘তিনি ইচ্ছা করলে সব উল্টে দিতে পারেন’ — কর্মফল

১

গ্রীষ্মকাল অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম মর্টনের দোতলার ঘরে বসা মেজেতে। আজ শনিবার তাই সকাল সকাল বহু ভক্ত-সমাগম হইয়াছে। ভাটপাড়ার বড় ললিত, মর্টনের শিক্ষক হরেন্দ্র মুখার্জী প্রভৃতি আসিয়াছেন। শ্রীম-র ইচ্ছায় ললিত গঙ্গার স্তব পাঠ করিতেছেন।

‘মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি’ ইত্যাদি। তারপর হরেন হারমোনিয়াম সংযোগে গাহিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠ অতি সুমিষ্ট।

নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার॥

গান সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলের চার পাঁচ জন লোক আসিলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল এদের একজনের পরিবারে সাত মাসের মধ্যে অনেক বিপর্যয় হইয়াছে, কেহ কেহ মারা গিয়াছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, এরূপ হয়ে থাকে কখন কখন। সংসারে থাকতে হলে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয় এজন্য। দেখুন দেখি, কি কাণ্ডটা হয়ে গেল সাত মাসের মধ্যে। তিনি গড়েন আবার ভাঙ্গেন। সব ভালর জন্য করেন। তাঁ’তে অমঙ্গল নাই। তাঁর নাম মঙ্গলময়। বিপদ দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসেন। তা না হলে সংসারে লোক ভুলে যায় তাঁকে। তাঁকে ধরে সংসার করা, নচেৎ দুঃখ অসহনীয় হয়ে পড়ে। তাঁর শরণ নিয়ে সংসার করলে, বিপদে অত মুহ্যমান হতে হয় না। সাত মাসে কি কাণ্ডটা হয়ে গেল!

গত সাত মাস আমরাও মিহিজামে ছিলাম, (একজনকে দেখাইয়া) ইনিও ছিলেন। ওখানে দেখলাম, গরু, ছাগল, পশুপক্ষী সব সারা দিন খালি খাচ্ছে (মাথা নিচু করিয়া দেখাইয়া) এমনি করে, এরই মধ্যে আবার ছানাপোনা বৃদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে। পরিশ্রান্ত হলে শুয়ে জাবর কাটছে।

সবই তিনি করান — এটি বুঝলেই নিশ্চিন্তি। বড় কঠিন, বুঝতে দেন না। কোথা থেকে অহংকার এসে পড়ে। একটা কেনেস্তারার নিচে একটা ব্যাঙ তার দুটো বাচ্চা। যেই উঠিয়েছি অমনি গিয়ে লাফ দিয়ে পড়লো একটার উপর, মা। মানে, মারতে হয় আমায় মার ওদের না। আচ্ছা, কি মাতৃস্নেহ! ছাগলের বাচ্চাকে কোলে নিয়েছি মা-টা এসে হাজির, ভয় নাই। এ মাতৃস্নেহ কে দিয়েছেন? চণ্ডীতে আছে —

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' (চণ্ডী ৫:৭১-৭৩) মায়ের স্নেহরূপে তিনি সর্বজীবে বিরাজমান। ওখানে থেকে এবার তাঁর মঙ্গল হস্ত দেখে এলাম। যেমন নাচের পুতুল সব। উনি নাচাচ্ছেন। যে কাছে রয়েছে সে দেখতে পাচ্ছে মিনসের হাত। যে দূরে সে দেখতে পাচ্ছে না তা। কাছে গিয়ে এবার দেখে এলাম। সবেতে তাঁর মঙ্গল হস্ত। যেমনি পশু, তেমনি মানুষ। তফাৎ খালি, মানুষে ঈশ্বরকে ডাকবার ইচ্ছাটি দিয়েছেন। নির্জনে গেলে এসব দেখা যায়। আপনারা যান নাই ওদিকে? খুব বড় বড় মাঠ আছে, আর ছোট পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সূর্যাস্ত খুব উদ্দীপন করে। শীতকালে গাছের আড়াল থেকে সূর্যোদয় দেখতাম। আর ভাবতাম — আহা এই সূর্য দেখেই ঋষিদের মুখ থেকে গায়ত্রী বের হয়েছিল 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।' আর একটি জিনিস আছে ওখানে।

নবাগত ভক্ত — নির্মল আকাশ।

শ্রীম — নির্মল আকাশ শুধু নয়, অসংখ্য তারকা আর সপ্তর্ষিমণ্ডল। এ সব নিত্য দর্শন হতো। ঘড়ির দরকার হতো না রাত্রে। সপ্তর্ষি দেখে আমরা সময় ঠিক করতাম। এখানেও সপ্তর্ষি আছে। (রহস্যচ্ছলে) একজন জিজ্ঞেস করেছিল আর একজনকে —

'তোমাদের গ্রামে চাঁদ ওঠে?' (সকলের হাস্য)। হাঁ গো, হাঁ — কবিরা এক একজন এক এক রকম চাঁদ দেখেন কি না! বস্তুতঃ এক চাঁদই সর্বত্র। (স্বগতঃ) মানুষে পশুতে তফাৎ নাই। মানুষে একটু শক্তি আছে তাঁকে ডাকবার এইমাত্র। (ভক্তদের প্রতি) ঠাকুর গাড়ী করে কলকাতায় আসতেন। মুখ বাড়িয়ে রাস্তার সব লোক দেখতেন আর বলতেন, 'সব দেখছি নিম্নদৃষ্টি'। ঊর্ধ্ব দৃষ্টি নাই, মানে ভগবানে মন নাই। ক্বচিৎ দু'এক জনের তা দেখা যায়। নিম্নদৃষ্টি মানে পেটের দিকে দৃষ্টি। এ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত ঈশ্বর চিন্তার সময় কই?

কিন্তু বড্ড chance (সুবিধা) এখন। অবতার এসেছেন। তাই ড্যাঙ্গায়ও একবাঁশ জল! যত পার নিয়ে যাও। ধর্মের ছড়াছড়ি। তা চেষ্টা করে কই লোক? (দেয়ালে ঠাকুরের ছবিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এমন আদর্শ রয়েছে সামনে, লোকে চায় কই? অবসরই হয় না!

শ্রীম (শোকাতুর ভক্তের প্রতি) — সাধুরা কিন্তু সব সময় তাঁকে ডাকেন, তাঁর চিন্তা করেন; এখানে একজন সন্ন্যাসী আর এক জন নূতন ব্রহ্মচারী এসেছিলেন। ইনি খুব scholar — gold medallist (সুবর্ণ পদকধারী সুপণ্ডিত)। সন্ন্যাসীর সাধারণ education (শিক্ষা) — পাড়াগাঁয়ে যা পেয়েছিলেন — the three R's — Reading, Writing, (A)'rithmetic (পড়া, লেখা ও গণিত) এ হলেই পাড়াগাঁয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কি জ্ঞান তাঁর! তাঁর কথায় অবাক হয়ে গেলাম। অত জ্ঞান, অত বিদ্যা কি করে এলো? এদিকে তো পাড়াগাঁয়ে elementary education (পাঠশালার বিদ্যা)। তিনি যে ঈশ্বরের চিন্তা করেন সর্বদা! ঈশ্বরচিন্তা করলে তখন সব আপনা থেকে আসে — অপর বিদ্যা। ব্রহ্মচারীর কিন্তু তা দেখতে পেলাম না। ইনি তো এখানকার (বিশ্ববিদ্যালয়ের) অত education (শিক্ষা) পেয়েছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যে বিদ্যায় ঈশ্বরকে জানা যায় তাই বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা। বেদ, শাস্ত্র, সায়েন্স অত জেনে কি হবে? যাতে তাঁকে (ঈশ্বর) লাভ হয় সেই বিদ্যা যিনি জানেন, তাঁর

education-ই (শিক্ষাই) education (শিক্ষা), তা ছাড়া আর সব অর্থকরী বিদ্যা। এতে কি হয় — নাম, যশ, টাকাকড়ি এসব লাভ হয়, ভোগ বাড়ায় কেবল। তাই ঠাকুর বলতেন, 'শুধু পণ্ডিতগুলো খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে।' আর একটি গল্প বলেছিলেন, 'একজনের একটি ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার হয়েছিল। তার বন্ধু বললেন, একজন খুব উঁচুদরের পণ্ডিত আছে। কিন্তু তার অবসর কম — চাষবাস অনেক কাজ। লোকটি শুনে বললেন, দরকার নাই আমার এমন হেলে পণ্ডিতের। তার সব সময়ই যদি ঐতে যায়, ঈশ্বরচিন্তা করে কখন? ঈশ্বরচিন্তা না করলে, তপস্যা না করলে, শাস্ত্রের মর্ম বোঝা যায় না।'

শ্রীম (শোকাতুরের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, এখানকার 'বড়' আর এক রকমের। যাঁর ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন মজে আছে তিনিই বড়। আর সংসারে কে বড়? যাঁর অনেক লোকজন, বাড়িঘর, বিষয়সম্পত্তি কিংবা নানা বিদ্যা আছে। কিন্তু এখানে তা নয় — ঠিক উল্টো। যিনি ঈশ্বরভক্ত তিনি বড়। অতবড় লোক কেশববাবু, তাঁকেই বড় বলছেন না ঠাকুর! যদু মল্লিকের বাড়িতে অত বড় সভার মধ্যে বললেন, 'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। তুমি কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছো। নারদ, শুকদেব বললে বিশ্বাস হতো।' কেশব সেনেরই এই কথা, তা অপরের আর কথা কি! ঠাকুরের নিকট বড় — নারদ, শুকদেব।

শ্রীম (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ভক্তদের প্রতি) — আর একটি distinguished (সুবিজ্ঞ) গ্র্যাজুয়েট, খুব scholar (পণ্ডিত) গঙ্গায় স্টীমারে যাচ্ছেন, সঙ্গে আর একটি বন্ধু। ইনি দেড়শ টাকা মাইনেতে কাজ করতেন, বিয়ে হয়নি। তিন চার বছর কাজ করে মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেছেন। স্টীমারে যাচ্ছেন আর সঙ্গের বন্ধুকে বললেন, moral obligation (কর্তব্য) ভাবতে গেলে religious life (ধর্মজীবন) হয় না। তাঁর unprovided (অসহায়) মা, ভাই এই সব ছিল। কিন্তু বের হয়ে এলো। বন্ধুটিকেও বলছেন 'বের হয়ে এসো'। Obligations (কর্তব্য) অত ভাবতে গেলে হয়ে উঠে না।

একটা যায় আর একটা আসে। এর শেষ নেই। ঠাকুর আসায় এ সব কথা শোনা যাচ্ছে, আর এ সব লোক দেখা যাচ্ছে। কি আদর্শ! আগে ঈশ্বর, পরে অন্য সব। ঠাকুর বলতেন, একটি slender line (ক্ষীণ রেখা) আছে। এটার এপার পশুত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি। এটি পার হলেই দেবত্ব। লাইনটি ভোগের। ভোগ ছাড়লেই দেবতা। এই এঁরা সেই দেবত্বের অধিকারী। তাই বড্ড chance যারা বিয়ে করে নি, সংসারে আবদ্ধ হয়নি। ইচ্ছা করলেই অমৃতের অধিকারী হতে পারে।

ঠাকুর দিন রাত ভাবতেন কিসে ভক্তগণ অমৃতের অধিকারী হতে পারে — কিসে দেবত্ব লাভ হয়। যারা বিয়ে করে নি তারা যাতে আর আবদ্ধ না হয় সেই চেষ্টা দেখতেন। আর যারা বিয়ে করে ফেলেছে, তাদের কিসে অবসর হয়, কিসে কর্ম কমে আর তাঁর চিন্তা করবার সুবিধা হয় সেইরূপ উপদেশ দিতেন। অন্তরঙ্গদের জন্য কত ভাবনা। তাদের জন্য সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমার চিন্তা করলেই হবে — আর কিছু করতে হবে না।' দেখ, কত সোজা করেছেন — শুধু তাঁর চিন্তা করলেই হবে। বাকী সব তিনি করবেন। এ ভার কে নিতে পারে — ঈশ্বর ছাড়া কার হৃদয়ে এ বল আছে? গীতায়ও দেখতে পাই এই কথাই আছে —

'মামেকং শরণং ব্রজ' — (গীতা ১৮:৬৬) আমার চিন্তা কর খালি — আমি সব ভার নেব। ঈশ্বর ছাড়া একথা আর কেউ বলতে পারে না।

অবসর লাভের উপায় বলে দিতেন। বলতেন, দু একটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে, স্বামী-স্ত্রীতে ভাই বোনের মত থাকবে। বেশী ছেলেপুলে হলে কাজ বেড়ে যাবে — অবসর হবে না। অর্থ রোজগার করা, মানুষ করা, বিয়ে দেওয়া কত কি কাজ। বিয়ে দিয়েও কত ভাবতে হয়। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি গেল, তার জন্য কত ভাবনা! বলতেন, এক বিছানায় শোবে না। গায়ের গরম পর্যন্ত লাগাবে না। পাছে কেউ মনে করে 'আমরা রমণীর সঙ্গে থেকে না করি রমণ'। তাই আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছেন এক বিছানায় শুতে নাই। একটি ভক্তের একটু ভোগ ছিল বাকী। তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। আর এদিকে

রাত দুপুরে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করছেন, 'মা, একে ডুবিও না'। ভক্তদের ঈশ্বরচিন্তার সময় হয় না, সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই বলে দিয়েছিলেন, 'রাত তিনটার সময় উঠে তাঁর চিন্তা করবে।' তখন কোন বিঘ্ন হয় না। সব শান্ত থাকে। কত দিকে ভাবনা তাঁর ভক্তদের জন্য!

২

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — আগেকার লোকেরা পঞ্চাশ হলেই কাশী চলে যেতো নৌকা ক'রে। এখন এত সুবিধা তবুও যেতে চায় না। আচ্ছা, এখন মায়া বেড়ে গেছে বুঝি? (সকলের হাস্য)। তাই দেখছি কেউ আর বড় নড়তে চায় না। (ভক্তদের প্রতি) লোক বিষয়চিন্তায় এত মগ্ন হয়ে পড়ে যে ঈশ্বরকে একেবারে ভুলে যায়। সেই ভুল ভাঙ্গাবার জন্য তাঁকে যুগে যুগে মানবদেহ ধারণ ক'রে আসতে হয়। তবে চৈতন্য হয় ভক্তদের।

এতক্ষণে ডাক্তার, মনোরঞ্জন, যোগেন, সুখেন্দু প্রভৃতি বহু ভক্ত সমবেত হইয়াছেন।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — তিনি বলতেন ছেলেপুলে দু'একটি হয়ে গেলে তাদের ডালভাতের provision (ব্যবস্থা) করে, ঈশ্বরচিন্তা কর। সারা জীবনই খেটে শেষ করতে হবে? সকাল থেকে অনবরত খাটছে। লোক বাহবা দিচ্ছে, আহা, কি পরিশ্রমী ইনি। কিন্তু এ সব খাটুনি কি জন্য? ভোগের জন্য; ঈশ্বরের জন্য নয়। টাকা পয়সা, মান সম্ভ্রম হবে; গাড়ীঘোড়া, দাসদাসী হবে; বড় বড় তত্ত্ব — splendid social presents— করা যাবে বলে; কালিয়া, কোর্মা, পোলাও খেতে পারবে বলে। ঈশ্বরলাভের জন্য নয় মোটেই! পরিবারের লোকগুলিও কি cruel (নিষ্ঠুর)! এত খাটছে এদিকে একটুও লক্ষ্য নাই। কেউ বললে বলে, কেন, সবাই তো খাটে — এতে আর কি হচ্ছে? আবার যারা খাটে তাদেরও একটা pleasure (আনন্দ) আছে — মাগছেলেকে ভাল করে খাওয়াতে পরাতে পারবে বলে। কিন্তু ডালভাত হলেই যে হয়! হায় হায় — এ body-wearing

and soul-killing labour (দেহনাশী, আত্মঘাতী পরিশ্রম) করে শুধু ভোগের জন্য, ভগবানের জন্য নয়।

ঠাকুর বিবেকানন্দকে তাই বলেছিলেন, ‘ডালভাত হলে হয় — এর বেশী হয় না।’ মা-ভাইদের কষ্ট হচ্ছিল খাওয়াপরার। তাই ঠাকুরকে অনুরোধ করেন মা কালীকে বলতে। মা তখন এই কথা বলেছিলেন। এর মানে, তিনি যাকে ভালবাসেন তাকে নানা অভাবে ফেলেন না। তার জন্য ডালভাতের ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই হয়ে থাকে। অভাব যত কমবে ততই ঈশ্বরচিন্তার সময় পাবে — plain living and high thinking আদর্শ।

এই ডালভাতের ব্যবস্থা করে কোনও নির্জন স্থানে চলে যাওয়া — এই কথা বলতেন। দুই তিন দিন নির্জনে থাকলেও world of difference (অনেক তফাৎ)। এও partial (আংশিক) সন্ন্যাস। শরীর যে চলে যাবে, তখন সব যে পড়ে থাকবে — এই ভেবে বের হতে হয়।

একজন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ছেলেপুলের জন্য খাটতে হবে কত দিন? ঠাকুর উত্তর করলেন, যত দিন না লায়েক হয়, অর্থাৎ করে খেতে পারে। তারপর যা হয় করুক। পশু-পাখিদের দেখলুম যতদিন ছোট থাকে মা খাওয়ায়। বড় হয়ে মাই খেতে গেলে, কিম্বা মায়ের মুখে মুখ দিলে সরিয়ে দেয়। মানে এখন বড় হয়েছে, খুঁটে খেতে শিখেছ নিজেরটা নিজে ক’রে খাও। পশু-পাখি বড় হলে বাচ্চাদের খেতে দেয় না। কিন্তু মানুষে তা নাই। তবে West-এ (পাশ্চাত্যে) আছে। ছেলে বড় হলে বসে খাওয়ায় না — রোজগার করে খাক্ — এরূপ না করলে সময় হবে কি করে? সারা জন্ম খাটলেও শেষ নাই।

অর্থ-বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত কি না জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর বললেন, ‘হাঁ, যদি বিদ্যার সংসারের জন্য হয়।’ বিদ্যার সংসারের জন্য মানে, যদি ভগবানলাভ উদ্দেশ্য থাকে। যদি তা দ্বারা দেবসেবা, সাধুভক্তসেবা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হয় — কেবলমাত্র আত্মীয় পরিজনের সেবার জন্য নয়, বাড়িঘর, গাড়ীঘোড়ার জন্য নয়, কোর্মা-

পোলাও আহারের জন্য নয়। বলরামবাবু এইটি করতেন। তিনি বলতেন, কেন আমি এদের জন্য এত খরচ করতে যাব? দেবতা, সাধু ও দরিদ্রের সেবা বেশী করতেন। সেই জন্য আত্মীয়রা অনেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। দেহ যাবার পর ওরা খুব খরচ আরম্ভ করে দিলে। ঠাকুর হৃদয় মুখুয্যেকে বলেছিলেন, ‘এ অপদার্থগুলিকে কেন খাওয়াচ্ছিস্ — এই চল্লুম তোর বাড়ি থেকে।’ উনি কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সাধু ভক্তদের সেবার নাম নাই, যত সব অপদার্থগুলির জন্য রোজগার করা। তা হলে ধনবৃদ্ধি করা যায় না। বেশী ধন উপার্জন করা যায়, যদি সাধুভক্ত, দেবতার কথা মনে থাকে। ভক্ত মানে যিনি সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন। এদিকে পাশের বাড়িতে না খেতে পেয়ে একজন দরিদ্র মর মর হয়েছে, তাতে লক্ষ্য নেই। ওদিকে নিজের বাড়িতে পাঁচ-সাত রকম রান্না হচ্ছে। তাও আবার এটা ভাল হয়নি, ওটা ভাল না — তা হ’লে ফেলে দাও। আর সাধুভক্তদের একটু সন্দেশ দাও তাতেই তুষ্ট। দরিদ্রদের একটু খাওয়ানো হলো অমনি তৃপ্ত, আর কতৃজ্ঞ কত! ব্রাহ্ম সমাজের একজন বলেছিল, 'all men are equal' (মানুষ সব সমান)। ঠাকুর শুনে বলেছিলেন — হাঁ, ছেলেমেয়ের বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করছে, আর এদিকে পাশের বাড়ির লোক শুধু ভাতও খেতে পাচ্ছে না, তা হলে কেমন করে equal (সমান) হয়?

শ্রীম (হরেনের প্রতি) — জামতাড়া আশ্রমে দেখলুম একটি লোক সাধুদের খাটিয়ার দড়িগুলি adjust (ঠিক) করছে। বললুম, তুমি বেশ লোক, সাধু সেবা করছো। সে বললে, না মশায় ওসব ভাববার অবসর নাই। কাজ করছি, পয়সাকড়ি নোবো। আমার শেয়ালের কথা মনে হলো। শেয়াল বলেছিল রামলক্ষ্মণকে, ‘আমার সীতার কথা ভাববার অবসর নেই। পেট নিয়ে দিবারাত্র ব্যস্ত।’ সীতাহরণের পর রামলক্ষ্মণ সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে শেয়াল এই কথা বলেছিল। ‘সীতার কথা’ মানে higher life-এর কথা — ঈশ্বরের কথা ভাববার অবসর নাই, লোকেরা সর্বদা পেট নিয়ে ব্যস্ত আর দেহ-সুখ।

কিন্তু কর্নেল সাহেব — উনিও ওদিকে থাকতেন। দরিদ্রের উপর কি ভালবাসা! কি সেবাই করতেন — জাতিধর্ম নির্বিশেষে। রাস্তায় চলে যাচ্ছে লোক, যেই তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলুম অমনি দাঁড়িয়ে পড়লো। আর বলতে লাগলো — 'অমন লোক হয় না মশায়, দেবতা। শত মুখে বললেও তাঁর কথা ফুরায় না।' রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে লোক, তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে শুশ্রূষা করতেন। কোনও স্বার্থ নাই — কি দয়া! ইনি higher life-এর (ঈশ্বরের) কথা জানতেন।

আর একটি দেখেছি — সাধুদের সেবা। জনমানব শূন্য মাঠের মাঝে আশ্রম জামতাড়ায়। পাশ দিয়ে রাস্তা। রাত হয়ে গেল। অমনি ছ'সাতখানা গরুর গাড়ী আশ্রমে ঢুকে পড়লো আশ্রয়ের জন্য। দু'তিনজন সাধু ওখানে থেকে সাধনভজন করেন। এঁরা আর কি করেন? আশ্রমে যা সামান্য ডাল চাল ছিল, তা রান্না করে এদের খাওয়াতে লাগলেন সারা রাত — কাল কি খাবেন তার ঠিক নাই! সাধু বলে এই সেবার ভাব — গৃহী হলে বিরক্ত হয়ে যায়। কেন, এঁরা higher life-এর (ঈশ্বরের) চিন্তা দিবানিশি করেন।

আর একটি ঘটনার কথা শুনেছি। সেদিন মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল জয়রামবাটিতে। ফিরবার সময় একজন গৃহী ভক্তের অসুখ হয়ে গেল রাস্তায়। সাধুরাও আসছেন সেই রাস্তায়। সঙ্গীকে এঁরা বললেন, 'এঁকে গাড়ী করে নিয়ে যেতে হবে। টাকা না থাকে, এই ন্যাও টাকা।' একজন সাধু বললেন, দেশে গিয়ে পাঠিয়ে দিও। আর একজন বাধা দিয়ে বললেন, 'না পাঠাতে হবে না। এঁকে ভাল ভাবে নিয়ে যাও।' আহা সাধু কিনা তাই অমন কথা! গৃহীরা এ inconvenient questions (অসুবিধার কথা) প্রায় জিজ্ঞেস করে না। কি জানি, যদি কিছু দিতে হয় তাই। গৃহে থাকলে লোককে কপট করে তোলে। ইচ্ছা থাকলেও দিতে পারে না। তা হলে যে নিজের ভাগে, আত্মীয়-কুটুম্বদের ভাগে টান পড়বে। সাধুদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।

একদিন ঠাকুর ভাবে আছেন। বেড়াতে বেড়াতে চানকের রাস্তা

দিয়ে চলছেন — হুঁস নাই। যেই ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে পড়েছেন অমনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন রাস্তা দেখে। আর বললেন, ‘আহা ঠিক যেন সাধুর হৃদয় — সোজা আর প্রশস্ত।’ সাধুদের হৃদয় উদার আর স্বার্থপরতা নেই। কিন্তু গৃহীরা আপন-পর ভেবে মন মলিন করে ফেলে। ভাল হবার ইচ্ছা থাকলেও কপট হয়ে যায়।

৩

এখন সন্ধ্যা সমাগতা। হারিকেনের আলো আসিল। হাততালি দিয়া ‘হরিবোল, হরিবোল’ বলিতে বলিতে শ্রীম ধ্যানমগ্ন হইলেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে শ্রীম-র ইচ্ছায় মোহন গান গাহিতেছেন। — ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম,

অপূর্বশোভন ভবজলধির পারে — জ্যোতির্ময়।

তারপর সকলে গাহিতেছেন ‘জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম গাওরে’। এইবার কয়েকজন ভক্ত বিদায় লইলেন। পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ হইল।

জগবন্ধু — আচ্ছা, ঠাকুর কোথায় কত দিন ছিলেন?

শ্রীম — কুঠিতে ছিলেন ষোল বছর ১৮৫৫-৭১ পর্যন্ত। গঙ্গার দিকের ঘরটায়, সামনে বারান্দা তারপর সিঁড়ি। ঠাকুরের মাও ঐ ঘরেই থাকতেন। অক্ষয়ের শরীর গেলে ঐ ঘর ছাড়েন। ১৮৭১-৮৫ পর্যন্ত চৌদ্দ বছর এখন যেখানে তাঁর বিছানা, সেই ঘরে ছিলেন। ১৮৮৫-তে অসুস্থ হয়ে প্রথম একটা ভাড়াটে বাড়িতে, তারপর বলরামবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন থেকে, শ্যামপুকুরের বাড়িতে যান। ১৮৮৬-তে কাশীপুর বাগানে। এখানে প্রায় দশমাস ছিলেন। এখানেই দেহ যায়।

শ্রীম (কার্তিকবাবুর প্রতি) — ডাক্তারবাবু, বিনয়বাবুর খবর কি?

ডাক্তার — হাতে আর মাথায় ব্যথা। রাত্রিতে হাতে মাথা রেখে শুয়েছিল।

জনৈক ভক্ত — কেন হাতের উপর কিছু কাপড় রেখে তার উপর মাথা রাখলে হয়।

শ্রীম — হাঁ, তা করলেও বেশ হয়। আর কম্বল পেতে মাথার নিচে ইঁট দিয়ে গায়ে গরম কাপড় মুড়ী দিয়ে থাকলেও হয়।

শ্রীম (জনান্তিকে হরেনের প্রতি) — তপস্যার ভাবে এঁরা সব মঠে থাকেন কিনা! (সকলের প্রতি) ত্যাগীরা কঠোরতা দিয়ে কামাদি বশ করে। কেউ কেউ আবার ভোগদ্বারা করে। এতে আবার ছানাপোনা হয়ে পড়ে। তখন জড়িয়ে যায় — অবসর হয় না। দিন-রাত খাট আর খাট। তাঁর চিন্তা নাই। এদের সুখের জন্য soul-কে (আত্মাকে) kill (হত্যা) কর। ঠাকুর তাই বলতেন, দু একটি সন্তান হয়ে গেলে সরে পড়, এদের ডাল ভাতের provision (ব্যবস্থা) ক'রে। এরা কিনা fruits (ফল), ভোগের fruits (ফল)। তাই এদের জন্য ডাল ভাতের provision (ব্যবস্থা) করতে পার, এর বেশী নয়। কি হেঙ্গাম। বিয়ে হলো তো ছেলেপুলে হলো। তাদের education (শিক্ষা), বিয়ে — অবসর কোথায়? এ সব যে অনিত্য, মৃত্যু যে সব শেষ করে দেবে। মৃত্যুচিন্তা নাই। রোজ কত লোক মরছে তাতেও চৈতন্য নাই। ভাবে — যারা মরবে তারাই মরছে। নিজের মৃত্যু ভুলে যায়। এইক্ষণে মৃত্যু এসে যে সব ভাসিয়ে নিতে পারে! তখন কে যাবে সঙ্গে? ঠাকুর এ কথাটা বড্ড বলতেন কিনা, খুব realise (উপলব্ধি) করতেন এটি।

শ্রীম ক্রমশঃ উত্তেজনাপূর্ণ ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহস্থ জীবনের যে বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন পুনরায় তাহারই উল্লেখ করিতে লাগিলেন। শ্রীম বলিলেন, 'গৃহীরা স্বেচ্ছায় সংসারের এই দাসত্ব শৃঙ্খল গ্রহণ করেছেন। ইচ্ছা করলে মুক্ত হতে পারে। মুক্তি যে জীবের স্বরূপ।'

শুকলাল — আচ্ছা, তাহলে কর্মফলের কি হবে, তার তো ভোগ হতেই হবে।

শ্রীম — ঠাকুরকেও একজন এই কথা বলেছিলেন — 'এই যে কর্ম করা যাচ্ছে তার তো ভোগ হবে — নয় কি?' ওটা যেন কোন কথাই নয়, অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর — এইভাবে ঠাকুর জবাব দিয়ে বললেন, 'কি বল, তিনি ইচ্ছা করলে সব উল্টে পাল্টে দিতে পারেন।'

আমার মনে হয় এইগুলি (কর্মফল ভোগাদি) না বললে ভোগ ত্যাগ করবে না লোক, সেইজন্য এই সব বলেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে সব উল্টে দিতে পারেন। ভোগটোগ আর বেশী কথা কি। 'With men this is impossible; but with God all things are possible.' (St. Matthew 19:26) যীশু ভক্তদের বিষণ্ণ দেখে বলেছিলেন, ‘মাভৈঃ আমি তোমাদের ভার নিয়েছি — আনন্দ কর।’ — ‘তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।’

(গীতা ১৮/৬২)

৪

এইবার ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রসাদ আসিয়াছে। দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় ভক্তগণ প্রসাদ পাইতেছেন। মেদিনীপুরের একটি ভক্ত তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীমকে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছেন।

মেদিনীপুরের ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — আজ্ঞে, মনটা এমন হয় কেন? কয়দিন বেশ আছে, আবার খারাপ হয়ে যায়।

শ্রীম — আপনি তাতে ভাবছেন কেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি সব ঠিক করে দিবেন। মন তো এরূপ করবেই — এর স্বভাবই এই। গিরিশ ঘোষও এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন — মন খারাপ হয় কেন? ঠাকুর বলেছিলেন, সংসারে থাকতে গেলে মেঘ উঠবেই। তরঙ্গ দেখে ভয় পেলে উহা যাবে না। মনের কাজই হলো ঐ। আপনি তাতে ভয় পাচ্ছেন কেন? তাঁকে বলুন। প্রার্থনা করুন, তিনি সব ঠিক করে দিবেন। তাঁর শরণাগত হলে, নিজের আর কিছু ভাবতে হয় না।

মেদিনীপুরের ভক্ত — আমার গুরুকরণ হয় নাই। ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী বলেছিলেন, তা তাঁর দেহ গেল। আমিও অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তাই মন্ত্র নেওয়া হয়ে উঠে নাই।

শ্রীম — এই দেখুন, তিনিই ভাবছেন আপনার জন্য। তা না হলে আপনি কি করে সাধুর নিকট গেলেন? ব্রহ্মানন্দজী তো ডাকেন

নাই আপনাকে? ঈশ্বরই তাঁর নিকট আপনাকে নিয়ে গিছলেন।

মেদিনীপুরের ভক্ত — এখন করি কি, তিনি তো চলে গেলেন?

শ্রীম — তাঁকে বলা — যিনি আপনাকে নিয়ে গিছলেন। তিনি সব যোগাড় করে দিবেন। উপায় বলে দিবেন। তাঁর শরণাগত হওয়া আমাদের উচিত। তিনি সকলের জন্য ভাবছেন। ঠাকুর বলতেন, সংসারে তিন থাকের লোক আছে। এ থাক্ যোগী। এরা সর্বদা তাঁর চিন্তায় মগ্ন — যেমন মৌমাছি, ফুল বৈ আর কিছুতে বসবে না। আর এক থাক্ তাদের যোগ ভোগ দুই-ই আছে — যেমন পাণ্ডবরা। এদের জন্যও তিনি ভাবেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। তৃতীয় থাক্ — যারা শুধু ভোগী। তাদের জন্যও কি কম ভাবছেন? তাদেরও দেখছেন। চণ্ডীতে আছে, তিনি সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করছেন। তাই মায়ের মত ভাবছেন সকল সন্তানের জন্য। কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির বাইরে যায় না। ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন, 'মা-ই সব হয়ে রয়েছেন। তিনিই আবার সর্বভূতে অবস্থান করছেন। তবে ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা।' দেখুন না, কেমন জন্মাবার আগেই মা'র মাইয়ে দুধ দিয়ে রেখেছেন। সূর্যকে পাঠিয়ে জীবদের রক্ষা করছেন। পশুদের জন্যও কেমন ভাবছেন, দেখুন। গ্রীষ্মে ঘাস সব শুকিয়ে যাচ্ছিল, তা জল দিচ্ছেন। তবে ঘাস জন্মাবে আর ওরা খেয়ে বাঁচবে। আমাদের কিছুই ভাবতে হবে না। সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। তিনি আমাদের জন্মের পূর্বের খবর জানেন, আবার মৃত্যুর পরের খবরও জানেন।

ঈশ্বরই গুরু। তিনিই মন্ত্র দেন — মানুষে প্রকাশিত হয়ে। একজনের কথা শুনতে হয়। আর সাধুসঙ্গ করা। সাধুদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করা অনুচিত। এঁদের দর্শনেই চৈতন্য হয়ে যায়। এঁরা জেনেছেন, ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য। সাধুসঙ্গের এক ভয় আছে, নানা জনের নানা মত। সব শুনতে গিয়ে গোলমালে পড়বার আশঙ্কার থাকে। তাই একজনের কথা শোনা, আর সাধুসঙ্গ করা। একটি বেশ গল্প আছে। এক রাজার রাজ্য আক্রান্ত হলো। ইঞ্জিনিয়ার বলছে তার মত কথা। কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ বলছে তার কথা। আর প্রিষ্ট (পুরোহিত)

বললে পুনশ্চরণের কথা। যে যতটুকু জানে তাই বলে। এখন বেচারী রাজা যায় কোন্ পথে? সেজন্য একজনের কথা শুনতে হয়। যিনি সর্বদা ভাবেন, যিনি ভার নিয়েছেন তাঁরই কথা শুনতে হয়। সবের কথা শুনতে গেলে গোল বেঁধে যায়।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — সাধুসঙ্গ করতে হয়। মঠে এঁরা সব যাচ্ছেন রোজ — মান্থলি (মাসিক) টিকিট করে। আপনার যাওয়া হয় তো মঠে?

মেদিনীপুরের ভক্ত — আজ্ঞে অনেক দিন যাই নি। অসুখ-বিসুখ গেল, আর ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী চলে গেলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা আছে। রামলাল দাদা কৃপা করেন।

শ্রীম — সাধুসঙ্গ করতে হয় — সাধুসঙ্গ। ওঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা উচিত নয়। ওঁদের দর্শনই education (শিক্ষা)। দর্শন করলেই মনে হবে, এঁরা ষোল আনা মন দিয়ে তাঁর চিন্তা করতে চেষ্টা করছেন। পথে দাঁড়িয়েছেন। এঁদের দেখে নিজেরও ঐ করতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু কথা বা উপদেশ পালন করতে হয় একজনের। অন্যদের উপদেশও তাঁর কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়।

সংসারে থাকতে গেলে সুখদুঃখ এসব থাকবেই। দেহটাই হলো এ সবের গোড়া। দেহ থাকলেই ঝড়ঝঞ্ঝা আসবে। ভগবান-দর্শন করলে, তখন ভয় নাই। তখন সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ত্রিগুণাতীত হয়ে যায়। Crystal — স্ফটিকের মত হয়ে যায়, যেখানে রাখ সেই রং ধরবে। ঈশ্বরদর্শনের পর সংসার করা যায়। তখন সুখকেও সুখ বলে বোধ হয় না, আর দুঃখকেও দুঃখ বলে বোধ হয় না। শুচি-অশুচি বোধ থাকে না। ক্রোধাদি থাকে লোককে দেখাবার জন্য। ঠাকুর বলতেন, সাধুর ক্রোধাদি যেন পোড়া দড়ি — ফুঁ দিলে উড়ে যায়। হয়তো ঘড়ি, ঘড়ির চেন পরে সেজে গুজে বসে আছে, আবার এগুলি নিয়ে যাও আপত্তি নেই। যেন পাঁচ বছরের শিশু। বাইরে কত তেজ দেখাচ্ছে অমুক আইন করতে হবে, অমুককে শাসন করতে হবে। এ সবই রাজ্য রক্ষার জন্য। ভিতরে জানেন, আমি কিছুই না। পরমহংস অবস্থায় কোন গুণের বশ নয়।

এই যত সব দুঃখকষ্ট দেখা যাচ্ছে এই সব রূপ মাত্র — জলের বুদ্বুদ। কতক্ষণ আছে তারপরই আবার জলে মিশে যাচ্ছে। স্ব-স্বরূপকে চিনলে তখন আর কোন দুঃখকষ্ট থাকে না। স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পুরুষ — যাঁর জন্ম নাই — মৃত্যু নাই, সুখদুঃখ নাই, নির্বিকার, গুণাতীত। এই apparent man-এর (স্থূল মানুষের) ভিতর real man (দেবমানব) আছে। যেমন কাশীতে অন্নপূর্ণার আসল ছবি আছে। ও দেখতে গেলে পয়সা লাগে। ওটি ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। সে মূর্তি পাথরের। নকল ছবি সোনার, বাইরে। নকলটি তুললেই আসলটি দেখা যায়। তেমনি apparent man-এর (স্থূল মানুষের) ভিতর real man (দেবমানব) আছে। তাঁকে চিনতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না।

৫

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আত্মীয়-কুটুম্ব-ছেলেমেয়ে এ সব রূপভেদে সৃষ্টি — জলের বুদ্বুদ। আমার নাম অমুক, অমুকের ছেলে, বাড়ি হেথায়, এগুলি সব মিথ্যা — বুদ্বুদ যেমন। এদের অস্তিত্ব নাই। এই যে লোক মরছে, রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, এতেও আমাদের চৈতন্য হয় না। ভাবি, যারা মরবে তারাই মরছে। আমরা মরবো না। মহামায়ার এমনি মায়া। ঠাকুর তাই বলতেন, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। অর্থাৎ শরীর ধারণ করলে ঈশ্বরকে পর্যন্ত কাঁদতে হয় মায়ার হাতে পড়ে — যেমন রাম, কৃষ্ণ, ক্রাইস্ট। এই যে যুদ্ধটা (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) হয়ে গেল, এটা কি? কতকগুলি রূপ শেষ হয়ে গেল। বড় একটা জিনিস বলে এটার উপর দৃষ্টি যায় না। তখন ভাবে, যারা মরবে তারাই মরছে।

শ্রীম (মেদিনীপুরের ভক্তের প্রতি) — কেন আপনি ভাবছেন? তিনিই আপনার জন্য সব যোগাড় করে দিবেন। তিনি সবের জন্য ভাবছেন। দেশ থেকে আসবার সময় বর্ধমানের মাঠের ভিতর ঠাকুর দৌড়ে চলে যেতেন — দেখতেন ওখানে জীব আছে কি না। গিয়ে দেখলেন, পিঁপড়ে সার বেধে যাচ্ছে। বলতেন, ঈশ্বর এদের জন্য

এখানেও খাবার রেখেছেন। তিনিই সব হয়ে রয়েছেন — মানুষ, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী সব তিনি, অন্তরে বাইরে, ঊর্ধ্বে, নিম্নে সর্বত্র তিনি। তিনিই অন্তরে থেকে সব চালিত করছেন। আবার তিনিই সকলের জন্য সব যোগাচ্ছেন সকলকে পরিপালন করছেন। আপনি কোনও ভাবনা করবেন না। পূর্ব থেকেই সব ঠিক হয়ে রয়েছে। আমরা বুঝি না বলে অত সব দুঃখ-কষ্ট। ঈশ্বরদর্শন হলে বুঝা যায়, এই সব ভেলকী মাত্র — বস্তুতঃ কোনও অস্তিত্ব নাই এদের। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যেতে পারেন রোজ মঠে? সাড়ে এগারটায় অফিস, তা সাড়ে আটটায় ফিরে আসা যায়। সাধুসঙ্গ করলে সব ঝঞ্ঝাট দূর হয়ে যাবে। এ-বই আর উপায় নাই।

মেদিনীপুরের ভক্ত — আজ্ঞে, শরীর দুর্বল, সাধনভজনও তেমন কিছু করতে পারি না।

শ্রীম — 'কর্ষয়ন্তেন্দ্রিয়গ্রামং' — দেহ ও ইন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়ে সাধন করা। এটি আসুরী প্রকৃতির লোকেরা করে। হয়তো শীতকালে জলে গা ডুবিয়ে রাখলো। সত্ত্বগুণী তা কেন করতে যাবে? তারা ভাবে, অমনিই হয়ে যাবে — তাঁর শরণাগত হয়ে, তাঁর ধ্যানজপ আর প্রার্থনা করে।

হরেন্দ্র — কিন্তু দেহকে সুখ দিলে তো সুখ মিটে না। যত দেওয়া যায় ততই সুখের ইচ্ছা বেড়ে যায়।

শ্রীম — না, তাঁদের এমনি বিশ্বাস যে তাঁর কৃপায় এমনি হবে। শুধু শুধু কেন দেহকে কষ্ট দেওয়া। দৃঢ় বিশ্বাস। গীতায় আছে, 'নাত্মানমবসাদয়েৎ' (গীতা ৬:৫) আত্মাকে — মনকে অবসাদগ্রস্ত করা উচিত নহে। অথবা কঠোরতা করলে মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সাধনভজন করা উচিত। করে যাওয়া — এক জন্মে নাইবা হল দর্শন। আর এক জন্মে কি হয়? 'অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্' (গীতা ৬:৪৫) — অনেক জন্ম তপস্যা করলে তাঁকে লাভ হয়। নাইবা হলো এক জন্মে — দশ জন্মে হবে। তা বলে ভজনে ক্ষান্ত হওয়া কেন? লেগে থাকা। খান্‌দানি চাষা একবছর

ফসল হলো না বলে কি চাষবাস ছেড়ে দিবে? চাষ করতেই থাকবে। হয় আর না হয় — করে যাওয়া। এখন বড্ড chance (সুযোগ)। এখন যাদের হলো না তাদের আর হবে না। অবতার এসেছেন কি না, এখন বড়ই সুযোগ। উঠে-পড়ে লাগতে হয় এখন।

সাধুসঙ্গে মন শীঘ্র কি আর যেতে চায়? নানা অসুবিধা create (সৃষ্টি) করে। জোর ক'রে ঠেলেঠুলে যেতে হয় — will power (ইচ্ছা শক্তি) যাদের আছে তারাই যেতে পারে। তারা শক্তিমান। শত অসুবিধা ঠেলেও তারা সাধুসঙ্গ করবে। উঠে-পড়ে লাগতে হয় — তবে হয়। বড্ড chance (সুযোগ) এখন, রোখ চাই। ঠাকুর গরু কেনার গল্প করতেন। ল্যাজে হাত দিতেই যে গরু ছিনিমিনি খেয়ে ওঠে সেটা পছন্দ করে চাষারা। তার দাম পঁচাত্তর টাকা। আর যেটা হাত দিতেই আরামে নুইয়ে পড়ে সেটা কিনে না। তার দাম পাঁচ টাকা। তেমনি যারা তিড়িং বিড়িং করে উঠে pleasurable sensation-এ (দেহসুখে) yeild (বশ্যতা স্বীকার) করে না, তাদেরও হবে। No compromise (কোন কথাই মানবো না)।

আপস করা চলে না।

কলিকাতা, ২৬শে মে ১৯২৩ খ্রীঃ, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল।
শনিবার, শুক্লা একাদশী।

একাদশ অধ্যায়

সব চাইতে বড় দান — জ্ঞান ভক্তি প্রেম দান

১

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীম দোতলার লম্বা বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন। ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। মেজেতে মাদুর পাতা। শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, রাখাল, সুখেন্দু ও যোগেন আসিয়াছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে সুরেন গাঙ্গুলী, দুর্গাপদ, ছোট নলিনী, সুধীর, বিরিঞ্চি, হরেন মাষ্টার, অমৃত প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাপীঠ হইতে একজন সাধু আসিয়া পূর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

সাধু (শ্রীম-র প্রতি) — আমি ইতিমধ্যে ঢাকা গিছলাম। চার পাঁচ দিন ছিলাম, বাড়ির ওদের সঙ্গে দেখা করে এলাম। কিন্তু মঠে যেতে পারি নাই।

শ্রীম — বেশ করেছ, তারা নিশ্চিন্ত হবে। কথায় আছে, বংশে একজন সাধু হলে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। মানে, আত্মীয়গণ সর্বদা তার কথা ভাবে কিনা। তার সঙ্গেই অনিচ্ছায় ঈশ্বরচিন্তা হয়ে যাচ্ছে। কারণ ভক্ত-ভগবান অভেদ। ঠাকুর বলেছিলেন, মিছরির রুটি, যেভাবেই খাও মিষ্টি লাগবে।

জনৈক ভক্ত — আজ সংবাদ পেলাম আমাদের একটি বন্ধুর স্ত্রীপুত্র সব মারা গেছে পর পর।

শ্রীম (বাহ্যিক বিস্ময়ের সহিত) — বলেন কি, এমন সর্বনাশ!

শ্রীম-র ভাব দেখিয়া সাধুটি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রহ্মচারী ভক্তগণও কেহ কেহ ঐ হাস্যে যোগদান করিলেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — তোমরা তো হাস্য করবেই, আদপেই ঐ পথে গেলে না। আমাদের এটি হবার যো নাই। আমরা স্নেহ-

মমতায় পড়ে রয়েছি। কত কথা, একসঙ্গে কত কাল বাস, কত আশা। পরিবার কত বড় friend (বন্ধু), তার বিয়োগ। আবার ছেলে, যাকে years together (বহু বৎসর ধরে) দেখছে, লালন-পালন করছে। কম কষ্ট! একটি ভক্তের কন্যা আগুনে পুড়ে মারা যায়। ভক্তটি তখন বসে তবলা বাজাচ্ছেন। ঠাকুর এই কথা শুনে বলেছিলেন, 'বল কি মেয়েটা মারা গেল, তার একটু শোক হলো না?' রবিবাবুর একটি কবিতা আছ, 'তারকার আত্মহত্যা'। ভিতরে জ্বলছে কিন্তু বাইরে প্রকাশ নাই। এও আছে। আর একবার একটি ভক্তের শোক হয়েছে — ছেলে মারা গেছে। ঠাকুরকে বলায় তিনি শোকে যেন অভিভূত হয়ে গেলেন। কত রকম করে বাপকে বোঝাচ্ছেন। বলছেন, অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনেরই এমন শোক হলো, তা সাধারণ মানুষের কথা কি! পুত্র-শোকে রাবণের হাড় সব ছিদ্র হয়ে গিছলো। প্রথমটা খুব সমবেদনা প্রকাশ করলেন। তারপর ঔষধ দিচ্ছেন। ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে দাশরথি রায়ের গান ধরলেন —

'জীব সাজ সমরে রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি' লয়ে জ্ঞান তূণ, রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেম গুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম-ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান ক'রে॥'

শ্রীম — তুমি শোক কচ্ছ, তোমারও যে যেতে হবে দুদিন পর। তার জন্য প্রস্তুত হও। (ভক্তদের প্রতি) ওরা তো হাসবেই, আদপেই ও পথে গেল না। আমাদের এটি হবার যো নাই। বহুকাল ধরে একসঙ্গে বাস করায় অন্তঃকরণ স্নেহ-মমতায় জড়িত হয়ে পড়ে এমন হয়েছে যে পশুপক্ষীরও কষ্ট দেখলে হৃদয়ে লাগে। একদিন চারতলার ঘর থেকে একটা কি জিনিস দু'তলায় এনেছি। দেখি, পিঁপড়ে ধরেছে সেথায়। হাতে ঝেড়ে পিঁপড়ে ফেলে দিলুম। ওমা, অমনি মনে হল — আহা এ কি করলুম। এরা যে গর্ত খুঁজে পাবে না। আবার হাতে করে যেখানে ছিল সেখান রেখে এলুম। আমাদের চলে না ও-টি। ওরা তো হাসবেই!

হরেন্দ্র মাষ্টার (সহাস্যে) — ওটা তো ভালর জন্যে করেছেন, ওতে দোষ কি?

শ্রীম (গম্ভীরভাবে) — না, এও বন্ধনের কারণ। গীতায় আছে, '.....ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' (গীতা ২:২০) — আত্মার বিনাশ নাই, শরীরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এটি খাঁটি।

হরেন্দ্র — তাহলে একজন দুঃখকষ্ট পাচ্ছে, কিম্বা একজন অপর একজনকে মেরে খাচ্ছে, তাও তো কিছু নয়!

শ্রীম — তা ঠিক। কিন্তু এটি বোধ হয় ঈশ্বরদর্শন হলে — সমাধির পর। ঠাকুর বলতেন, 'কখনও আমার এমন অবস্থা হয়, তখন মরা মারা দুই-ই সমান বোধ হয়।' দেহ তো আমি নয়, তবে দেহ গেলে দুঃখ কিসের? কিন্তু আমাদের এটি তো হবার যো নাই। প্রবর্তক যারা, অর্থাৎ যাদের গুরু আছেন তাদের দয়া, দান, স্নেহ থাকা উচিত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দান—অন্নদান, অর্থকরী বিদ্যাদান, বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম দান। সব চাইতে বড় জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম দান! তারপর অর্থকরী বিদ্যা, তারপর অন্নদান। অন্নদানের উপরে আর একটি আছে প্রাণদান। এও অন্নদানের অন্তর্গত। একজন জলে ডুবে যাচ্ছে, কি আগুনে পুড়ছে, তাকে রক্ষা করা। অর্থকরী বিদ্যাও দেহের জন্য। বিদ্যাদ্বারা অর্থ উপার্জন হবে তবে দেহসুখ হবে। তবে লৌকিক বিদ্যাদ্বারা বিচার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। তা দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্ধান হতে পারে। ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য, এ বুদ্ধি আসতে পারে। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার পরই অর্থকরী বিদ্যার স্থান। সাধারণতঃ অর্থকরী বিদ্যাও দেহসুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক শ্রেণীর লোকের ভাব, 'শরীরম্ আদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্' — আগে দেহ, তারপর ধর্ম, ঈশ্বর। দেহের দিকে মন দিতে গিয়ে শেষ অবধি দেহই ঈশ্বর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বিরোচনের হয়েছিল। ঠাকুর ওপথ মোটেই মাড়ালেন না। তিনি বলতেন, 'আমি দেহসুখ চাই না মা, লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, শতসিদ্ধি চাই না মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও — শুদ্ধা, অটলা, অচলা, অহেতুকী ভক্তি।' চৈতন্যদেবও এই একই কথা, বলতেন। দেহের সুখদুঃখের কথা তুলতেনই না, কেবল বলতেন, হরি নাম

কর, সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

এই ভারতের লোকেরা এটা বেশ বুঝেছিল। চাষ-বাস করতো, আর হরিনাম। তাই ঋষিগণ সব ছেড়ে প্রেম ভক্তি দান করতেন। ওদেশের (পাশ্চাত্ত্যের) লোকেরা কেবল ভোগ নিয়ে আছে। ওদের ঐ Objective (উদ্দেশ্য), কিসে বেশী দেহসুখ লাভ হয় তার চেষ্টা। রেল-স্টীমার, টেলিগ্রাম-টেলিফোন সব দেহসুখে নিয়োজিত। কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (শিল্পবাণিজ্য), এগ্রিকালচার (কৃষি), হাসপাতাল-ডিসপেনসারী-ঔষধাদি ঐ দেহের জন্য। রেডিও, এরোপ্লেনও ঐ জন্য। সমস্ত বিজ্ঞানটাই দেহসুখে লাগিয়েছে।

"সমগ্র মন দিয়ে ভগবানকে ভালবাস" — ক্রাইস্টের এ কথা কেউ শুনছে না। মিশনারীদের চেষ্টাও বিফল হয়েছে।

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা বহু তপস্যার ফল। এখানে জন্মালে রক্তে এ দেশের সংস্কার থেকে যায়। দেখ না গান্ধীমহারাজ — পলিটিক্স করছেন। কিন্তু এটাকে spiritualised ক'রে (ঈশ্বরলাভের উপায়রূপে লাগিয়ে) দিয়েছেন। নিজে ফকির। কোথায় পাবে এ আদর্শ? একদিন গঙ্গাস্নান করতে গেছি, দেখি চাষাভুষা একদল লোক। দলপতি গঙ্গাস্নান করিয়ে সকলের হাতে একটি করে পয়সা দিল — উড়িয়া পাণ্ডাকে দিবে। এ দৃশ্য দেখে মনে হলো, সনাতন হিন্দুধর্ম যেন দেহ ধারণ করে এসেছে। এমনটি কোন দেশে পাবে? ভগবানের উদ্দেশ্যে এই দান। বার মাসে তের পার্বণ সব ঈশ্বরকে নিয়ে। এমনটি কোথায় আছে? পাড়াগাঁয়েই এ সরল বিশ্বাস বেশী। শহরে পড়ে আসছে (decreasing) সব। পাড়াগাঁয়ের লোকেরাই ধর্মের এই সব আচরণ পালন করছে।

ভারতবর্ষে জন্ম হওয়াই ভাগ্যের কথা। তারপর এখন আবার special opportunity (বিশেষ সুযোগ)। ঠাকুর এসেছেন, ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। এখন বড্ড chance (সুযোগ)। জীবের দুঃখ কি কম? জীবের দুঃখে কাতর হয়ে তিনি আসেন, এই দুঃখ দূর করতে। (জনৈক ভক্তের প্রতি) বুঝলেন, তাঁকে চিন্তা করলেই হবে। তিনি অবতার — নিজে বলেছেন, আমরা বলছি না —

'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে' (গীতা ১০:১৩)। আমরা কি বলবো? আমাদের কথায় কি হয়? একসেরে ঘটিতে কি দশসের দুধ ধরে? ঠাকুর নিজে বলেছেন, 'সচ্চিদানন্দ এ শরীর ধারণ ক'রে এসেছে।'

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কর্তাগিরিটাই যত মুশকিল। আমরা কর্তা কর্তা করি কি নিয়ে? এই দেহটি দেখুন না! কত সব কল ক'রে দিয়েছেন — তাতে spinal chord (মেরুদণ্ড), digestive power (পরিপাক শক্তি), brain (মস্তিষ্ক) কত কি! এত করে দিয়েছেন তিনি, আর আমরা বলছি কর্তা। কর্তাগিরি বের হয়ে যায় এই কলটি একটু বিকল হলে। সাধনার দরকার। তিনি কর্তা আমরা অকর্তা এটা বোঝাবার জন্যই সাধনা। সাধনা মানে নিজেকে চেনার চেষ্টা। নির্জনে বসে ভাবা — আমি কে, কি উদ্দেশ্যে আমার জন্ম, কেন মৃত্যু? এই জগৎটা কি, কে করেছে? দুঃখ কষ্ট কেন, দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? চির সুখ, শান্তি লাভ সম্ভব কি? নির্জনে বসে এসব চিন্তা করা। এরূপভাবে চিন্তা করলে শেষে দেখা যায় ঈশ্বরই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব হয়ে রয়েছেন। তিনি অন্তরে থেকে আবার চালাচ্ছেন। তখন তাঁর শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি কর্তাগিরি কমিয়ে দেন। কর্তাগিরি কম পড়লেই শান্তি, আনন্দ।

শ্রীম (গৃহস্থ ভক্তের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, যারা গৃহে আছে দুই একটি সন্তান হয়ে গেলে ভাই বোনের মত থাকতে হয়। তখন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এসব পাঠ করতে হয়। সর্বদা ভগবৎভাবে থাকা — যেন দুটি ভগবৎ সেবক সেবিকা!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটু সাধনার দরকার। তা নইলে মহাপুরুষেরা কেন সাধনা করেন? তাঁদের নিজের কোনও দরকার নাই। এই যে ঠাকুর, তাঁর কি দরকার ছিল সাধনার? তাঁর কাছে সাধনাই কি আর কি-ই বা কি? স্বয়ং ঈশ্বর মানুষ-শরীর ধারণ করে এসেছেন। তবুও এ কঠোর সাধনা কেন করলেন বার বৎসর ধরে?

লোকশিক্ষার জন্য। এঁদের দেখে অন্যরাও করবে তাই। একটু সাধনার দরকার।

মানুষ সব মায়াতে ডুবে আছে। অবতার এসে একটা আদর্শ ধরেন তাদের সামনে। তিনি নিজে আসেন আর সঙ্গে করে সাধুদের আনেন। এঁদের সাধনা দেখে অপর লোকের চৈতন্য হবে। ঢ্যালা দিয়ে তিনি ঢ্যালা ভাঙ্গেন, মাছের তেলে তিনি মাছ ভাজেন! শ্রীকৃষ্ণ এতসব wonderful activities (অদ্ভুত কর্ম) করলেন। শেষে কিনা উদ্ধবকে বললেন, 'এ সব কিছুই না, যা সব করা গেল। তুমি বদরিকাশ্রমে যাও, তাঁর চিন্তায় গিয়ে মগ্ন হও।'

শ্রীম কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তৎপর শ্রীম-র ইচ্ছায় একটি ভক্ত গাহিলেন ঃ

'পাড়ার লোকে গোল করে, ব'লে আমায় গৌর কলঙ্কিনী।
সে কি কইবার কথা কইবো কোথা লাজে মরি ও প্রাণসজনী॥'

ডাক্তার ও জগবন্ধু গাহিতেছেন, 'জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম, গাওরে'। গান সমাপ্ত হইল। শ্রীম বলিলেন, 'হেমেন্দ্র মহারাজ এসেছেন। আমরা কি দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করবো। দেবীভাগবত পড়ে শুনান যাক্।' শুকদেবের বৈরাগ্য প্রকরণ বাহির করিয়া দিলেন। একটি ভক্ত পড়িতেছেন।

শুকদেব বলিলেন — পিতঃ, এ সংসারে নিরাময় সুখ কি? বিষয়-সুখকে জ্ঞানীগণ দুঃখবিদ্ধ সুখ বলেন। অতএব উহা নিরাময় সুখ হইতে পারে না। ...পিতঃ সর্পরূপী সংসার দেখিয়া ভীত হইয়াছি।... আত্মতত্ত্ব চিন্তা ব্যতিরেকে মানুষের সুখ কোথায়? ... যিনি মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন তিনিই যথার্থ বিদ্বান ও জ্ঞানী, তাঁহারই শাস্ত্রপাঠ সফল হইয়াছে। আমি সেই বিদ্যা চাই।

শ্রীম — জ্ঞানঘনমূর্তি শুকদেব। তাঁর প্রবৃত্তিমার্গে রুচি নাই। তাই মোক্ষ-শাস্ত্র শুনতে চাইছেন। তীব্র বৈরাগ্য, তাই সংসার সর্পরূপী বলছেন, অর্থাৎ বন্ধনের কারণ। ঠাকুর বলতেন, এ অবস্থায় সংসার পাতকূয়া আর আত্মীয়স্বজন কালসর্প বলে বোধ হয়। মায়ার রূপ কিনা এসব। বেশ বলছেন, পুত্র-দারাসক্ত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য বৃথা।

(সহাস্যে) ঠাকুর বলেছেন, হেলে ভাগবতের পণ্ডিত — যার অনেক চাষবাস আছে। আবার বলতেন, শুধু পণ্ডিতগুলিকে খড়কুটোর মত মনে হয়। কারণ, তাদের দৃষ্টি ভাগাড়ে, কামিনী-কাঞ্চনে। বিবেক বৈরাগ্য থাকা চাই, তবে নিজের কল্যাণ, অপরেও কথা শোনে। তা নইলে বকে যাও কেউ শুনবে না। তাই শুকদেব বলছেন, এই সব লোক, 'রোগগ্রস্ত বৈদ্য, কিন্তু পররোগ চিকিৎসক।' পাঠ চলিতেছে। ব্যাসদেব উত্তর করিলেন — হে পুত্র, গৃহ বন্ধনের কারণ নহে, বন্ধনের স্থানও নহে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, শ্রদ্ধা, সত্য ও পবিত্রতাকে আশ্রয় করিয়া, মনে মনে ত্যাগ করিয়া মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ...শাস্ত্রও বলেন, প্রথমে ব্রহ্মচর্য, তারপর গৃহস্থ আশ্রম, তৎপর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস পর পর গ্রহণ করিবে... হে পুত্র, ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য দারপরিগ্রহ করিবে এবং বার্ধক্যে তপস্যা করিবে — শাস্ত্রবিদ্‌গণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন।

শ্রীম — এটা সাধারণ নিয়ম, একের পর অন্য আশ্রম গ্রহণ। বিশেষ নিয়ম আছে,

'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।' এও আছে। মন্দ বৈরাগ্যে এরূপ বিচার চলে। তীব্র বৈরাগ্য হলে এ হিসাব থাকে না। আর সংসারে থেকে হবে না কেন? কিন্তু বড় কঠিন। 'বার্ধক্যে তপাতিষ্ঠেৎ' — বৃদ্ধকালে তপস্যা করিবে, এ ব্যবস্থা কার জন্য? যার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল তার জন্য। আর যার পূর্বজন্মের সংস্কার আছে, বহু তপস্যাদি করেছে, ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য এ বোধ হয়েছে, সে কেন যাবে এ ঝঞ্ঝাটে। আর বৃদ্ধ শরীরে তপস্যা, অসম্ভব।

(পাঠকের প্রতি) — পড়।

পাঠক পড়িতেছেন, শুকদেব বলিলেন, হে পিতঃ, আমি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিব না। ইহাতে সর্বজীবগণ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ধনের জন্য কুটুম্বগণ সর্বদা পীড়ন করিয়া থাকে। ধনচিন্তকের সুখ কোথায়? লোভী ধনবান ব্যক্তির রজনীতে সুনিদ্রা হয় না। এ অবস্থায় সুখ কোথায়?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন সংসার জ্বলন্ত অনল। এখানে সুখ

কোথায়? নানা আপদ গৃহস্থাশ্রমে। তাই দুঃখময়। শুকদেবের এই জ্ঞান হয়ে গেছে তাই বলছেন, বিষ্ঠামূত্রময় গর্ভাবাস দুঃখময়। জন্ম দুঃখময়, জরা দুঃখময়, মরণ দুঃখময়। এ দুঃখময় জীবনে অনাবিল সুখ এক ঈশ্বরের পাদপদ্মে। আর কোথাও সুখ নাই। তাই বিষয়-সুখকে দুঃখ-সংবিদ্ধ সুখ বলা হয়েছে — অর্থাৎ ছদ্মবেশী দুঃখ। (সহাস্যে) পুত্রস্নেহে অশ্রুপাত করছেন ব্যাসদেব। তা আর করবেন না? শরীর ধারণ করলে এ সব হয়। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের শোকে কেঁদে আকুল। ঠাকুর বলেছিলেন, 'অক্ষয়ের (ভ্রাতুষ্পুত্রের) শরীর গেলে, তখন হৃদয়টা যেন শোকে গামছা নিংড়াচ্ছিল।' এমন অবস্থা হয়েছিল আমার। এ সব সাময়িক মাত্র এঁদের।

কলিকাতা, ২৭শে মে, ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল।
রবিবার, শুক্লা দ্বাদশী।

দ্বাদশ অধ্যায়

মূল কথা — তাঁর শরণাগত হয়ে সংসারে থাকা

১

সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত হইয়াছে। ঘরে গরম। শ্রীম মর্টনের দোতলার লম্বা বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। ছোট জিতেনকে ডাকিয়া লইলেন। তাহার সহিত কিছুকাল কি পরামর্শ করিয়া ঘরে আসিয়া মেজেতে বসিলেন। মোহনকে একটি গান করিতে বলিলেন। মোহন গাহিতেছেন —

গান

তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে॥
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে।
জানি না কখন ডুবে যাবে মন অকূল গরল পাথারে॥
তুমি বিশ্ব বিপদ হন্তা, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা।
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে যাও মোরে মত্ত বাসনা মুছায়ে॥
আছ অনল অনিলে চির নভো নীলে, ভূধর সলিলে, গহনে।
আছ বিটপী লতায়, জলদের গায়ে, শশী তারকায়, তপনে॥
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরি যে কাঁদিয়া।
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে॥

শ্রীম (গায়কের প্রতি) — বেশ। কিন্তু এরও উপর ঠাকুর আর একটি বলেছিলেন — 'আছ অনল অনিলে চির নভো নীলে ভূধর সলিলে গহনে' এর চাইতেও অধিক। সেটি, অবতার মানুষ-শরীর ধারণ করে আসেন। ঠিক মানুষের মত সব করেন। যেমন ঠাকুর, কৃষ্ণ, ক্রাইস্ট। '....মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' (গীতা ৯:১১)। এর উপরও আর একটি আছে। রূপ ধারণ করে কথা কন। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ

যিনি বাক্য মনের অতীত তিনি রূপ ধারণ করে ভক্তের সঙ্গে কথা কন। নিরাকার সাকার হন। ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বর কথা কইতেন একঘর লোকের সামনে — একদিন নয়, সর্বদা। ঈশ্বর একরূপে অবতার হয়েছেন, অপররূপে কথা কইতেন। দুটি না হলে লীলা চলে না তাই। তিনি না বোঝালে এ তত্ত্ব দুর্বোধ্য। নিরাকার, সাকার, অন্তর্যামী, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, অবতার সেই একের ভিন্ন রূপ।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — 'গয়া গঙ্গা'-টি গান না আপনি।

ডাক্তার গাহিতেছেন —

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥

তারপর শ্রীম নিজে গাহিতেছেন মধুর স্বরে —

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এ সব গানে একেবারে কাছে নিয়ে যায় — ভিতর বাড়িতে। আর ঐ সব গানে বাহির বাড়িতে থাকে মন।

বড় জিতেন — এলে তো আমাদের এই সব গান? এই অবস্থা ছাড়া কি হয়?

শ্রীম — হাঁ; তবে ঠাকুর যখন বলছেন তখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

ছোট জিতেন রাত্রিবাস করেন বেলুড় মঠে। নিত্য শ্রীম মঠের বিবরণ শুনেন। আজও শুনিয়াছেন। ভক্তদের মঠবাসের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — অনেকে মঠে আজকাল রাত্রিবাস করছেন তপস্যার ভাবে। তা আবার কেউ কেউ মশারি নিয়ে যান বগলে করে। আরামের মধ্যেই তো থাকা যাচ্ছে। তপস্যার ভাবে থাকতে গিয়েও আবার মশারি! কেন, মাঠে গাছতলায় একখানা ইঁট মাথায় দিয়ে থাকা যায় না? আমরা কি করলুম তাঁর জন্য? আহা, এমন গঙ্গাতীর! দু'ঘন্টা বসে থাকলেও জীবন ধন্য হয়ে যায়। যতক্ষণ

জেগে থাকা হলো ততক্ষণ গঙ্গাতীরে বসা গেল। তারপর মাঠেই কম্বল পেতে মাথায় ইঁট দিয়ে, একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলো। একদিন করলেও কত হয়। আমরা কি কষ্ট করলুম তাঁর জন্য! এই সাধুরা মঠে মশারির নিচে ঘুমোয় বটে; কিন্তু তাঁরা যে কি কষ্ট করেন, বাইরে কত দুঃখ বরণ করেন তাঁর জন্য, তাতো আর দেখছে না। তিন দিন না খেতে পেয়ে হয়তো পথেই পড়ে রইলো। মঠে আসেন জুড়াতে। সেদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। ঠাকুর এক একখানে এক একটি আড্ডা করে দিয়েছেন তাঁদের বিশ্রামের জন্য। পাখি যেমন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাসায় আসে বিশ্রামের জন্য, তেমনি সাধুরা সাধনভজন ক'রে ক্লান্ত হলে, দিন কয়েকের জন্য আসেন এখানে বিশ্রাম করতে। এ কি সুখের বিশ্রাম? গৃহে কত আরাম। একজন বিছানা করে দিচ্ছে। খাবে তো পাঁচ সাতটা রান্না হলো আর থালার চারদিকে সাজিয়ে খাওয়া যাচ্ছে। সাধুরা কত অনাহার অল্পাহার করেন, কত কষ্ট করেন। তবে মশারির নিচে ঘুমান কখনও। ওদিকে লক্ষ্য নাই, আমরা দেখি তাঁদের মশারিতে ঘুমোন। তাঁরা পারেন মশারির নিচে ঘুমুতে। কেন না, চলে যাওয়ার সময় মশারি সঙ্গে নেন না। আর আমরা বগলে করে নিয়ে যাই। আমাদের কত আরামে থাকা যাচ্ছে। একটু দাঁত কনকন করছে, অমনি ওষুধ, ইনজেকশন্। তাঁদের কে দেখে—দাঁত কনকন করলে, অসুখে বিসুখে? হায়, তাঁর জন্য আমরা করলুম কি? না হয় অসুখ বিসুখই হলো তাঁকে ডাকতে ডাকতে। তবুও মনে হবে, যাই হউক একটু কিছু করেছি। খেদ মিটে।

আবার অনেকে মঠে গিয়ে পেট ভরে প্রসাদ খায়। এ সবে আশ্রম-পীড়া হয়। সেখানে কি পেট ভরে খেতে আছে? সন্ন্যাসীর ভিক্ষার অন্ন। তাঁরা যে সেখানে খেতে দেন, থাকতে দেন, সে যে কত সৌভাগ্য। তাঁরা ভয় পান গৃহীদের দেখে। কেন? না, এরা সব গ্রাম্য সুখ নিয়ে রয়েছে। তাই তাদের দেখলে, স্পর্শ করলে সাধুদের আতঙ্ক হয়।

আর একটি আমাদের দেখা উচিত। সাধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক

করতে নাই। তাঁদের দর্শন আর প্রণাম — এই যথেষ্ট education (শিক্ষা)। একজন হয়তো একটু better equipped — বেশী জানে ক'টা কথা। তর্কচ্ছলে সাধুদের তা বললে তাঁদের মনে কষ্ট হতে পারে। মঠে তাঁরা যা বলেন তার জন্য এমনি (যুক্ত করে) homage (শ্রদ্ধা) দিতে হয় — আজ্ঞা হাঁ বলে। তিরস্কার করলে কিছু বলতে নাই ওখানে। পরে মঠের বাইরে পেলে বরং friendly (বন্ধু) ভাবে কিছু বলবার থাকলে বলা যেতে পারে। তাও অতি বিনীতভাবে বলতে হয় যাতে তাঁদের মনে কষ্ট না হয়। কত বড় আশ্রম (সন্ন্যাস আশ্রম) — ওখানে গিয়েও আবার কথা! একটু common-sense (সামান্য বিচারবুদ্ধি) দিয়ে দেখলেই বুঝা যায় — সবেমাত্র এঁরা এসেছেন ছেড়েছুড়ে। সব কথা তো এঁদের জানা নাই — চেষ্টা করছেন, পথে উঠেছেন। এটা লক্ষ্য করলেও তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা বন্ধ হয়ে যায়। কখনও তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা উচিত না, নিজে বিদ্বান বুদ্ধিমান হলেও না। তাঁদের কথা মেনে নিতে হয়। যাঁরা ছাদে উঠেছেন তাঁদের সঙ্গে কথা কওয়া যায়। সব খবর বলতে পারেন ওঁরা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ মঠ থেকে তিন জন সাধু এসেছিলেন —দু'জনই মালাবারের লোক। (সহাস্যে) একজন বড় গোলমালে পড়েছেন! তাই প্রশ্ন করলেন — 'ঠাকুরের তো উপদেশ যুগধর্ম ভক্তিযোগ। স্বামীজী বলেছেন কর্মযোগ, এখন কোন্ পথে যেতে হবে?' আমরা বললুম, স্বামীজীর কর্মযোগ পড়েছেন, তাঁর ভক্তিযোগও আছে। সেটা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। যখন কর্মের কথা বলেছেন তখন তার উপরই জোর দিয়েছেন। মানে অধিকারী ভেদে বলেছেন এ কথা। আমরা আরও বললাম, দু'রকম কর্ম আছে — egoistic and altruistic (নিজের জন্য আর পরের উপকারের জন্য)। Egoistic (নিজের জন্য) যেমন family life (পারিবারিক জীবন) altruistic (পরোপকারের জন্য) হাসপাতাল, ডিস্পেনসারী এ সব করা। দুটোতেই তাঁকে লাভ করা যায় যদি নিষ্কাম হয়ে করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন নিষ্কাম হয়ে যুদ্ধ

করতে — ফলের আশা না রেখে। পরিবার পালন করা, এতেও মুক্তি হয় নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে। নিষ্কাম হয়ে করতে না পারলে দুটোই বন্ধনের কারণ। আমাদের মিশনের যে কাজ, এ তো চিত্তশুদ্ধির জন্য। ভগবৎ বুদ্ধিতে সেবা করলে চিত্তশুদ্ধি হয়, তারপর তাতে ভক্তি হয়। এ সব altruistic (পরের উপকারের জন্য) কাজ — এই হাসপাতাল, ডিস্‌পেনসারী নিষ্কাম হয়ে করলে এ সব মুক্তির সহায় হয়।

নানা পথ। অর্জুনকে কতকগুলির কথা বলেছিলেন। প্রথমে রাজ্যের লোভ, তারপর নামযশের লোভ দেখালেন। এতেও কাজ হলো না। তারপর বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়। তোমার প্রকৃতিতে যুদ্ধ রয়েছে। তা তোমায় করতেই হবে —

'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি' (গীতা ১৮:৫৯) — আমাতে সব ফল অর্পণ করে, নিষ্কাম হয়ে কর। ভরতও ঐ ভাবেই রাজ্য শাসন করেছিলেন। রাজধানীতে না থেকে নন্দীগ্রামে কুটীরে বাস করতেন। ফলমূল আহার আর ভূমি শয্যা। কম্বলাসনে বসে দিবানিশি 'রাম রাম' জপ করছেন। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র এলে এঁদের সঙ্গে রাজ্য শাসনের পরামর্শ করতেন। রামের রাজ্য শাসন আর রামের চিন্তা — এই করে চৌদ্দ বছর কাটালেন। ভরত, অর্জুন — এঁরা নিষ্কাম কর্মীর উদাহরণ।

২

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — স্ত্রীপুত্র-পরিজনের জন্য কর্ম, বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাঁর সঙ্গে যোগ না রাখলে। প্রাণপাত করে অর্থ রোজগার করা যাচ্ছে আর সব কুটুম্ব সেবায় লাগান হচ্ছে — এতে তাঁকে পাওয়া যায় না। (জনৈক ভক্তকে লক্ষ্য করে) সাধুভক্তের সেবা নাই — শুধু কুটম্ব সেবা। আবার নিজের সেবা — বাটিতে বাটিতে নানা খাদ্য সাজিয়ে গুচ্ছের আহার। এতে যে আত্মা মলিন হয়ে যায়! এমনি প্রকৃতি — নিজে খেটে খেটে মরছে। আর সেই অর্থে কতকগুলি worthless (অপদার্থ) লোকের সেবা হচ্ছে। ছি ছি! কেন এত করা হচ্ছে এদের জন্য —ওরা কে, কি value (মূল্য)

আছে এদের? না আছে কোন গুণ, না ঈশ্বরে ভক্তি। তবে কেন এদের জন্য এই প্রাণপাত? ছেলে, মেয়ে, জামাই এদের খাইয়ে কি লাভ? এতে ঈশ্বর লাভ হবে না। দেবসেবা, সাধুভক্তের সেবা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, এ সব করলে তাতে মুক্তি হবে। আর শুধু কুটুম্ব-সেবায় বন্ধন হয়। এই ভেবেও এদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ান যায় — আজ দেহ গেলে কি হবে? এরা কি আর বেঁচে থাকবে না? তবে কেন অত ভাবনা? এরা কাকে ভালবাসে? টাকাকে। যে এত করে রোজগার করে খাওয়াচ্ছে তাকে নয়। এই বরানগরে বাপের বুকে এক ঘা মেরে দিলে ছেলে — আর বাপের মৃত্যু। কি একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এই স্নেহ! অক্ষয় ডাক্তার মারা গেল। ছেলেরা দিনকয়েক একটু শোক-টোক করছিল। তারপর যা করছিল তাই করছে। শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই খাচ্ছে দাচ্ছে, বেড়াচ্ছে, মোটর হাঁকাচ্ছে সব করছে। এই তো পুত্র কন্যার স্নেহ বাপের জন্য! যার জন্য এই মনুষ্যজীবন তার কি হলো — এদিকে লক্ষ্য নাই। অযথা খেটে কেন জীবনটাকে পণ্ড করা? ভগবৎ সেবায় লাগানো উচিত। এখনও সময় আছে। উঠে পড়ে লাগা উচিত।

হৃদয় মুখুয্যের বাড়িতে গেছেন সিওড়। সেদিন কুটুম্বদের নেমতন্ন ছিল। ওদের দেখেই ঠাকুর রওনা। বললেন, 'এদের কেন খাওয়ানো। এরা যেখানে বসে সেখানকার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়ে যায়।' যারা beastly life lead (পশুবৎ জীবনযাপন) করছে তাদের সেবায় কেন এই অজস্র ব্যয়। এক একবার জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে ঠাকুর বলতেন, 'মা আর সহ্য করতে পাচ্ছি না। একে কামিনী-কাঞ্চনে সব ডুবে রয়েছে, তাতে আবার শুধু কুটুম্বসেবা! কি করে উঠাবো এদের?' পরিজনের একটা দাবি আছে। অন্নবস্ত্রের। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান হলেই হলো। এ provision (ব্যবস্থা) করতে হয় যতক্ষণ নিজের দেহবুদ্ধি রয়েছে। যতক্ষণ নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ আছে। লজ্জাবোধ আছে, নাবালক ছেলে, অবিবাহিতা মেয়ে — এদের provide (ব্যবস্থা) করতে হয়। পিতামাতা থাকলে তাঁদের সেবা, যাবৎ বেঁচে থাকে তাবৎ করতে হবে। ছেলেপুলের

ডাল ভাতের ব্যবস্থা হলেই সরে পড়া। সারা জীবন লেগে থাকা কেন? ব্যবস্থা করে সরে পড়া নির্জনে। মাঝে মাঝে সংবাদ নেওয়া। provision (ব্যবস্থা) করা ডাল ভাতের, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের — বিলাসিতার জন্য নয়, নানা রকমের অন্ন ব্যঞ্জনের জন্য নয়, গাড়ী বোঝাই কাপড়ের জন্য নয়। ঠাকুর এইরূপ করতে বলতেন। আর বাকী টাকা দিয়ে দেবসেবা, সাধুভক্ত-সেবা, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা কর। এতে আত্মার কল্যাণ হবে — মুক্তি হবে।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — দেখুন না, আমরা কি নিয়ে রয়েছি। যাতে পশুজীবন বাড়ে তার চেষ্টাই সর্বদা করছি। আহার-বিশ্রাম-সন্তানোৎপাদন-মৃত্যু — এই তো জীবন। ঈশ্বরের জন্য কি করেছি আমরা? নিজেরাও এই করছি, পরিজনবর্গকেও এই শেখাচ্ছি। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দাও — সংসার বৃদ্ধি হউক এই কাজ। কিন্তু বেদ বলছেন, 'ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ' (কেনোপনিষদ্ ২:৫) — এ শরীরে ভগবানকে না জানতে পারলে মহাবিনাশ। তার কি করলুম? তাই ঠাকুর বলতেন মাঝে মাঝে নির্জনে চলে যেতে। যদি এ সব কথা স্মরণ হয় নির্জনে — জীবনের উদ্দেশ্য কি, আর করছি কি? পরিবারের লোক যদি পশুজীবন যাপন করে তা হলে তো তাদের ছাড়া খুব সোজা। ভক্ত হলে বরং ছাড়া কষ্টকর। ভক্তকে তো ছাড়া যায় না কিনা! সঙ্গে থাকতে গেলেও আসক্তির ভয়। আমরা কি সব নিয়ে আছি। এক একবার বসে বসে ভাবতেন আর বলতেন, 'মা, আমি কি করবো? কে শুনছে কথা? সব দেখছি কড়াইয়ের ডালের খদ্দের।' অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনের। ঘরে বেয়ান বেয়াই জামাই এলে কত আয়োজন খাবার-দাবারের — যেন উৎসব লেগে গেল। গুরু-সাধু-ভক্ত এলে ডালভাত। কুটুম্বস্নেহে মন নিচু হয়ে যায়। সাধুভক্তের জন্য স্নেহে ভগবান লাভ হয়। যে যার সেবা করে সে তার সত্তা পায়।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — এক গুরুর শিষ্য ছিল একজন দরজী। গুরুপত্নীর একটি জামার দরকার। শিষ্য বলছে, 'বানিয়ে দেব মা, কাটা কাপড় পড়ুক।' কাটা কাপড়ও হয় না আর জামাও হলো

না। একজন মাছ ধরছে — দু'সের, চার সের ওজনের মাছ সব। গুরুর জন্য একটি চাইলো। সে বললে, দাঁড়াও এগুলি বড় বড় — কাটিবাটা একটি পড়ুক দোবো। (সকলের হাস্য)। হাঁ, গুরুর বেলায়, কাটা কাপড় আর কাটিবাটা। ঠাকুর-দেবতার সন্দেশ আনতে হবে। তা কতকগুলি চিনির ঢেলা। মাথায় মারলে রক্ত বের হয়। জামাইবাবুর সন্দেশ আসবে তা বৌবাজার যাও। আট টাকা সেরের সন্দেশ। দেবালয়ের পায়েস হবে। তিন সের দুধ জল দিয়ে দশ সের করা হলো। আর জামাই সেবার পায়েস করতে হলে দশ সের দুধকে জাল দিয়ে দু'সের কর! এই তো সংসারের চিত্র! এই নিয়ে আমরা দিনরাত কাটাচ্ছি।

শ্রীম (স্বগতঃ) — বন্ধু কে, কুটুম্ব কে? যে ভগবানের পথের সহায় —Eternal life (অমৃতত্ব) যাঁর সাহায্যে লাভ হয় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। (ভক্তদের প্রতি) 'চাচা আপন বাঁচা।' (সহাস্যে) বেশ কথাটি বুড়ো আমায় বলেছিলেন গাড়ীতে। মিহিজাম থেকে আসছি। রেলের বাবুরা আমায় শোবার জায়গা করে দিলে অন্য লোকদের উঠিয়ে। গাড়ী ছেড়ে দিলে, আমি সবাইকে এনে ডেকে আবার বসাচ্ছি। একজন বসতে চায় না। না মশাই আপনি বসুন। আমি বললুম, 'না আপনি বসুন। কি হয় এক রাত্রি বসে কাটালে এমন pleasant (সুন্দর) রাত।' এর মধ্যেই দেখতে পেলাম গাড়ীর সব আমার favour-এ (পক্ষে) হয়ে গেছে। একটি বুড়ো পাশে বসা, পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা — ঘা-টা হবে। পাখানা গুটিয়ে রেখেছেন, কষ্ট হচ্ছে মনে হয়। দেখে আমি বললুম, 'আপনি কেন এই কষ্ট করে বসেছেন, পা-টা মেলে বসুন।' বুড়ো বললেন, মশায় 'চাচা আপন বাঁচা' (সকলের উচ্চহাস্য)। কেন শুধু শুধু ওদের জন্য খেটে খেটে চিত্ত মলিন করা?

৩

শ্রীম (জনৈক যুবকের প্রতি) — শুকদেব বলেছিলেন, পরাধীনের সুখ নাই। আর যে স্ত্রীর অধীন তার সুখ আদপেই নাই। 'সুখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ'। স্ত্রীলোক নিয়ে সংসার। এবং আবার

চার পাঁচজন একসঙ্গে থাকতে পারে না। ঝগড়া রাগরঙ্গ কোঁদল এই সব হয়। রেগে গেল, অমনি মারলে এক ঘা ছেলের পিঠে। অভিমান হলো, অমনি চোখের জল, আর নাক থেকে সিঙ্গনী ঝেড়ে ফেললে। এই সব নিয়ে সংসার — স্ত্রীপুত্র কন্যা। বিপদে পড়লে, পরীক্ষায় পড়লে তখন বোধ হয় কেউ কারো নয়। সব আপন আপন নিয়ে ব্যস্ত — struggle for existance, 'চাচা আপন বাঁচা'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অবতার আসেন জীবকে এই দুরবস্থা থেকে উঠাতে। অকর্ম কমাতে। কি করে অমৃতত্ব লাভ হয় সেই পথ দেখিয়ে দেন। যারা শোনে, বেঁচে গেল। না শুনলে বিনাশ। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনলে না পরিজনরা। তাই পরস্পর মারামারি ক'রে ধ্বংস হলো প্রভাসে। উনি জানতেন এদের এই পরিণাম। তাই পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন। ছেলেগুলি ঋষিদের, জ্ঞানীদের অপমান করতে লাগলো। তারপরই পরস্পর ঝগড়া, মারামারি করে যদুবংশ ধ্বংস হলো। শ্রীকৃষ্ণ বগলতলায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন সাক্ষিস্বরূপ। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করবেই — Prakriti must assert itself. দুঃখিত হলেন না — for he was ready for the worst. তিনি পূর্ব থেকেই এই পরিণাম জানতেন।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, 'টাকায় অর্ধজীবন্মুক্ত হওয়া যায়, যদি ব্যবহার জানা থাকে।' পরিবারবর্গের জন্য ডাল ভাতের ব্যবস্থা করে সরে পড়া। অবশিষ্ট অর্থে সাধু, ভক্ত, দেবসেবা করা। বলরামবাবু এটি করতেন। আহা, কি ভক্ত পরিবার! মেয়েদের বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাড়িশুদ্ধ লোককে ভক্ত বানিয়ে ফেলতো। শিক্ষার এমনি প্রভাব। স্নান করে, পূজা করে, চন্দনের তিলক ধারণ করবে; তারপর জপ করে জলগ্রহণ করবে। বুড়ো শাশুড়ী ভাবছে, বউমা ছেলেমানুষ, মালা জপ করছে, আমরা কি করছি! দেখে দেখে ওরাও জপ করতে আরম্ভ করলে। এমনি শিক্ষা বাড়ির। বাড়ির কর্তারা যেমন করেন ছেলেরাও তাই শিখে। তাই কর্তাদের খুব সাবধান হওয়া দরকার।

এই দেহের যে কিছুই ঠিক নাই — এই আছে এই নাই। যা

টাকা আছে, এর interest- এ (সুদে) চলতে পারে এমনতর হলেই হলো। বেশী করতে গেলে অবসর হবে না। চাল বাড়ালেই বিপদ। এমন শোনা যায়, ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) কেহ চাল বাড়িয়ে ফেলেছে। লাটের ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। এখন লাটের চালে চলতে হচ্ছে। এদিকে দেনা হয়ে পড়লো। কি আর করে এখন। একদিন দরজা বন্ধ করে টুস করে আত্মহত্যা করে বসলো। এই একমাত্র সমাধান এ সমস্যার। তাই 'চাচা আপন বাঁচা'।

শ্রীম-র এই সুদীর্ঘ ও সুনিপুণ অস্ত্রোপচারে কি ভক্তদের মনে কোন সংস্কার জন্মিল, কে বলিবে? বাহ্যতঃ সকলে যেন নির্বাক নিস্পন্দ। ভক্তগণ কি এই অমৃতোপদেশের কতকাংশও কার্যে পরিণত করিতে পারিবেন! জীবপ্রকৃতি কি ভীষণ দুর্বার! ভগবানের পথের যে সহায় সে-ই প্রকৃত বন্ধু — মহর্ষির এই অমৃতবাণী শুনিয়া কি আমরা নিজেদের পারিবারিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিব?

অনেকক্ষণ ধরিয়া কারো মুখে কোনও কথা নাই। অবশেষে, জ্ঞানবৃদ্ধ ভক্তাগ্রণী বড় জিতেন সাহসে ভর করিয়া ভক্তগণের মনোবেদনা নিবেদন করিতে লাগিলেন।

বড় জিতেন (অতি বিনীতভাবে) — আজ্ঞে, ঠাকুরের এই সব মহাবাক্য যদি ঠিক্ ঠিক্ পালন করে উঠতে না পারে কেউ, তার কি উপায় হবে।

শ্রীম (প্রশান্তভাবে) — তাঁর শরণাগত হওয়া। তাহলে তিনি নিজে ভার নেন। নিজে করিয়ে নেন। তিনি উত্তম বৈদ্য।

বড় জিতেন (হতাশভাবে) — যাই বলুন মশায়, Higher Power-এর (ঈশ্বরের) কাছ থেকে শক্তি না পেলে সাধন-তপস্যা কিছুই আমাদের হচ্ছে না।

শ্রীম — হাঁ Higher Power-ই (ঈশ্বরই) বলেছেন, সাধন তপস্যা করা উচিত। অন্ততঃ চেষ্টা করা উচিত, উদ্যম করা উচিত। তিনি বলেছিলেন, প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি ভাল। Success (সফলতা) থেকে failure (বিফলতা) ভাল। Success-এ (সাফল্যে) তাঁকে ভুলে যায় মানুষ। Failure-এ (বিফলতায়) তাঁর চৈতন্য হয়।

'প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি'।

মূল কথা তাঁর শরণাগত হওয়া। আর তার জন্য যা বলেছেন, চেষ্টা করা। বাকী কাজ তাঁর। তিনি তো সকলের জন্যই ভাবছেন — যোগী, যোগীভোগী আর ভোগী। সকলের ভার তাঁর উপর। কিন্তু যদি তুমি শান্তি চাও, সুখ চাও এ জীবনে, তাহলে তাঁর জন্য চিন্তা করতে চেষ্টা কর। তাঁর শরণ লও।

কলিকাতা, ২৮মে, ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল।
সোমবার, ত্রয়োদশী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

‘এই মুখ দিয়া তিনি কথা কন’

১

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন প্রায় সাতটা। শ্রীম দোতলার বারান্দার পূর্বপ্রান্তে বসিয়া ডাক্তার বক্সীর সহিত কথা কহিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে জগবন্ধুকে ডাকিলেন। ইতিমধ্যে যোগেন আসিয়া পড়িল। যোগেনের বয়স পঞ্চাশ। সংসারে একটি মাত্র পুত্র। চিত্তে শান্তি নাই। পরে শ্রীম-র চেষ্টায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে খাজাঞ্চিকর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রণাম করিয়া যোগেন নিজ দুঃখের কথা বলিতেছেন।

যোগেন (শ্রীম-র প্রতি) — আজ্ঞে, আপনি আমার প্রতি একটু কৃপা করুন, একটা উপায় করে দিন।

শ্রীম — আজ গিছলেন অন্নদা ঠাকুরের ওখানে? ঈশ্বরীয় কথা কি কি হলো? স্তব, গান কিছু হলো?

যোগেন — গিছলাম; এমন কিছু হয় নাই ওখানে। মন বড়ই চঞ্চল। একটা উপায় করে দিন। আপনি অবতার-প্রায়।

শ্রীম (তীব্র প্রতিবাদস্বরে) — ভাগ্যিস আপনি বললেন (অবতার প্রায়)। কৃতার্থ হয়ে গেলুম আর কি! কেশব সেনের কথাই নিলেন না ঠাকুর, আর আপনার কথা! নারদ, শুকদেবের মত বলতে পারলে না হয় কতকটা হতো।

যোগেন (অপ্রস্তুতভাবে) — আপনি ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কিছু বলেন না। অন্যখানে অন্য কথাও হয়। আমার ধৃষ্টতা হয়েছে, ক্ষমা করুন।

শ্রীম (সকরুণভাবে) — ঈশ্বরের কথা কইলে যে আমার নিজের কল্যাণ। গীতায় আছে মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। ‘কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।’ (গীতা ১০:৯) — তাঁর

কথা ভক্তদের সঙ্গে কইলে নিজের মন পবিত্র হয়। এতে আমার লাভ। তাঁর কথা কওয়া আবার শোনা। তাইতো আপনাকে বলি, অন্নদা ঠাকুরের ওখানে কি সব কথা হয়। কি গান হয় তাদের প্রথম লাইনটি মনে করে আনবেন। ঈশ্বরীয় কথা শুনলে আমাদের প্রাণ শীতল হয়। ‘চাচা আপন বাঁচা’ (হাস্য)। এই যে মঠের কথা, সাধুদের কথা রোজ শোনা যাচ্ছে, এতে আমাদের কত কল্যাণ হচ্ছে।

শ্রীম ঘরে আসিয়া বসিলেন। একটু পর পুনরায় শুকলালের সঙ্গে বারান্দায় গিয়া কথা কহিতেছেন। সামান্য কথা হইলেও যার কথা তার কাছেই একান্তে বলিয়া থাকেন। কারো কথা কেউ জানে না। পুনরায় ঘরে আসিয়া বসিলেন।

বড় জিতেন (প্রার্থনা ভাবে) — একটা গানে আছে ‘বৎসের পিছু যেন ধেনু’। বাছুরের উপর যেমন গাভীর দৃষ্টি তেমনি কোনও মহাপুরুষের দৃষ্টি যদি কারো উপর সর্বক্ষণ থাকে, তবে তার আর ভয় নাই।

শ্রীম (অন্যমনস্কভাবে) — আহা, বৎসের হাম্বা হাম্বা রব। বেদে আছে বৎসের কথা!

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীম-র ভাবান্তর উপস্থিত হইল। উজ্জ্বল নয়নযুগল কোন সুদূর দেশে নিবদ্ধ হইল। মুখমণ্ডল প্রশান্ত গম্ভীর। কিয়ৎকাল পর ধীরে ধীরে কথা কহিতেছেন ঃ “বৎসের পিছনে যেমন গাভী ধাবিত হয় তেমনি যদি কেউ তার জন্য পাগল হয়ে ফিরে, তবে তার দর্শন হয়। (স্বগতঃ) ‘তপঃ ব্রহ্ম’ (তৈত্তিরীয়-ভৃগুবল্ল) (ভক্তদের প্রতি) সাধন চাই। এ ছাড়া হয় না। ঋষিরা সব ছেড়ে তাঁকে পেয়েছিলেন —

‘ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ’ (কৈবল্য উপঃ ১:২)।

বড় জিতেন চাহিলেন কৃপা, শ্রীম বলিলেন — ত্যাগ, তপস্যা চাই। কৃপালাভের জন্যও কি ত্যাগ তপস্যার প্রয়োজন? শ্রীম পুনরায় দীর্ঘকাল মৌন হইয়া রহিলেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (কার্তিকের প্রতি) — ডাক্তারবাবু, মঠে জ্ঞান মহারাজ কি

বলেছিলেন আপনাকে?

ডাক্তার — ‘কথামৃত’ উৎসবের কথা। যে তারিখে ‘কথামৃত’ প্রথম বের হলো সেই দিনে প্রতি বৎসর উৎসব করা। আর বললেন, স্বামীজী ‘কথামৃত’ সম্বন্ধে যা বলেছেন অত বড় কথা আর কোনও বই সম্বন্ধে বলেন নাই। ‘কথামৃত’ দিয়েই তো আমরা প্রথমে ঠাকুরের কথা জানি। তিনি (শ্রীম) রয়েছেন, এখন থেকে হলেই বেশ হয়।

শ্রীম — হাঁ। যদু মল্লিকের বাড়িতে মহেন্দ্র গোস্বামী ‘ভাগবত’ উৎসব করতেন। ঠাকুর ঐ উৎসবে যেতেন। মহেন্দ্র গোস্বামী আমাদের কাছে বলেছিলেন, ‘ভাগবত ভগবান কিনা — তাই তাঁর উৎসব’। ঠাকুরের কথা সব বেদবাক্য। নিজে বলেছেন, ‘ভক্ত-ভাগবত-ভগবান এক।’ ভগবানের কথা ভাগবত। ‘কথামৃত’ তাঁরই কথা তাই ভাগবত। এই কথায় আর একটি কথা মনে হলো। ছোট খাটটিতে বসে আছেন ঠাকুর। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘দেখ, এই মুখ দিয়ে তিনি কথা কন।’ আর কোনও কথা নয়, এই একটি কথাই। Parenthetically (অসংলগ্নভাবে) বললেন। আহা, তাঁর কথা বেদমন্ত্র। সংস্কৃতে না হলেও মন্ত্র।

‘ব্রহ্মমায়াজীবজগৎ’ এই একটি মন্ত্র। এটি জপ করলে সিদ্ধ অর্থাৎ ভগবানদর্শন হয়।

‘তাঁকে ডাকবে মনে বনে আর কোণে’ এই আর একটি মন্ত্র।

‘একটি থাক্ আছে, ঈশ্বর বৈ কিছু জানে না — যেমন মৌমাছি ফুলে বৈ বসবে না।’ এ আর একটি।

‘তিনি অন্তরে বাহিরে আবার তারও অতীত’। এই আর একটি। এটি গায়ত্রীর সার। এখন আমি যদি জপ করি, ‘তিনি অন্তরে বাহিরে আবার তারও অতীত’ তাহলে কি আর হবে না?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চৈতন্যের জন্য কত কথাই বলেছেন। শোনে কই লোক! মৃত্যুচিন্তা ভাল, মৃত্যুভয় ভাল না। এই মৃত্যুর কথা কত করে বুঝিয়েছেন, মনে থাকে কই আমাদের। দেখতেন কিনা চোখের সামনে! বলতেন, ‘সব জিনিসে মৃত্যুর ছাপ লেগে রয়েছে।’ বকধার্মিকের গল্প বলেছিলেন একদিন। ‘বক জলে বসে

আছে। লক্ষ্য মাছের উপর। মাছ নড়ছে, সেও এগুচ্ছে। আর ব্যাধ তীরে বসা সেও এগুচ্ছে। যেই মাছে ছোঁ মারা অমনি পেছন থেকে ব্যাধের তীর বিদ্ধ হলো আর প্রাণ গেল। এই জীবের অবস্থা!’ এ সব কথা কেন বলতেন? যদি চৈতন্য হয়! মৃত্যু যে সম্মুখে দণ্ডায়মান! লোক কি বললেই শোনে? কেবল ঐ সব নিয়ে ডুবে আছে সংসারে। শুধু পেট আর পেট। আর সন্তানোৎপাদন, সন্তানপালন। ওরাও (পশুগণ) তাই নিয়ে আছে। সারা দিন এমন করে (মাথা নিচু করে) খাচ্ছেই খাচ্ছে। আর এরই মাঝে দেহসুখ। আহা, গৃহীদের জন্য কত সহজ করে দিয়েছেন। একবারে ত্যাগের কথা বললে ভয় পাবে তাই নির্জনবাসের কথা বলতেন। তিন দিন, সাত দিন, কি দশ দিন থাকলেও হয়। এ যেন কলার ভিতর কুইনাইন। তেতো বলে ছেলে খাচ্ছে না, মা কলার ভিতর ঢুকিয়ে দিলো! এত সোজা করে দিয়েছেন পথ — তবুও করে কই লোক? কাজ আর কাজ। সারা দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে। অবসর কই তাঁকে ডাকবার। কতবার বলেছেন, ‘তাড়াতাড়ি সেরে নাও’, ‘খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে বের হয়ে পড়।’ কে শুনছে তাঁর কথা?

২

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — সমাধি হলো লোকের normal state (সহজ অবস্থা)। কিন্তু এখন abnormal (অসাধারণ) হয়ে গেছে। কেন? ভোগবাসনায়। ভোগবাসনা গেলে তবে সমাধি। বারোয়ারীতে বেশ দেখায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু দেবতারা সব বসে আছেন ধ্যানমুদ্রায়। এর মানে, জীবের normal state (সহজাবস্থা) সমাধি। সংসারে পড়ে সেটা abnormal (অসাধারণ) হয়ে গেছে। যেমন কেউ ঘুমুচ্ছিল অর্থাৎ সমাধিতে ছিল। তখন নাকের কাছে কেউ নস্যি নিয়ে ধরে রাখলে। এখন হাঁচতে হাঁচতে প্রাণ যায়। ঘুম ভেঙ্গে গেল। জীবেরও হয়েছে ঠিক তাই। সমাধি অর্থাৎ ভগবানকে ভুলে বিষয়ে মত্ত হয়ে পড়েছে। সংসারে একেবারে ডুবে রয়েছে সব লোক। ঠাকুর বলেছিলেন, ‘একটি লোককে কেবল দেখলাম ঊর্ধ্বদৃষ্টি, ফৌজদারি

বালাখানার মোড়ে। আর সব নিম্নদৃষ্টি।’ কলকাতায় গাড়ী করে আসতেন। মুখ বাড়িয়ে রাস্তার সব লোক দেখতেন। নিম্নদৃষ্টি মানে শুধু পেটের উপর দৃষ্টি। আহার, বিশ্রাম, সন্তানোৎপাদন আর সন্তান পালন এই নিয়ে সব ব্যস্ত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শুনেছিলাম, পূর্বে ছেলের বয়স যেই সাত বৎসর হলো, অমনি উপনয়ন দিয়ে গুরুগৃহে পাঠিয়ে দিলো। উপনয়ন মানে ব্রহ্মমন্ত্র। তা দিয়ে দেওয়া হলো। এখন গিয়ে সাধন করে তাকে জাগ্রত কর। ছেলের তো discretion (বিচারবুদ্ধি) নাই — তাই গুরুর উপর সব ভার। গুরু nature (প্রকৃতি) — দেখে ভিন্ন ব্যবস্থা করতেন। কারুকে তীর্থ করতে পাঠিয়ে দিলেন। কারুকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। আর কারুকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। বড় সুন্দর নিয়ম ছিল। এখন এ সব লোপ পেয়ে গেছে। পূর্বে পিতাগণ প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। প্রকৃত বন্ধুর কাজ — তিনি eternal life-এর (অমৃতত্ত্বের) সন্ধান বলে দেন। শুধু পেটে খাওয়ান আর পরান, প্রকৃত বন্ধুর কাজ নয়। ঠাকুর বলেছিলেন, আমাদের এই শরীরের ভিতর আরও দুটো শরীর আছে — সুক্ষ্ম ও কারণ। এই তিনটের আহার দিতে হয়। শুধু অন্নের সংস্থান করে দেওয়া, একে কি আর স্নেহ বলে — এ তো পশু-শরীরের কাজ এই স্থূল-শরীরটার। সূক্ষ্ম-শরীরের আহার বিদ্যাচর্চা। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস — নানা বিদ্যার আলোচনা। এতে Judgement and reasoning (যুক্তি ও বিচারশক্তি) বাড়ে। আর কারণ-শরীরের আহার ধ্যান, জপ, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম — এই সব। এই কারণ-শরীর দিয়ে মানুষ দেবত্ব লাভ করে। তিনিই প্রকৃত বন্ধু যিনি এই কারণ-শরীরের আহারের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীম (জনৈক গৃহস্থ ভক্তের প্রতি) — শুধু, পেটে কতকগুলি খাওয়ান — একে স্নেহ বলে না। এর জন্য এই কঠিন পরিশ্রম ও অর্থোপার্জন! রাম! একে বলে স্নেহ? ছেলে যেই একটু বড় হলো অমনি দাও বিয়ে — নিজে যা নিয়ে আছে তাই দাও। ভগবানের নাম নাই। সাধু-ভক্ত সেবার নাম নাই। উপার্জিত অর্থে শুধু পেট-

পূজা। এই স্নেহ! ছি ছি (উত্তেজিতভাবে)! মুখে আগুন এমন ভালবাসার।

মণি মল্লিকের ছেলে মারা গেল। প্রথমে কত শোক প্রকাশ করলেন ঠাকুর। কত করে তাঁকে বোঝালেন। ওমা, শেষে বলছেন, ‘জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।’ মূর্খ, তুমি শোক কচ্ছ, মৃত্যুকে ভুলে আছ। তোমার ভিতর যে মৃত্যু পূর্ব থেকেই ঢুকে আছে। মৃত্যুকে জয় করার জন্য প্রস্তুত হও। সেই মৃত্যুঞ্জয়ের শরণ লও — ‘শমন ডরে যাঁর শাসনে’।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই সব তাজ্জব কাণ্ড দেখে ঠাকুর মুচ্‌কি হাসতেন। কোথাও কিছু নাই একা বসে হাসছেন। Individual case (ব্যষ্টিগতভাবে) যখন দেখতেন তখন মুচ্‌কি হাসতেন। আবার জগতের ব্যাপার যখন collective way-তে (সমষ্টিগতভাবে) দেখতেন, তখন হাততালি দিয়ে নাচতেন — মহামায়ার কাণ্ড দেখে! এত সব করার পর, অত কথা বলবার পরও লোকের চৈতন্য হয় কৈ? তিন দিন করলেও হয় বলেছিলেন। করবে কি করে, সংস্কার থাকলে তো হয়। একটা version (মত) আছে, জন্ম মাত্রই শুকদেব তপস্যা করতে চলে গিছলেন। এ সব সংস্কার থাকলে হয়। পূর্বজন্মের কিছু সঞ্চিত থাকা চাই। তবে হয়, নইলে মনই যায় না ঐ দিকে। কি অজ্ঞান আমাদের। যাদের ম্লেচ্ছ বলা হয় তারা পর্যন্ত ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। বলছে, ভারতই problem of life (জীবনসমস্যা) solve (সমাধান) করেছে। কিন্তু আমাদের চৈতন্য হচ্ছে না! Plain living and high thinking — সরল জীবনযাত্রা আর ভগবৎ চিন্তা — ইহাই ভারতের সনাতন বাণী — ঋষিদের আবিষ্কার, কিন্তু আমরা তা ভুলে রয়েছি।

৩

বড় জিতেন — তপস্যা করার তেমন শক্তি আর কোথায় আছে? মনেও নাই শরীরেও নাই।

শ্রীম — সে কি কথা? শক্তি তো বাড়বে তপস্যা করলে।

তপস্যার অর্থই হলো স্বরূপকে চেনবার চেষ্টা। যত ওদিকে মন যাবে তত শক্তি বাড়বে। কি আমরা ঈশ্বরের সন্তান, কি ঈশ্বর — এই অভিমান বাড়লেই শক্তি অদম্য হয়ে গেল। হনুমানের কি মহাশক্তি। তপস্যা করলে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি সাহায্য করে। সেই শক্তির সহিত মিল হয়ে যায়। তাই যাদের মন দুর্বল তাদের তপস্যা করা উচিত। তবে শক্তি বাড়বে। তিনিই শক্তি দেন। ঠাকুর বলেছেন তপস্যা করতে। তাঁর কথা পালন করার চেষ্টা করলে তিনিই শক্তি দিবেন — শারীরিক মানসিক দুই-ই। মন শক্ত হলে শরীর তার অনুগামী হয়। (উত্তেজিতভাবে) তা করে কই লোক? করুক দেখি কেউ। তাঁর এই দু'টিমাত্র মহাবাক্য পালন করুক। তিনি বলেছেন, 'সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার', আর 'স্ত্রীলোক দর্শন করবে না সাধকের অবস্থায়'। করুক দেখি কেউ এই দু'টি পালন। সিদ্ধ হয়ে যেতে পারে কেউ যদি পালন করে। তার বেলা নয়! কিছুই করবো না আর শক্তি এমনি ফস করে এসে যাবে। গুরু মন্ত্র দিয়ে বলেন, সাধন-তপস্যা দ্বারা একে জাগ্রত কর। শক্তি শক্তি করে চীৎকার করলে কি আর শক্তি আসে? পালন করতে হয় — চেষ্টা চাই। অবতার হয়ে এসে ঠাকুর যা বলেছেন তা পালন করলে শক্তি অবশ্য আসবে। তাই সংস্কার মানতে হয়। এটি থাকলে ফস করে হয়ে যায়। পাঁচ বছরের শিশু মত্ত হয়ে বাজাচ্ছে, কি গান গাইছে। কেন? সংস্কার আছে, পূর্বের করা আছে তাই।

শ্রীম (অন্তবাসীর প্রতি) — কাল শুকদেবের বৈরাগ্যের কথা যা পড়া হচ্ছিল — সেটা মুখে মুখে একবার বলুন না।

অন্তেবাসী — শুকদেবের বৈরাগ্য হয়েছে। ব্যাসদেব পিতা, শোকে অশ্রু বিসর্জন করছেন। বলছেন, 'পুত্র, তুমি বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হও। তারপর বার্ধক্যে ধর্মাচরণ করিবে।' শুকদেব উত্তর করিলেন, 'পরতন্ত্র ব্যক্তির সুখ কোথায় — বিশেষতঃ যে স্ত্রীর অধীনে তার সুখ একবারে নাই। আত্মীয় কুটুম্ব ধনের জন্য সর্বদা গঞ্জনা করে। রাত্রিতে তাই সুখে নিদ্রা হয় না। গর্ভবাস, জন্ম, জরা, মৃত্যু সবই দুঃখপূর্ণ। যাতে এই সব দুঃখের অবসান হয় তার চেষ্টা করবো।'

এই বলে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

শ্রীম — মানে তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করলেন। দেখুন, তপস্যা করতে হয়। তপস্যা ছাড়া হয় না। তপস্যা করতে করতে আকাশবাণী হলো — ‘আমি সব হয়ে রয়েছি।’ তা না হলে মহাপুরুষরা কেন তপস্যা করেন? বেদে তাই ইহাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে —

‘তপঃ ব্রহ্ম’ (তৈত্তিরীয়-ভৃগুবল্লী)।

বড় জিতেন (বিনীতভাবে) — এদিক থেকে যে মন মোটেই সরছে না, কি করা যাবে? কৃপা না হলে কিছু হবে না।

শ্রীম — তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে সব হতে পারে। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে একটু চেষ্টা করা উচিত। কি আদর্শ! কতবার বলেছেন, ‘আমাকে চিন্তা করলেই হবে।’ আর কিছুর দরকার নাই। নির্জনে বসে দিনকতক এই কথাটা ভাবার চেষ্টা করা। কত সোজা পথ। নানান খানার কথাই নেই। দু’টি খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাঁর চিন্তা কর। দু’টি ভক্ত যেতেন ঠাকুরের কাছে। একটিকে দিয়ে দিনকতক কিছু জপ-টপ করিয়ে নিলেন। তারপর আর যাচ্ছে না! ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন ‘অমুক কেন আসছে না?’ একজন বললে, ‘ওর আসার আর সময় হয় না।’ ঠাকুর শুনে বললেন, ‘হাঁ, তার এজন্মে এই পর্যন্ত; এর বেশী আর হবে না।’ কত জন্ম তপস্যা করলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়! একদিন বিবেকানন্দরা সব বসে আছেন। ঠাকুর বলছেন, ‘আচ্ছা একজন ছাদে উঠেছে। আর একজনকে দেখছে উঠতে চেষ্টা করছে। তাকে তুলতে সাহায্য করতে পারে কি না বল?’ মানে, আমি ছাদে উঠেছি। আমার কথা শোন। কতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে বলেছেন; তবুও চৈতন্য হয় না লোকের। কি করে হবে? সব যে নিম্নদৃষ্টি। মিহিজামের মাঠে গিয়ে যদি আমি preach (প্রচার) করি পশুদের — ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য, তাহলে কি তারা শুনবে? মহামায়ার বিচিত্র খেলা — তাজ্জব কাণ্ড! এই দেখে ঠাকুর হাততালি দিয়ে নাচতেন। থিয়েটারে দেখায় ‘তাজ্জব কাণ্ড’। চীনে, ইংরেজ, জাপানী, জার্মানী — নানা দেশের লোক নানা ভাষায় বকে যাচ্ছে। ফলে এক মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি। কারো কথা কেউ বুঝে না, কারো

কথা কেউ শোনে না। তেমনি এ সংসার।

ডাক্তার বক্সী — ঠাকুর বলেছেন, 'আমাকে চিন্তা করলেই হবে।' কি চিন্তা করা — তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করা, কিম্বা আর কিছু?

শ্রীম — হাঁ, একদিন পাদপদ্মই হলো। একদিন তাঁর লীলাকথা। একদিন তাঁর উপদেশ। এ সবই তাঁর চিন্তা। এই চিন্তা করতে করতে life and soul-এর (জীবনের) বড় বড় problem-গুলি (সমস্যাগুলি) আপনিই solved (সমাধান) হয়ে যাবে কেরমে (ক্রমে)। আর একটি আছে। সেখানে চিন্তা নেই। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে মনের লয় হয়ে যায়। মনই নাই আর চিন্তা করে কে তখন? গানে আছে — 'মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।

মায়ের চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল।

পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।'

মনরূপ যে কালো ভ্রমর সে মায়ের পাদপদ্মে বসে মধুপানমত্ত। পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ অবিদ্যা, অজ্ঞান তাই দেখে সরে পড়লো। কি আর করে? ওখানে যাওয়ার হুকুম নাই — এলাকার বাইরে। এটি সমাধির অবস্থা। ভগবানদর্শন হলে মনের লয় হয়। এ কি আর লাঠি মেরে মনকে তোলা? তা হয় না — স্বাভাবিক গতি। একটা বজরা, পঞ্চাশটা দাঁড় টানছে, নড়ছে না। কেন? নঙ্গর করা রয়েছে যে। মন বিষয়-চিন্তায় বাঁধা রয়েছে, কেমন করে ওঠে?

বড় জিতেন (স্বগতঃ) — ওখানে মন মজে গেলে বিষয়ানন্দ আর ভাল লাগে না।

শ্রীম (ধমক দিয়া) — বিষয়ানন্দ-ফন্দ অত ভাবনা কেন? ঠাকুর যা বলেছেন তাই আমাদের করা উচিত। বলেছেন, 'আমাকে চিন্তা কর।' তারই চেষ্টা করা। অন্য কথায় মন দেওয়া কেন? তাঁর চিন্তা করলে, যেমন মাঠের জল শুকিয়ে যায় তেমনি কামটাম শুকিয়ে যাবে। মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ একটা না একটা চিন্তা থাকবেই। লোকে বলে, চিন্তা করো না। তা কি হয়? মন থাকলেই চিন্তা থাকবে। তাই তাঁর চিন্তা করা অন্য চিন্তা না করে।

ডাক্তার বক্সী — ওটি (সমাধি) গুরুকৃপায় হয়। গুরু বলেছেন,

হাজার গাঁটওয়ালা দড়ি, বাজীকর হাত নাড়িয়ে সব খুলে ফেলতে পারে।

শ্রীম — হাঁ, গুরুকৃপাতেই হয়। তবে গুরু যা বলেন তার চেষ্টা করা উচিত। কৃপা প্রকাশের একটা সূত্র চাই। শুধু ‘কৃপা কৃপা’ করলে কৃপা হবে না। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, শুধু প্রভু প্রভু করলে কি হবে, আমার কথা শুনতে হবে — 'And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?' (St. Luke 6:46) ঠাকুর কত তপস্যা করেছেন। আমাদের একটান্ করতে বলছেন। তাই আমাদের করা উচিত। ‘মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্’।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মন কি সহজে যেতে চায়? একজন ভক্ত সব ছেড়ে ঠাকুরের কাছে এসে রয়েছেন। আর একজন ভক্ত ঠাকুরকে বললেন, ‘ওর অত উঁচু ঘর আপনি বললেন, কিন্তু স্ত্রীর চিন্তা করছে’। শুনে ঠাকুর বললেন, ‘তা করবে না? দেহ ধারণ করেছে যে।’ যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। বিজ্ঞানী হলে এ দ্বন্দ্ব থাকে না। এই একটি থাক্ আছে। তাদের বেশী কিছু করতে হয় না নিজেদের। তিনিই করেন তাদের জন্য। একটি ভক্তের জন্য ঠাকুর এমন (জপের অভিনয় করিয়া) করছেন। পরে বলছেন। ‘খুব উঁচু ঘর। দেখলে, আমায় জপ করিয়ে নিলে।’ তিনি জানেন, সে নিজে করবে না, তা নিজেই করছেন। এ একটি আলাদা থাক্। একটা গানে আছে — ‘তারিণী, আছি ঋণী তব পায়’। ভগবানের নিকট আমরা ঋণী। অর্থাৎ normal state (সহজ অবস্থা) হলো ঐ পাদপদ্মে মন রাখা — সমাধি। সংসারে পড়ে জীব ঐটি ভুলে গেছে তাই ঋণী। ঐখানে আবার যেতে হবে সবাইকে। কতভাবে অভয় দিচ্ছেন ঠাকুর। যীশুও অভয় দিয়ে বলেছিলেন ভক্তদের বিষণ্ণ দেখে, ‘তোমরা আনন্দ কর। এই দুঃখময় সংসারে আমি তোমাদের ভার নিয়েছি, মাভৈঃ’ — 'In the world ye shall have tribulation : but be of good cheer; I have overcome the world.' (St. John 16:33) ‘তোরা কে আর আমি কে এ জানলেই হবে। তোদের বেশী কিছু করতে হবে না’ — ইহা

ঠাকুরের অভয় বাণী।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — এমনি অন্তর্দৃষ্টি ছিল ঠাকুরের। একবার তাকিয়ে দেখলেই ভিতরের সব কথা জেনে ফেলতেন — কা'র ভিতর কি আছে। যেমন কাঁচের আলমারির সব দেখা যায়। তাঁর কথা শুনলেই শান্তি। সংস্কার না থাকলে এ সব কথা ভাল লাগে না। পূর্বজন্মের করা থাকলে একটুতেই ফস্ করে জ্বলে উঠে। একটি ময়ূরকে চারটার সময় আফিং দেওয়া হয়েছিল। এখন রোজ আসছে চারটায় আফিং এর নেশায়। সংস্কার থাকলে তাঁর কথা শুনবার নেশা হয়। একটি ভক্ত এসেছিলেন এখানে। এ সব কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। মঠের কথায় বললেন, 'স্বর্গ এ ছেড়ে কোথায় পাব?' ভোগ শেষ হয়ে গেছে — ফরশা হয়ে আসছে, তাই অমন কথা আর কান্না! অরুণোদয়ের পরই সূর্যোদয়।

কলিকাতা, ২৯শে মে ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল।
মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

চতুর্দশ অধ্যায়

উপায় — সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ও প্রার্থনা

১

শ্রীম দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা সাতটা। চারিদিকে ভক্তগণ — শুকলাল, ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু। দেখিতে দেখিতে বড় জিতেন, বিরিঞ্চি, ছোট জিতেন ও সুখেন্দু আসিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে রাখাল, যোগেন, মনোরঞ্জন, ছোট নলিনী প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানীপুর হইতে ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের দুই ভ্রাতা আসিয়াছেন। একজন শ্রীম-র পুত্র প্রভাসবাবুর শ্বশুর। প্রাথমিক আদর-আপ্যায়নের পর শ্রীম তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মল্লিক মহাশয়ের প্রতি) — পরমহংসদেব বলতেন, ঈশ্বরের নাম শ্রবণ বা মনন করলে যদি কারো রোমাঞ্চ হয় আর প্রেমাশ্রু বর্ষণ হয়, বুঝতে হবে তার কর্ম ত্যাগ হয়ে এসেছে। মানে, ঈশ্বরের খুব নিকটে গেছে। যেমন অরুণোদয় হলে সূর্যোদয়ের আর বেশী বাকি থাকে না, তেমনি ঈশ্বরের নামে দেহে এই সব সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে, শীঘ্রই তিনি দর্শন দিবেন। ঋষিরা দ্বাপর যুগে বলির যজ্ঞে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, শরীর এইরূপ মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হচ্ছে কেন? তবে কি যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং এসেছেন? যজ্ঞেশ্বর এসেছেন মানে ভগবানের খুব সান্নিধ্যে আসা গেছে বুঝতে হবে। ভগবান বামনরূপে যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সকলে জানতেন না একথা। ঋষিগণ রোমাঞ্চদ্বারা অনুমান করেছিলেন, ভগবান অতি নিকটে।

শাস্ত্রে আছে, গর্ভধারিণীর নিকট মন্ত্র নেবার ব্যবস্থা। আপনি খুব সৌভাগ্যবান। মায়ের নিকট এমন সব উপদেশ পেয়েছেন। এখন

বিশ্বাস করে কাজে লাগা।

মল্লিক মহাশয় — বিশ্বাসে কি না হয়! শুনেছি, কাশীতে মণি-কর্ণিকায় মা অন্নপূর্ণা বেশ্যারূপ ধারণ করে, মৃত পুত্রের সৎকারের জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করছেন। একটি condition (সর্ত) যে নিষ্পাপ কেবল সে-ই মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারবে। কেউ আর অগ্রসর হচ্ছে না। মদ্যপায়ী এক মাতাল নিত্য গঙ্গাস্নান করতো। আজও গঙ্গাস্নান করে এসেছে। মৃতদেহ দেখে সৎকার করতে অগ্রসর হল। দেবী বললেন, 'তুমি মদ্যপায়ী, মুখ থেকে মদিরার দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। দেহ স্পর্শ করো না।' সে বললে, 'কি বলছো মা, আমি সদ্য গঙ্গাস্নান করে এসেছি। সমস্ত পাপ দূর হয়ে গেছে — আমি পবিত্র।'

শ্রীম — ঠাকুরও একটি গল্প বলতেন। কৃষ্ণকিশোর বলে একজন ভক্ত ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। খুব নিষ্ঠাবান আর কুলীন ব্রাহ্মণ। শ্রীবৃন্দাবনে গেছেন। একদিন খুব জলতৃষ্ণা পেয়েছে। লোক পাতকুয়ো থেকে জল তুলছে। তিনি জল চাইলেন। একজন বললে, 'পণ্ডিতজী, জল কি ক'রে দি, আমরা মুচি।' কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'তাহলে এক কাজ কর, তুমি 'শিব শিব' বল।' তখন সেই লোকটি শিবনাম করছে আর জল দিচ্ছে, আর উনি পান করছেন। এমন বিশ্বাস। বিশ্বাস থাকলে তো অনেকটা হয়ে গেল।

আর একটি আছে। এঁড়েদহর ঘাটে একজন সাধু এসেছেন। সকলে দর্শন করতে যাচ্ছে। ঠাকুরের বড় ভাই হলধারী জ্ঞানচর্চা করতেন। বললেন, 'একটা হাড় মাসের খাঁচা। কি দেখতে যাচ্ছে লোক সব?' ঠাকুর বলেছিলেন, শুনে কৃষ্ণকিশোরের কি রাগ। বললে, 'কি! যে শরীর দিয়ে ভগবানের পূজা হচ্ছে, যে তাঁর জন্য স্বর্বস্ব ত্যাগ করেছে, তাঁর শরীরটা হাড় মাসের খাঁচা! ভক্তের শরীর চিন্ময়।' কি রাগ, হলধারীর সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কালী বাড়িতে ফুল তুলতে আসতেন, কিন্তু হলধারীর দিকে ফিরেও চাইতেন না। এমন নিষ্ঠা, এমন বিশ্বাস।

'আমি পাপী', 'আমি অধম', বৈষ্ণবদেব এ ভাব ঠাকুর পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, যদি তাই বলবে তা'হলে নাম মাহাত্ম্যের

কি হবে? তুলোর পাহাড়ে একটু আগুন পড়লে সবটা জ্বলে যায়। তেমনি নাম। একবার নাম করলে সব পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকেও ব্রাহ্ম সমাজে একদিন এই কথাই বলেছিলেন, "তোমরা অত 'আমি পাপী, আমি পাপী' কর কেন? বরং বল — কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ!"

মল্লিক মহাশয় — খ্রীস্টানদের চার্চে যে prayer (প্রার্থনা) পাঠ হয়, তাতে কিন্তু পাপ-টাপের কথা নাই।

শ্রীম — Our Father which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy Kindgodm come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. (St. Matthew 6:9-13)

হাঁ, এতে ওসব নেই। পরমহংসদেবও আমাদের একটি Lord's prayer (ভগবদ্বন্দনা) শিখিয়েছিলেন। 'আমি দেহসুখ চাই না মা, লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, শতসিদ্ধি চাই না মা। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর এই করো যেন তোমার ভুবমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' লোকমান্য যার এইটুকুর জন্য মুখের লাল পড়ে। অষ্টসিদ্ধি — হেঁটে নদী পার হওয়া, রোগ সারান এইসব। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে, 'এ দিয়ে সংসারে বড় হতে পার; কিন্তু ঈশ্বরলাভ হবে না।' অর্জুন তাই সিদ্ধাই নিলেন না। ঠাকুর আরো বলেছিলেন, 'মা আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি দেহ তুমি দেহী, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি।

মা, শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত।'

মল্লিক মহাশয় — আচ্ছা কৃপা না হলে কি হয়?

শ্রীম — কৃপা কি আর এমনি হয়? একটা সূত্র চাই — ধ্যান, জপ, তপস্যা। তাঁর নাম জপ করলেও কৃপা হয়। খ্রীস্টিয়ান ভক্তগণ জপ করে 'পেটার নষ্টার' (আমাদের পিতা), 'মেরিয়া' (দেবী মেরী) এই সব নাম রোজারীতে (মালাতে)।

মল্লিক মহাশয় — আচ্ছা, সব লোক যদি ঐরূপ প্রার্থনা করে তাহলে সংসার থাকে কি করে?

শ্রীম — না, তা কেন হবে! সকলের জন্য তো নয়। একটা স্কুলে ফারষ্ট-সেকেণ্ড-থার্ড নানা ক্লাস আছে। সকলেই কি আর ফারষ্ট ক্লাসে পড়ছে? যারা ঈশ্বরকে চায় তাদের থাক্ই আলাদা। ঠাকুর বলতেন, মানুষের তিনটি থাক্ আছে। যোগী, যেমন মৌমাছি ফুল বই বসবে না — যেমন নারদ, শুকদেব। যোগ ও ভোগ — সেও একটি, যেমন পাণ্ডবগণ। এদিকে দেবকন্যা, নাগকন্যাও নেবে, আবার ভগবানও সঙ্গে সঙ্গে। আর একটি কেবল ভোগ নিয়ে আছে।

মল্লিক মহাশয় — সকলকেই একদিন ফারষ্ট ক্লাসে যেতে হবে।

শ্রীম — হাঁ, গীতায় আছে, 'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্' এক জন্মে নাও হতে পারে। তা'বলে সাধনভজন ছাড়বে কেন? খানদানী চাষার মত চেষ্টা করতে থাকবে, হউক বা না হউক।

মল্লিক মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২

যোগেন ডাক্তারের নিকট মৃদু কণ্ঠে নিজের দুঃখের কথা বলিতেছেন। ডাক্তার শ্রীমকে জানাইতে উপদেশ দিলেন।

যোগেন (বিনীতভাবে — শ্রীম-র প্রতি) — আজ্ঞে, আমার উপর একটু কৃপা করুন। স্ত্রীলোক-দর্শনে এখনও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বাইরে অশ্রুজল বিসর্জন করি বটে, কিন্তু অন্তর শুষ্ক। ঠাকুরের

জন্য কান্না আসে না। আপনার কৃপায় দক্ষিণেশ্বরে থাকা খাওয়ার সুবিধা হয়েছে। আর একটু কৃপা হলেই হয়।

শ্রীম (ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর উচ্চহাস্যে) — তাই তো ঠাকুর বলতেন, রোগ লেগেই আছে। যদি তাই হয় তাহলে তাঁর প্রেস্‌ক্রিপসান্ (ব্যবস্থা) নিতে হবে। তিনি বলেছেন সর্বদা সাধুসঙ্গ করতে। তা আমাদের করা উচিত। আর যাঁদের আন্তরিক কান্না আসে তাঁদের কাছে বসতে হয়। তবে নিজেরও কান্না আসবে। আন্তরিক কি করলুম আমরা তাঁর জন্য? কোথাও কিছু নাই, এমনি কি আর হয়? হাজার বই-ই পড় আর ওকালতীই পাস কর। কিছুতেই কিছু হবে না। ভাল উকীল হতে হলে, বড় উকীলের নিকট articled (শিক্ষানবীশ) হতে হবে। উকীলের সেবা করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, যেমন উকীল দেখলে জজ-আদালতের কথা মনে পড়ে, তেমনি সাধু দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, নির্জন বাস এ সব করতে হয়। কিছুই করলে না, ধরলে না, ছুঁলে না — আর ফস্ করে হয়ে যাবে? তা হচ্ছে না। (পঞ্চবটীতে শ্রীম-র সাধুসেবার গল্পটি বলিলেন। মিহিজাম প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।)*

---

* একদিন কতকগুলি সাধু এসেছেন। আমাকে আটা, ঘি এসবের ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। আর বললেন, সাধুসেবা করা ভাল — কি বল? তারপর একটি গল্প বললেন, — একজন সাধু স্নান করছিল তখন জলে তার কৌপীন ভেসে যায়। দ্রৌপদী দেখে, নিজের কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে সাধুকে দেন। কৌরবসভাতে বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদী কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছেন, প্রভো, লজ্জা নিবারণ কর। ভগবান দর্শন দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোনও সাধুকে কখনও বস্ত্রদান করেছ কি? দ্রৌপদী তখন ঐ ঘটনাটি বললেন। ভগবান ভরসা দিয়ে বললেন, তবে আর ভয় নাই। বস্ত্র যত টানছে ততই বেড়ে যাচ্ছে তাঁর মায়ায়!

গল্পটি বলেই আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বল তো কি বললুম?' তার অর্থ একেবারে impress (অঙ্কিত) করে দিচ্ছেন মনে। আমার দ্বারা আবার বলিয়ে নিলেন।

আটা, ঘি সব এলে সাধুরাই রান্না করলেন। তাঁরা খেলেন, ঠাকুরও তাঁদের সঙ্গে বসে খেলেন। আমার জন্যও কিছু রেখে দিলেন।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — এই তো রোগ। সব করা যাচ্ছে, কিন্তু সাধুকে কিছু দেবার বেলায় যত হিসাব। অনেক খতিয়ে তবে কিছু বের হবে। আর স্ত্রী-পুত্র-জামাতার জন্য দু'হাতে লোক টাকা ঢালছে। যত লাগে নাও, তাতে 'না' নাই। এইবার মিহিজামে একটি পাচক ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ হলো। খুব প্রাচীন লোক — অনেক বড় লোকের বাড়িতে কাজ করেছে। এক বিলেত ফেরতের বাড়ির কথায় বললে, ছেলে-মেয়েদের জনে জনের এক একটা মোটর কার। এক এক জনের half-a-dozen (আধ ডজন) করে ঝি চাকর। আর রান্না হচ্ছে নানা স্থানে। একখানে বাঙ্গালী রান্না সুক্তটুক্ত। আর একখানে পোলাও কালিয়া। আর একখানে বিলাতী খানা তৈরী হচ্ছে। আবার 'প্রিজারব্‌ড মিট' (টিনে রাখা বিলিতী মাংস)। তাই এক এক slice (টুকরা) করে সকলে নিচ্ছে। মেয়েগুলি শুদ্ধ ঐ সব খাচ্ছে। বাজার হচ্ছে নিজের নিজের ফ্যান্‌সি মত। কাপড়ের স্তূপ — যার যা পছন্দ নিজে নিজে কিনে আনছে। এই করে হাজার হাজার টাকা খরচ করছে। কিন্তু দেব-সেবার, সাধুভক্তের সেবার নামটিও নাই। শুনলুম, শোকের সময় আমাদেরই মত আছাড়-পিছুড় খেয়ে পড়ে। তখন বিবিয়ানা থাকে না। অনেক মেমদের কথা শুনেছি, তারাও শোকে গড়াগড়ি যায়। একেই ঠাকুর বলতেন অবিদ্যার সংসার। সাধুভক্ত দরিদ্রের সেবা নাই। শুধু কুটুম্বসেবা হচ্ছে। ছি! একে স্নেহ ভালবাসা বলা চলে না। যে ভালবাসায় ভগবানের পথে নিয়ে যায় তাকে বলি ভালবাসা। এ কি? রোজগার করছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, আর পেটে লাগাচ্ছে সব। এ কি রকম জীবনধারণ? পশুরাও তাই করছে। প্রভেদ কোথায়?

৩

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভক্ত-বাড়িতে রোজ ঈশ্বরীয় কথা হয়। কর্তা নিজে না পারলে পণ্ডিত রেখে পাঠ করায় — রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এই সব। সর্বদাই তাঁর নাম হচ্ছে। উৎসবাদি — যেমন দুর্গাপূজা — টাকা থাকলে

করা উচিত। আর সাধু-ভক্ত-দরিদ্রের সেবা। কর্তাদের এ সবের জন্য চেষ্টা করা উচিত। পরিবারের লোকেরা যে অন্যরূপ হয়ে যাচ্ছে তার জন্য দায়ী কর্তা নিজে। তিনিই প্রশ্রয় দিয়েছেন। এখন ভালর জন্য চেষ্টা তাঁকেই করতে হবে। চেষ্টা করেও যদি পরিবারবর্গের মন ঈশ্বরমুখী না করতে পারে, তা হলে দূরে সরে দাঁড়ান। কি আর করা? ছিনা জোঁকের মত লেগে থাকতে হবে সারা জীবন? — দায় পড়েছে! যদুবংশ ধ্বংস হচ্ছে আর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন — স্থাণুবৎ। প্রকৃতি রোধ করে কে? — Irresistible.

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — সিঁথিতে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠাকুরকে — ছেলেপুলেদের ভরণপোষণ করা উচিত কতদিন? তিনি উত্তর করলেন, যতদিন না লায়েক হয়; আর মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত। তারপর করে খাক্। গুণাতীত পুরুষ ঠাকুর। জীবের দুঃখে কাতর হয়ে তাদের কল্যাণ চিন্তা করছেন। সর্বদা ভাবছেন, কিসে অবসর হয় আর তাঁকে ডাকতে পারে। এ সব তাঁর dictum (মহাবাক্য)। আমাদের কথা নয়। আমরা কি বুঝি, কি বলবো? চেষ্টা করে দেখা, বিদ্যার সংসার করতে না পারলে কি আর করা? provision (ডালভাতের ব্যবস্থা) করে দূরে সরে পড়া। আর ঈশ্বরচিন্তা করা।

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি) — সাধুসঙ্গ করলে কামটাম আপনি দমন হয়ে যায়। কি সুবিধেই করে দিয়েছেন ঠাকুর — সর্বত্যাগী সাধু আবার যাবার জন্য স্টীমার। বেলুড় মঠে তাঁর সাধুরা থাকেন। কোথায় পাবেন এমনটি। শুধু সাধুসঙ্গ করতে বলেন নাই — সাধু করে দিয়েছেন, খুব ভাল ভাল সাধু সব। নিত্য সাধুসঙ্গ দরকার। কিন্তু সাবধান, আশ্রম পীড়া না হয়। সেখানে তপস্যার ভাবে যেতে হয়। সেবা করতে, নিতে নয়। বকলেও কথা বলতে নেই, জোড়হাত করে থাকতে হয়। কতবড় আশ্রম, সন্ন্যাস আশ্রম কিনা! ভোগ ডিপার্টমেন্টে থাকলে এ সব সইতে হয়।

শুকলাল — বকলেও কথা বলতে নেই? মনে কষ্ট তো হয়।

শ্রীম — তা হোক। এ সহ্য করতে হবে। আমরা ভোগ নিয়ে

রয়েছি বলে। ওদের বিচার কি আমরা করতে পারি? যাঁর জন্য সব ছেড়েছেন তিনি করবেন। আশ্রম কত বড়! চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গেরুয়া দেখে সাষ্টাঙ্গ করেছিলেন। আর এখানে জীবন্ত সাধু সব। মঠটি থাকায় কত সুবিধে হচ্ছে। নিত্য সংবাদ পাচ্ছি। কেউ ধ্যান করছেন। কেউ লাইব্রেরীতে deep study (গভীর পাঠ) করছেন। কেউ বা ভাঁড়ার দিচ্ছেন, কুটনো কুটছেন, কিম্বা পূজা করছেন। সবই ঠাকুরের কাজ। কত ভাল সব লোক! বি-এ, এম-এ কত আছেন!

গীতায় আছে, স্থিতপ্রজ্ঞের চালচলন সব পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তবে তো নিজেরাও ঐরূপ হতে চেষ্টা করবে। ওঁরা আদর্শ কিনা। জানা থাকলে compare করা (মিলান) যায়। নিচে আছি — এ বোধ থাকলে তো উপরে উঠবার ইচ্ছা হবে। বুড়ো হয়েছি যেতে পারি না। এখানে বসে বসে সংবাদ পাচ্ছি। তাঁরা কি করছেন আর আমরা কি করছি রোজ মিলিয়ে দেখা দরকার। তবে চৈতন্য হবে। যাঁরা শিক্ষিত, well informed (সুপণ্ডিত), মাত্র দু'বছর মঠে রয়েছেন, তাঁরা ফস করে উপরে উঠে যাচ্ছেন। ওঁদের দেখে খুব আনন্দ হয়। তা আর উঠবে না? একদিকে ব্রহ্মচর্য, অপর দিকে যোল আনা মন দিয়ে তাঁকে ডাকার চেষ্টা করছেন। আর প্রচুর অবসর।

আর সংসারীরা কি করছে? নানা কাজে জড়িত। তাঁকে ডাকার সময় নাই। যদিও একটু বসলো, অমনি নিদ্রা — শরীর অবসন্ন। সোনা গালাতে বসেছে — হবো হবো হচ্ছে। অমনি বাড়ি থেকে হুকুম এলো, ঘরে চা'ল নাই। উঠে চা'ল আনতে গেল। আবার বসেছে, সংবাদ এলো মেয়ের অসুখ। চললো ডাক্তার আনতে। সোনা আর গালান হলো না। আগুন নিভে গেল। সোনা গালিয়ে সংসার করলে তখন অত দুঃখকষ্ট বোধ হয় না। সোনা গালান মানে, জ্ঞানভক্তি লাভ করা। সাধুদের সেই চেষ্টা চব্বিশ ঘন্টা।

শ্রীম (গৃহী ভক্তের প্রতি) — ঠাকুর কখনও বলতেন, 'বিয়ে হয়েছে হোক! দু'পাঁচ সের বীর্য বরং বের হয়ে যাওয়া ভাল। তবুও

যেন ছেলেপুলে না হয়।’ ছেলেপুলে হলে অবসর কোথায়? ছেলের upbringing (পালন) education (শিক্ষা), রোগ, মেয়ের বিয়ে, আবার মেয়ের শ্বশুর বাড়ির কথা ভাবতে হয়। প্রহ্লাদ দৈত্য-বালকদের বলেছিলেন, ‘ওরে বিয়ে করিস না।’ তা হলে অবসর পাবি না। মহেন্দ্র মুখুজ্যে একজন ছিলেন। অনেক কাজ তাঁর। ঠাকুরের কাছে প্রায়ই যেতেন। বলতেন, ‘এইবার মনে করেছি ছেলেদের উপর সব ছেড়ে দিয়ে অবসর নিব।’ দু’টি ছেলে সঙ্গে করে আনতেন। ঠাকুর শুনে বলতেন, ‘হাঁ, তা আর হয়ে উঠছে কই?’ একটা না একটাতে জড়িত হয়ে পড়ে লোক। ভাবে, এ কাজটা একটু পাকা করে যাই। এই ভাবে দিন চলে যায়। কাপ্তেনও ঐ কথা বলেছিল, কিন্তু হয় নি। কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। তা হলে কর্তব্য-অকর্তব্য বোধ হয়। আগে সংসার পরে ঈশ্বর নয়। আগে ঈশ্বর পরে সংসার।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে একটি ভক্ত গাহিতেছেন, ‘মা, আমার বড় ভয় হয়েছে।’ এইবার ভাগবত পাঠ হইতেছে। তপস্যা-নিরত শুকদেব দৈববাণী শুনিতেছেন, — ‘আমি সব হয়ে রয়েছি’।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এটি একটি মহামন্ত্র। যদি কেউ এটি নিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সিদ্ধ হয়ে যায়। ঠাকুরও রোজ সন্ধ্যার পর একটি মন্ত্র বলতেন, ‘ব্রহ্মমায়াজীবজগৎ’। এটি জপ করলেও সিদ্ধ হওয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হয়। বলতেন, ‘এ সব খুব গুহ্য মন্ত্র।’ মানে, বইতে আছে পড়ুক। কিন্তু বলতে গেলে ভক্তদের শুধু বলা যায়। আর কাউকে না।

‘ব্রহ্মমায়াজীবজগৎ’ বহুবার শ্রুত এই মহাবাণী আজ যেন জীবন্ত নবীনরূপ ধারণ করিল।

কলিকাতা, ৩০শে মে ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল।
বুধবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কেশব সেন চিনেছিলেন ঠাকুরকে

১

সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীম দ্বিতলের গৃহে বসিয়া আছেন। সুখেন্দু ভক্তসঙ্গে গাহিতেছেন, 'এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।' এবার শ্রীম নিজে গাহিতেছেন ঃ

গান। নামেরি ভরসা কেবল, শ্যামা মাগো তোমার।

গান। শ্যামাধন কি সবাই পায়, কালীধন কি সবাই পায়।

গান। মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।

গান। সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

ভজন শেষ হইল। শ্রীম ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন কেশব সেনের হাত ধরে এই গানটি গেয়েছিলেন, — 'মজলো আমার মন-ভ্রমরা'। আর একদিন এইটিন এইট্টি টু-র (1882) অক্টোবর, ঠাকুর কেশব সেনের বাড়ি গেছেন। উনি কাপড় পরে বের হচ্ছিলেন দীন মল্লিকের বাড়িতে যাবেন বলে। আর যাওয়া হলো না। উপরে হল ঘরে 'লিলি কটেজে' কি নৃত্য! একচল্লিশ বছর হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন এই মাত্র হলো। চোখের উপর জ্বল্ জ্বল্ করে ভাসছে। কেশববাবুর আর যাওয়া হলো না। মানে তাঁকে দর্শন করলে সব কর্ম কমে যায় — 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' (মুন্ডক উপঃ ২:২:৮)। চাদর কাঁধে মত্ত হয়ে গান শুনছেন কেশববাবু। আর একদিন গেয়েছিলেন —

কথা বল্‌তে ডরাই; না বললেও ডরাই।
মনে সন্দ হয়; পাছে তোমাধনে হারাই হারাই।।

আমরা জানি যে মন্-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর,
এখন মন তোর; যে মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই।।’

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত — ৫ম ভাগ, ১ম খন্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)

কেশববাবুকে লক্ষ্য করে গেয়েছিলেন এটি। আহা, কেশব সেনই বুঝেছিলেন তাঁকে। তা নইলে কি মুখ দিয়ে এমন গান বের হয়? ‘দিলাম তোরে সেই মন্তোর’, মানে ‘ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য’,তাঁর এই মহাবাক্য। কেশববাবুর শিষ্যরা সব unsympathetic ছিল, তাই ‘কথা বলতে ডরাই’। এক কেশব সেনই ঠাকুরকে বুঝেছিলেন।

ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, “একদিন একজনের বাড়ি গেছি। সে আমায় ঠাকুরঘরে যাবার জন্য বললে। বললে, ‘ঐ ঘরে ঈশ্বরের পূজা হয়। একবার এসে স্থানটি পবিত্র করে দিন।’ ঘরে যেই ঢুকলুম অমনি কবাট বন্ধ করে দিল। আর ফুল-চন্দন দিয়ে আমার পা পূজা করতে লাগলো। আবার বলছে, ‘আপনি কাউকে এ কথা বলবেন না।’ কেন নিষেধ করলো? গুরুগিরি আছে কি না! শিষ্যরা পাছে গোল বাঁধায়।”

একটি ভক্ত আজ মিহিজাম যাইতেছেন। ইচ্ছা, কিছুদিন নির্জনে থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তা করেন। শ্রীম বারান্দায় আসিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গৃহমধ্যে ভক্তগণ কেহ কেহ বলাবলি করিতেছেন —

‘ইনি তপস্যা করতে যাচ্ছেন।’ এই কথা শুনিয়া শ্রীম বলিতেছেন — এ সব কথা বলতে নেই, তপস্যা করতে যাচ্ছেন, কি কোথায়। যারা real friend (প্রকৃত বন্ধু) তারা এ সব কথা মুখেও আনবে না — কে কি করছে ভগবানের জন্য। ঈশ্বর অতি গোপনের ধন। একদিন একজন বলেছিলেন, ‘অমুক খুব ধ্যান-ভজন, তপস্যা করছে।’ শুনে, ঠাকুর অমনি ধমক্ দিলেন আর বললেন, ‘ছি ছি, ওসব কথা কইতে নাই। ঈশ্বর অতি গোপনের ধন।’ তাঁর ব্যবস্থা — নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ডাক। নিজে এই পথ দিয়ে গিছলেন কি না? আহা, একদিনও যদি নির্জনে গিয়ে ষোল আনা মন দিয়ে ডাকা যায়! এতে খেদ মেটে। ঋষিরা সারা জীবন করেছিলেন। একদিন করলেও হয় ঠাকুর বলেছিলেন। কত সোজা করেছেন। উঃ, কত

নেমেছেন। ঠাকুরের ইচ্ছা কি সুন্দর! একটি কুটীর করে দিয়েছেন মিহিজামে — উপরে খড়ের ছাউনি। অতি নির্জন স্থান। ওখানে পশুপক্ষীদের ভিতর তাঁর হাত (রক্ষার অভিনয় করিয়া) দেখা যায়। কি মাতৃস্নেহ! আর দূরই বা কি? Safe distance from botheration (বেশ ঝামেলার বাইরে)।

এই তপস্যা কেন? তাঁকে দর্শনের জন্য এই আয়োজন। অত কষ্ট করে এই মানব জন্ম লাভ হয়েছে। কখন যে এ দেহ শেষ হয়ে যায় তার তো ঠিক নাই। আজ আছে কাল নাই। তাই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে তাঁকে যত ডাকা যায় ততই ভাল। অধর সেনকে বলেছিলেন এ কথা! সেইজন্য দেখা যায় এক-আধ জন ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকছে — দেহ যায় যাক্ গ্রাহ্য নাই। Death (মৃত্যু) বলে একটি জিনিস না থাকলে অবশ্য এরূপ না হলেও চলতো। But it is a stubborn reality (রূঢ় সত্য)। মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই উঠে পড়ে লাগে কেউ কেউ। ঠাকুর সর্বদা ভক্ত-পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন। কেউ জপ করবে, কেউ ধ্যান করবে, কেউ গান করবে।

বীরেন গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইনি এটর্নি। নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, বিলেতে আজকাল 'স্পিরিট'-এর সঙ্গে কথা কয়। ভূপেন বোসের মৃত পুত্রের সংবাদ জানতে পেরেছে।

শ্রীম — হাঁ। কিন্তু ঠাকুর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইতেন। একদিন বলছেন, 'মা এসেছেন।' তারপর কথা কইতে লাগলেন। বলছেন, 'আচ্ছা মা, কার কথা শুনবো? এ বলে এই, ও বলে ঐ'। মা হয়তো কিছু বললেন তাই আবার বলছেন, 'ও বুঝেছি। তোমার কথাই শুনবো, আর কারো নয়।' আর একদিন বলছেন, 'আচ্ছা মা, একজনের যদি ক্ষিদে পায়, আর সে মুখে না বলে, তাহলে কি আর তার ক্ষিদে পায় নি?' আর একদিন বললেন, 'মা বলেছেন একে নিয়েছেন।' আর একদিন বললেন, 'তাকে এক কলা মাত্র দিলে। আচ্ছা, এতেই তোমার কাজ হয়ে যাবে।' প্রথম প্রথম বলতেন, 'এ কামিনীকাঞ্চনের ভিতরে থেকে আমার দেহ জ্বলে যাচ্ছে। আর সহ্য হয় না মা।' মা

বললেন, 'কিছুকাল অপেক্ষা কর, শুদ্ধসত্ত্ব সব ভক্ত আসবে।' কুড়ি-বাইশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আরতির সময় কুঠীতে উঠে ডাকতেন, 'কে কোথায় আছিস্ তোরা আয় সব। আমার শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।' সারা রাত পঞ্চবটীতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন, 'মা দেখা দাও, মা দেখা দাও।' কি ব্যাকুল! তারপর দেখা দিয়ে কথা কইলেন। (বীরেনের প্রতি) স্পিরিটের সঙ্গে তো কথা হলো। ঠাকুর যে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইতেন সর্বদা। তার কি করলুম আমরা? ঈশ্বরই ঠাকুর হয়ে এসেছেন — অবতার হয়ে। আবার জগন্মাতারূপে তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন। আমরা যেমন এখন কথা কইছি। একদিন না, সারা জীবন। ঈশ্বর—ঠাকুর—জগন্মাতা, একের তিনরূপ।

৩১শে মে, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। দোতলার ঘরে শ্রীম ভক্তসঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনিতেছেন — শুকদেবের বৈরাগ্য প্রকরণ। ডাক্তার বক্সী পড়িতেছেন।

পাঠক (পড়িলেন) — শুকদেব পিতা বেদব্যাসকে পুত্রস্নেহে শোকসংবিদ্ধ, কম্পমান এবং অশ্রু বিসর্জন করিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পিতাকে বিনয়পূর্বক কহিলেন, 'আহা, মায়ার কি বিচিত্র প্রভাব! বেদান্তরচয়িতা, পুরাণসমূহের বক্তা, মহাভারত-নির্মাতা, বেদবিভাগকর্তা, সর্বজ্ঞ, বিষ্ণুর অংশসম্ভব ব্যাসদেবও মায়ায় মোহিত হইয়া ভগ্নপোত-বণিকের ন্যায় বিবশ হইয়া প্রাকৃতজনবৎ বিলাপ করিতেছেন, হে দেবি মহামায়ে, তোমায় নমস্কার। আমি তোমার শরণাগত।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন মায়ার বিচিত্র শক্তি! তার সঙ্গে চালাকী চলে না। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পর্যন্ত মায়ায় মোহিত। পুত্রশোকে বেদব্যাস বিবশ — সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে বলে। শরীর ধারণ করলে এ হয়। তাই ঠাকুর বলতেন, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' আর প্রার্থনা করতেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ

করো না।’ পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (জনৈকের প্রতি) — ‘সর্বং খল্বিদমেবাহং’ এই একটি মন্ত্র। জপ করলে কাজ হয়ে যায়। ব্রহ্মশক্তি বটপত্রশায়ী বিষ্ণুকে এই কথা বলেছিলেন। এটি বেদের সার। ‘ব্রহ্মশক্তি শক্তিব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্মমায়াজীবজগৎ’ সব ঠাকুরের মহামন্ত্র।

পরব্রহ্ম লীলায় সগুণ হন। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, জগৎলীলা ও নরলীলা।

পাঠক (পড়িতেছেন), শুকদেব বলিতেছেন — হে পিতঃ, পূর্বজন্মে আপনি কি ছিলেন, আমি কি ছিলাম তার স্থিরতা নাই। অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মুক্তির চেষ্টাই জীবের একমাত্র কর্তব্য। ‘আমি বদ্ধ’ চেষ্টা করিয়াও চিত্ত হইতে এই ভাব বিদূরিত করিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া উহার উপায় বলুন।

শ্রীম — মায়া, মোহ, অজ্ঞান — বস্তু একটি, কিন্তু রূপ ধারণ করে বহু। কখন পুত্রকন্যা, কখন জায়া, কখন পিতামাতা। ধনদৌলত, নামযশ, দেহ, ইন্দ্রিয়, হিংসাদ্বেষ — নানা রূপ তাঁর। এ সব অবিদ্যা মায়া। বিদ্যা মায়াতে ঈশ্বরে মন থাকে। ঈশ্বরই কেবল আপনার জন, গৃহ পরিজন সংসার কেউ নয়, অতএব ‘আমি মুক্ত’ এই চিন্তাদ্বারা, ‘আমি বদ্ধ’ এই ভাব বিদূরিত হয়। এটি বিদ্যা-মায়ার কাজ।

ঠাকুর তাই সাংসারিক কিছু চাইতে পারতেন না। বলতেন, তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও। কেন? অন্য জিনিস চাইলে মন তাতেই থাকবে। পাদপদ্ম ভুল হয়ে যাবে তাই। বলতেন, ‘মা, ধনদৌলত লোকের এত প্রিয় — তাদের তাই দাও। কিন্তু কি অজ্ঞান, তুমি যে পরম ধন এ কথা ভুলে গেছে।’ এত সব লোক যেতো, কখনও কাউকে পয়সা-কড়ির জন্য অনুরোধ করেন নি। কত কষ্ট, বাড়ির লোক খেতে পাচ্ছে না তবুও না। অনেকসময় সাধলেও বিরক্ত হতেন। (সহাস্যে) বলতেন, এখানে ‘পেলা’ নাই। টাকা-কড়ির কথা বললে আর লোক আসবে না। একজন পাঁচ শ টাকা মাইনে পেতো। হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। ইনি ভেবেছিলেন

ঠাকুর congratulate (প্রশংসা) করবেন। কিন্তু উল্টো হলো — বিরক্ত হলেন। Congratulate করতেন কাকে? যে গরীব তাকে। গরীব ভক্তরা দু'পয়সার বরফ, কি এক পয়সার এলাচ নিয়ে যেতেন। কি আনন্দ হতো! তাঁর মায়ায় সব ভুলিয়ে দেন। ব্যাসদেবকেও পুত্রস্নেহে ভুলিয়েছিলেন। সাধারণ লোকের কথা কি? তাই প্রার্থনা করতেন, 'ভুলিও না, মা, ভুলিও না।'

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য উপঃ ৩:১৪:১)— ঈশ্বরই এই সব হয়ে রয়েছেন। বেদের কথা। 'এই সব' মানে, বস্তু — জগৎ। নানা ছেড়ে ঈশ্বরে মন দেওয়া। আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। মায়া সেটা উল্টিয়ে ধরে — আগে জগৎ পরে ঈশ্বর। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'Before Abraham was I am' (St. John 8:58) — আমি সেই পুরাতন মানুষ। এটিও একটি মন্ত্র। কেউ চিন্তা করলে মুক্ত হয়ে যাবে।

১লা জুন, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

আজ শনিবার। এই দিনে বহু ভক্ত আসিয়া থাকেন। গৃহ পরিপূর্ণ। অনেক দিন পর শচী ও দুর্গাপদ আসিয়াছেন। আর ললিত আসিয়াছেন। ইনি হৃদয় মুখুয্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীম তাহাকে খুব যত্ন করিয়া কাছে বসাইলেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শ্রীম-র ইচ্ছায় ডাক্তার ভক্তসঙ্গে একটি 'আগমনী' গাহিতেছেন। গান —

এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বলুক লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।।

তারপর ললিত একটি রামকৃষ্ণ-স্তব আবৃত্তি করিলেন। ললিতের পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এঁদের বাড়িতে সিওড়ে ঠাকুর থাকতেন। কখনও এক মাস, কখনও দু'তিন মাস। এঁরা এমন উত্তম বংশ। এঁদের বাড়িতেই হৃদয় মুখুয্যেকে বলেছিলেন, কুটুম্বদের

খাওয়াচ্ছিস, তা হলে চল্লুম।

ললিত তাঁহাদের বাড়িতে প্রচলিত ঠাকুরের লীলা-কথা কহিতে লাগিলেন। কথায় কথায় বলিলেন, আজকাল আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে না। বড়লোকের আদর। সাধুরা বড় চালে থাকে, মোটর চড়ে, আমাদের পোছেও না। একটু প্রতিবাদ করায় একজন রেগে মারে আর কি!

শ্রীম (সহাস্যে ললিতের প্রতি) — সাধুর মার খাওয়া তো ভাগ্যের কথা। চৈতন্যদেব কখনও মারতেন। ভক্তরা বলতেন, 'প্রহার-প্রসাদ'। (গম্ভীর ভাবে) মোটর চড়ার কথা যা বলছো, এ যেন ত্রৈলঙ্গস্বামীকে পোষাক পরান। পোষাকই পরাও আর ল্যাংটাই থাকুন তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামী। সাধুরা কত কষ্ট করে বাইরে তা তো তোমরা দেখছ না। খালি মোটর চড়া দেখছ। কত অনাহার, অর্ধাহার করেন। কখনও পাথরের উপর শুয়ে আছেন, কখনও ঘাসের উপর, কখনও হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বনে বাস করছেন। তপস্যার কষ্ট লোকে দেখে না — দেখে শুধু বাইরের একটু আরাম। মঠে এসে থাকা এ যেন 'রেস্ট হাউসে' বাস। পাখী যেমন ক্লান্ত হয়ে ডালে বসে, এ তেমনি। যে নামযশের জন্য সংসারীদের mouth watered (চিত্ত লালায়িত) হয়, যে সুখভোগ, ধন-ঐশ্বর্য নিয়ে এরা ব্যস্ত, সাধুরা এ সব কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করেছেন। সংসারের এ সব কিছুই চান না এঁরা। কি না ছিলো এঁদের। বিদ্যাবুদ্ধিতেও এঁরা অনেকেই অতি উচ্চ স্তরের লোক। কি না করতে পারতেন ঘরে থাকলে? এঁরা এ সবই ত্যাগ করেছেন! আর আমরা তা নিয়ে ভুলে আছি। সাধুরা তিরস্কার করলে, এমন কি প্রহার করলেও হাত জোড় করে homage (সম্মান) দিতে হয়। আমরা তাঁদের বিচার করতে পারি? আশ্রম কত বড়! তাঁরা বুঝেছেন, আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। তাই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল সব ছেড়ে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — নাই বা বললেন, 'আসুন মশায়, বসুন মশায়।' আমরা যে তাঁদের দর্শন করতে পাচ্ছি তাই কত বড় সৌভাগ্য। আবার কথা কন। অত বড় 'আশ্রম' (সন্ন্যাস) বলে

চৈতন্যদেব গেরুয়া দেখে সাষ্টাঙ্গ করেছিলেন। পশ্চিমের সাধুরা গৃহীদের এক আসনে বসতে দেন না, পাছে ওদের কলুষভাব সঞ্চারিত হয়। মঠের সাধুরা তবুও অতটা করেন না। আর একদিনেই কি আর সব হয়? ছেলের আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন, বিয়ে সব একদিনে কি করে হয়? যেতে থাক ক্রমে এঁদের ভিতর দেখতে পাবে। বাইরে কখনও কঠিন দেখলেও ভিতরে ঢোক, দেখবে কোমল। বড় লোকের আদর, যা বলছো তা না করে কি করেন? একজন তাঁর সারা জীবনের উপার্জন তিন লাখ টাকা দেবমন্দিরে দেবে। এখন তাঁর সঙ্গে কথা কইবেন না তো কি? তারপর বসে বসে কথা কইবার অবসরও কম। কত সেবা — হাসপাতাল, ডিস্পেনসারী, স্কুল, রিলিফ, প্রচার। সাধুসঙ্গ কর, দেখতে পাবে তাঁরা কত মহৎ। হাজার বই-ই পড়, আর যাই কর, কিছুতেই কিছু হবে না — বাজনার বোল হাতে না আনলে।

যাঁরা এদিককার তত লেখাপড়া করেন নি অথচ সাধু — তাঁরাই কি আমাদের সমান? অনেক উচ্চে তাঁরা। কারণ, আদর্শ কত উচ্চ তাঁদের! যিনি ভগবান, যিনি মানুষ হয়ে এসেছেন সেই ঠাকুর তাঁদের আদর্শ। কত বড় আদর্শ! এখানকার greatness-এর (মহত্ত্বের) standard (মানদণ্ড) বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি। একজন যিনি একটা বিদ্যায় বা বিজ্ঞানে পারদর্শী, তিনিও বড়। কিন্তু তা বলে কি যিনি ঈশ্বরের জন্য সব ছেড়েছেন তাঁর মত বড়? কখনই নয়। শুধু পাণ্ডিত্যকে খড়কুটো বলতেন ঠাকুর, সমাধি থেকে নেমে এসে। বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন অধর সেনের বাড়িতে বেনেটোলায়, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি? বঙ্কিমবাবু অবজ্ঞাভরে উত্তর করলেন, আহার, বিহার, মৈথুন। অমনি ধমক দিয়া ঠাকুর বললেন, 'তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। যা নিয়ে দিনরাত রয়েছো তাই মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর দেয়।' তাই সাধুর দোষ দেখতে নাই। তাঁর আশ্রম কত বড়! সাধু সর্বদা আমাদের পূজ্য। মুড়ি-মিছরির একদর?

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, তিন থাকের

সাধু আছে। প্রথম থাক্ অজগর বৃত্তি নিয়ে পড়ে আছে। সামনে কিছু পড়লো তো খাবেন, যেমন অজগর সাপ করে থাকে। আসন থেকে নড়বেন না। সর্বদা ভগবানচিন্তা করছেন। আর এক থাক্ — এঁরা 'নারায়ণ হরি' বলে গৃহস্থের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে। কিছু খেতে দাও ভাল, নচেৎ চলে যাবে। আর এক থাক্ — কিছু না দিলে জোর করবে। সাধু আবার রজোগুণী, তমোগুণীও হয়। ঠাকুর বলতেন, পূর্বে আমার এ ধারণা ছিল না। মনে করতুম সাধু সবই সত্ত্বগুণী। এক বুড়ো সাধু আমার এ ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলেন। সাধুদের ভিতর তিনগুণীই আছে। যেমন দুর্বাসা তমোগুণী, তা বলে কি সাধু নন্ তিনি? কত বড় ঋষি — শিবাবতার। রজোগুণী লেকচার দেন, মঠ-মন্দির করেন। সত্ত্বগুণী কেবল তাঁর চিন্তায় মগ্ন — যেমন শুকদেব।

পঞ্চবটীতে একজন সাধু এসেছেন। খড়ম পায়ে ঠক্ ঠক্ করতে করতে এসে ঠাকুরের ঘরে হাজির। বলছেন, 'তামাকু-সামাকু কুছ হ্যায়?' ঠাকুর অমনি দাঁড়িয়ে পড়লেন আর জোড় হাত করে বললেন, 'হাঁ জী, হ্যায়।' সাধু চলে গেলে ভবনাথ বললেন, আপনার তো খুব সাধুভক্তি দেখছি। আর একবার একজন সাধু ঠাকুরের ঘরে এসে উপস্থিত। এসেই বলতে লাগলেন, 'মুজকো আস্‌সী রুপেয়া দেনা হোগা।' গাড়ীভাড়া আর কিসে লাগবে! ঠাকুর বললেন, 'ওমা, কোথা থেকে আসবে অত টাকা? সাধু তখন উত্তর করলেন, 'তুম্ আস্তানধারী হ্যায়। তোমারা বিস্তারা-সিস্তারা সব কুচ হ্যায়, ম্যায় তো রমতা রাম হুঁ।' কে একজন শেষে ঘর থেকে বের করে দেয়। এ সব তাঁর নিজের আচরণ। ভক্তদের সর্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করতে বলতেন। স্বেচ্ছায় না করলে জোর করে সাধুসেবা করিয়ে নিতেন। তিনি উত্তম-বৈদ্য। পঞ্চবটীতে ঠাকুরের আদেশে এক ভক্ত সাধুসেবা করেছিলেন (চতুর্দশ অধ্যায় - foot note দ্রষ্টব্য)। সাধুসঙ্গ, সাধুভক্তি religious life-এর first step (ধর্মজীবনের প্রথম সোপান)। আগে নিজের footing (অবস্থান) ঠিক করে নিতে হয়। In the scale of evolution where do I stand? (মনের ক্রমবিকাশে আমার স্থান কোথায়?) গোড়ায়ই যদি সব সমান বলো তা'হলে আর

কি উন্নতি হবে? বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

২রা জুন, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৪

আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তাই গরম অসহনীয়। শ্রীম ভক্তসঙ্গে মেঝেতে বসিয়া আছেন। এখন রাত্রি আটটা। দেবী ভাগবত পাঠ হইতেছে — জনকগৃহে শুকদেবের আগমন।

পাঠক পড়িতেছেন। শুকদেব কহিলেন, 'মহারাজ, পিতা বেদব্যাস কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।' জনক কহিলেন, "মানবগণের ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম পর পর অবলম্বনীয়। তুমি এখন গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন কর। .... শান্ত, সুমতি ও আত্মবান হইয়া বিহিত কর্ম করিবে। লাভালাভে সমভাব রক্ষা করিবে। মানুষ মনেতেই বদ্ধ আবার মনেতেই মুক্ত। 'আমি ব্রহ্ম' এই চিন্তা করিবে।"

শ্রীম — এটা সাধারণ নিয়ম। আবার বিশেষ নিয়ম আছে। ঠাকুরও বলতেন গৃহী ভক্তদের, তোমরা মনে ত্যাগ করবে। সব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে। নিত্য সৎসঙ্গ ও প্রার্থনা, আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস করতে হবে। কেন এটি বলতেন? একেবারে ত্যাগের কথা বললে ভয় পাবে। ভোগবাসনা রয়েছে। এইরূপে সংসার ক'রে কতক বাসনা ক্ষয় হলে তখন তাঁ'তে সম্পূর্ণ মন দিতে পারবে। এটা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যাদের পূর্বজন্মে ভোগ হয়ে গেছে, তারা কেন যাবে এই ঝঞ্ঝাটে? তারা একেবারে সন্ন্যাস নিবে। সংসার জ্বলন্ত অনল — ঠাকুর বলতেন। সাধ করে কে যায় অগ্নিকুণ্ডে? তাই জাবাল উপনিষদে আছে, যখনই বৈরাগ্য হবে তখনই সংসার ত্যাগ করবে। এ মতটা আমাদের খুব consistent (ন্যায়সঙ্গত) বলে মনে হয়। অধিকারিভেদ স্বীকার করতে হবে। নচেৎ গোঁড়ামী এসে যায়। সকলের একটা মত suit (উপযোগী) করে না।

পাঠ চলিতেছে। জনক শুকদেবকে কহিতেছেন — 'তুমি বিহিত কর্ম মনে করিয়া যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। রাগ ও অহঙ্কার

বিবর্জিত হইয়া কর্ম করিলে কর্ম অকর্মত্ব লাভ করে।'

শ্রীম — নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন, বেশ কথা। খুব কঠিন। রাগ মানে আসক্তি — interest, কোথা দিয়ে এসে পড়ে তা জানতেও দেয় না। Interest (স্বার্থ) নিয়ে সংসার। স্বার্থে একটু হাত পড়লে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ভাটপাড়ায় একটি ঘটনা হয়েছিল। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তুমি পরস্ব গ্রহণ করো না — হউক লক্ষ টাকা।' শিষ্য শোনে না। গুরু প্রতিবেশীর বাড়িতে বসে শিষ্যকে অভিশাপ দিচ্ছেন। শিষ্য শুনে বললে, 'কি, আমায় অভিশাপ! আমিও ব্রাহ্মণ। আমিও অভিশাপ দিচ্ছি।' (সকলের হাস্য) এমনি সংসার। এই জন্য গুরু অনেক সময় directly (সাক্ষাৎভাবে) কোনও কথা বলেন না শিষ্যকে। সাংসারিক দৃষ্টিতে, গুরু যদি কোন ভাগ চাইতেন, তা'হলে হয়তো শিষ্য এ ব্যাপারে তুষ্ট হতো। নিজে তো কোন কিছু নিলেনই না আবার শিষ্যকে সব ছাড়তে বলছেন। কি ভয়ানক কথা সংসারী লোকের পক্ষে! Attachment (অনুরাগ) এমনি জিনিস। কঠোপনিষদে আছে 'শ্রেয়' আর 'প্রেয়'। শ্রেয় — সত্য, ন্যায়, ঈশ্বর। প্রেয় — সংসার, ভোগ, এই পরস্ব। প্রেয় চায় লোক।

পাঠক পড়িতেছেন। শুকদেব কহিলেন, 'মহারাজ, সংসারে থাকিলে মন কিরূপে স্থির হইতে পারে? সর্বদা নানা ব্যাপারে মন বিক্ষিপ্ত থাকে। সংসারী জীব কি প্রকারে নিস্পৃহ হইতে পারে? শত্রু-মিত্র ভেদজ্ঞান কিরূপে দূর হইবে? ধন, বিত্ত, রাজ্য এই সকলে আত্মবুদ্ধি কিরূপে বিদূরিত হইবে? জনক উত্তর করিলেন, যদি জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সব থাকিতেও নিজেকে বিদেহ আত্মা মনে করিতে পারে, তবে সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া ধন, বিত্ত, রাজ্য, পরিজন — আমি নহি, এ সব আমার নহে — এ জ্ঞান কেন করিতে পারিবে না?'

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, জনক হেটমুণ্ড হয়ে তপস্যা করেছিলেন। তারপর ঈশ্বরদর্শন করে সংসারে ছিলেন, তাঁর আদেশ নিয়ে। জীবন্মুক্ত ক'জন হচ্ছে? শুকদেব বরং এ argument (যুক্তি) দিতে পারতেন। যাঁদের প্রকৃতিতে সংসার আছে, তাঁরাও প্রথম তপস্যা ক'রে, সাধুসঙ্গ

ক'রে, জ্ঞানভক্তি লাভ ক'রে, সংসার করবে। নচেৎ মাথা ঠিক রাখা দায়। কামিনী-কাঞ্চনের ফাঁদে পড়লে একবার, আর উপায় নাই। আজ তো বেশ, একটু এদিক-ওদিক হলেই চাকনা চূর। স্ত্রী যদি adultery (ব্যভিচার) করে বসে! একটি নায়েবের একটি গোমস্তা ছিল। বেশ লোক। একদিন বহু অর্থ আমদানী হয়েছে। রাত্রিতে অর্থলোভে গোমস্তা নায়েবের গলায় ছুরি মেরে সাবাড় করে দিলে। পরের দিন পুলিশে গিয়ে নিজেই আবার সংবাদ দিলে। এমনি কাণ্ড সংসারে! এইমাত্র পড়া হলো, বশিষ্ঠ ও নিমিরাজা গুরুশিষ্য। অন্য লোক দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছিলেন বলে বশিষ্ঠ শাপ দিলেন। নিমিরাজাও প্রতিশাপ দিলেন। তাতে উভয়ের পতন হলো। এমনি ব্যাপার সংসারে। বুঝতে দেয় না যে নিচে নামছে — কলমবাড়া* পথ। ঈশ্বরদর্শন ক'রে সংসারে থাকলে বিদেহ জনক — নয় তো সন্তানের জনক।

৩রা জুন, ১৯২৩ খ্রীঃ।
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল, রবিবার।

---

*কলমবাড়া - ঢাল, Slope

ষোড়শ অধ্যায়

যাতে বদ্ধ তাতেই মুক্ত, মোড় ফিরিয়ে দিলে

১

এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। শ্রীম বহু ভক্তসঙ্গে দ্বিতলে মেঝেতে বসিয়া আছেন। গুমট গরমে খুব কষ্ট হইতেছে। মিহিজামের জলবায়ুতে শরীর খুব ভাল হইয়াছিল। তিনি সেখানে ছিলেন যেন, কাননে সিংহ। কলিকাতার জলবায়ুতে এরই মধ্যে শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে। সর্বদা সর্দি-কাশি। আজকাল তাই ভজন ও পাঠই অধিক হয়। নিজে একটি গান গাহিতেছেন, 'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী'। ইতিমধ্যে স্বামী সদ্ভাবানন্দ, সতীশ নাথ আর চট্টগ্রামের নিরঞ্জন ও বন্ধু একজন গায়ক আসিয়াছেন। নিরঞ্জন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে চতুর্থ বর্ষে পড়েন। সঙ্গী গায়ক একটি স্তব গান করিলেন — 'জন্মে যাহার পুণ্য বসুধা।'

শ্রীম (নিরঞ্জনের প্রতি) — আয়ুর্বেদ, মানে যাহা ভগবানের দ্বারা রচিত।

নিরঞ্জন — সর্ব প্রথমে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ করে পড়তে হয়। ঔষধ খাওয়ানোর পূর্বেও তাঁর নাম করে দিতে হয়।

শ্রীম — তোমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র 'শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্মসাধনম্' এই মত থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ঋষিরা করেছেন এ সব। চ্যবন মুনি নির্জনবাসের কথা বলেছেন ক্ষয় রোগে, না? আচ্ছা, চিত্তশুদ্ধি, সাধুসঙ্গ এ সব কথাও কি আছে?

নিরঞ্জন — ভক্তি-বিশ্বাস না থাকলে চিকিৎসায় কেহ কিছু করতে পারবে না, এমন সব কথা আছে।

শ্রীম (কার্তিকের প্রতি) — আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনাদের ইংরেজী ডাক্তারীতে ঐ রকম কিছু আছে ঈশ্বর সম্বন্ধে?

ডাক্তার — আজ্ঞে তেমন কিছু নাই। ওটা কেবল সায়েন্সের উপর নির্ভর করে হয়েছে।

শ্রীম — হাঁ, ওরা ভোগী কিনা তাই। পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা হয় তার বাইরে যেতে চায় না। তার উপরও কত আছে। শরীর, মন, জীবাত্মা ও ঈশ্বর একের সঙ্গে অপরের যোগ আছে। শরীরের রোগের বেশীর ভাগ কারণই মনে। ঋষিরা তা জানতেন। তাই শরীরের চিকিৎসা করতে গিয়েও মন ও ঈশ্বরের সহায়তা নিতেন। সেদিন লণ্ডনে বাতাবাস বলে একটি প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সভা হলো। তাতে সব দেশেরই প্রতিনিধি ছিল। ঐ সভা 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি'কে request (অনুরোধ) করেছেন, ক্যারিকোলামে (পাঠ্যতালিকায়) আয়ুর্বেদ ঢুকাতে। সমস্ত চিঠিটা সংস্কৃতে লিখেছে।

ভক্তরা কেহ চলিয়া গেলেন আবার কেহ আসিলেন। এখন 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে। শচী পড়িতেছেন। ঠাকুর ভক্তদের 'ঘর' বলিতেছেন।

শ্রীম — 'ঘর' মানে একটা উচ্চ আদর্শের কথা বলে দিলেন। এখন এটা ধরে উপরে উঠতে থাকুক। 'অন্তরঙ্গ' মানে যারা নিত্য আসে কষ্ট ও অসুবিধা গ্রাহ্য না ক'রে। 'বহিরঙ্গ' মানে যারা কখনও আসে, আর উপদেশ নিয়ে চলে যায়। ঘরের বাইরের খুঁটি, আর ভিতরে খুঁটি। 'জীবন্মুক্ত' মানে যিনি জীবনীশক্তি চলছে এ অবস্থায় থেকেও বুঝেছেন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা, আমি তুমি নাই, সবই তুমি। দেহটাই ব্যবধান। যতক্ষণ Circulation of blood (রক্তচলাচল) চলছে জোরে, ততক্ষণ ঐ জ্ঞান হয় না সাধারণ লোকের। দেহের ভাটা পড়লে — ebb আরম্ভ হলে বোঝা যায় ঐটে মায়ার খেলা। অসত্য দেহকে আত্মা বলে বুঝিয়ে দেয় — 'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ', নাচের পুতুল সব মানুষ, যাদুকরের হাতে। তাঁর হাতটি দেখতে পেলেই জীবন্মুক্ত।

বড় জিতেন — হচ্ছে-টচ্ছে, ভালো লোকে একটু বললে তবে ভরসা হয়।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, আবার আর এক মত আছে, বেশী

বললে খারাপ হয়। মাইনরিটির (অল্প লোকের) মত ভাল।

শ্রীম — কালনায় দেখলাম স্টীমার থেকে লোকগুলি নৌকায় উঠছে। কত হাসিরঙ্গ চলছে। একজন তামাক খাচ্ছে. আর একজন young man (যুবক) অগোচরে কল্‌কেটা উঠিয়ে নিয়ে হাতে করে খেতে লাগলো। ওমা, স্টীমারের এক ঢেউয়েতেই সব শেষ হয়ে গেল। একটা wailing (আর্তনাদ) মাত্র শুনলুম আর কিছুই দেখা গেল না। ঢেউয়ের ফেনার মত মিশে গেল বার-চৌদ্দ জন লোক। সংসারের সব জল-বুদ্‌বুদের মত — এই আছে এই নাই। (বড় জিতেনের প্রতি) তা না হ'লে কোথায় গেল পূর্বপুরুষগণ?

পরদিন বৃহস্পতিবার। অপরাহ্ন ৫॥-৬॥ পর্যন্ত জল হইয়াছে। তবুও ভক্তগণ আসিয়াছেন। নিত্যগোপাল মহারাজের শিষ্য হরেনবাবু আসিয়াছেন। ধ্যানান্তে ইনি চিত্তেশ্বরী কীর্তন করিলেন। তৎপর শ্রীম ভক্তসঙ্গে হাততালি দিয়া গাহিতেছেন,

হরিহরয়ে নমো, কৃষ্ণযাদবায় নমো।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো,
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

এইটি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রথম গাহিয়াছিলেন। এইবার হরেনবাবুর সঙ্গে নিত্যগোপাল মহারাজের কথা হইতেছে।

হরেন (শ্রীম-র প্রতি) — ওঁর কোনও taste (স্বাদ) বোধ ছিল না। একদিন কইমাছের জল, নুন আর চিনি একসঙ্গে মিলিয়ে খেলেন।

শ্রীম — সমাধিস্থ পুরুষের বাহ্যজ্ঞান প্রায় থাকে না। ঈশ্বরীয় ভাবে বিভোর। ঠাকুরের কাপড়খানা বগলে। নগ্ন যেন পাঁচ বৎসরের শিশু। 'মা মা' করে বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত। 'In the world, but not of the world' সংসারে রয়েছেন কিন্তু সংসারের জ্ঞান নাই। মনপ্রাণ ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন। সমাধির অনেক stage (অবস্থা) আছে। কখনও দেখতাম, হঠাৎ আর হাত তুলতে পারছেন না — একেবারে বেহুঁশ। একবার গান হচ্ছিল নিচে 'জাগো, জাগো মা, কুলকুণ্ডলিনী'। শুনতে শুনতে সমাধিস্থ। খেতে বসা আর হাত উঠছে না। নেমে এসে বলছেন, 'আমায় ওখানে নিয়ে চল'। সমাধিস্থ পুরুষ যেমন

ঘুমন্ত শিশু, মা জোর ক'রে মুখে গুঁজে দিচ্ছে আর অনাসক্ত হয়ে খাচ্ছে। Mechanically (কলের মত) — যেমন এঞ্জিনকে খাওয়াচ্ছে। আর একটি উপমা দিয়েছিলেন ঠাকুর। অর্জুনের কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। রাজন্যবর্গ, রাজপ্রাসাদ কোথাও না — দৃষ্টি কেবল মৎস্যের দক্ষিণ চক্ষুতে। তখনই লক্ষ্যভেদ হলো। এমনি সমাধিস্থ পুরুষের মন — এক ঈশ্বরে নিবদ্ধ। একটি ছেলে বায়স্কোপ দেখতে গিছলো। শুধু কনসার্ট শুনতে লাগলো। অন্যদিকে হুঁশ নাই। আমরা বল্‌লুম, 'একটু দেখলে না কেন?' সে বললে, 'তার যো নাই। একটু দেখলে আরও দেখতে ইচ্ছা হবে' — interesting (আনন্দদায়ক) কি না। ছেলেটি শুধু কনসার্ট শুনলে। এতে বোঝা যায়, যার এতে অত মনোযোগ, তার ভগবানের বিষয়েও হ'তে পারে। পাঁচ বিষয়ে মন গেলে হয় না।

হরেন — খাঁসাহেব মনের কথা বলতে পারতেন।

শ্রীম — (তাচ্ছিল্যের সহিত) — ও আছে একটা, ঠাকুর বলতেন সিদ্ধাই। ঠাকুর ওপথে যেতে পারতেন না। রোগ সারানো এই সব। বলতেন, এই জন্য তো ডাক্তার কবিরাজ ক'রে দিয়েছেন। যে ঈশ্বরকে চায় ঠিক ঠিক, সে এ সব গ্রাহ্য করে না। এতে পতন হয়। সম্পূর্ণ মন তাঁতে না দিলে তাঁর দর্শন হয় না। অন্য দিকে মন দেবার অবসর কোথায়? তাইতো ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'For all these things do the nations of the world seek after. But rather seek ye the kingdom of God' (St. Luke 12:31) ; যে ভগবানকে চায় সে অন্য কিছুই চায় না।

ঠাকুর থাকতেন যেন মায়ের কোলে শিশু। খালি মাকেই জানেন, অন্য কিছু না। নবগোপালবাবু আশীর্বাদ করতে বললে, ঠাকুর বললেন, 'আমার এ করতে নেই। মা জানেন সব।' কেশববাবুর মাকেও এই কথা বলেছিলেন বড় ছেলেকে আশীর্বাদ করতে বলায়। ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'আমার আশীর্বাদ করবার যো নাই।' মায়ের সামনে কি ছেলে আশীর্বাদ করতে পারে? মা জানেন সব। অবতারের life-টা (জীবন) হচ্ছে, criticism of the existing

spiritual matters (প্রচলিত ধর্মের সমালোচনা)। সারাটা জীবনই ঐ।

৬ই জুন, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

মর্টন স্কুল। রাত্রি আটটা। দ্বিতল গৃহে ত্রিশ জনের অধিক ভক্ত। শ্রীম মেঝেতে বসিয়া আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোকুলবাবু আসিয়াছেন। হরেন্দ্র মাস্টার গান গাহিতেছেন।

গান। হের হরমনমোহিনী কে বলেরে কাল মেয়ে।

গান। শ্যামা মা কি আমার কালরে।

অধ্যাপক গোকুলবাবু গাহিলেন —

'রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও।
করুণা ভিখারি আমি, করুণা নয়নে চাও'॥

গান। সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

বড় অমূল্য গাহিতেছেন —

গান। এমন দিন কি হবে মা তারা।
যখন তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে বইবে ধারা॥

গান। যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।

হরেন্দ্র আবার গাহিতেছেন —

গান। নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।

স্থির হইয়া শ্রীম ভজন শুনিতেছেন। সমাপ্ত হইলেও কিছুকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এবার মধুর কণ্ঠে ছোট জিতেনকে মঠের বিবরণ কহিতে বলিলেন।

ছোট জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — আজ সকালে মহাপুরুষমহারাজ ভাবমহারাজকে বলেছিলেন, 'এখন জামতাড়ায় গিয়ে ঠিক হয়ে বস। ঘুরলে ফিরলে কি হবে? তাঁর নাম কর, জপ ধ্যান কর। আপনা থেকে সব আসবে যা দরকার।'

শ্রীম (আহ্লাদে) — আমরাও এই কথা বলেছি। চার-পাঁচ দিন হয় এসেছিলেন। বলেছিলাম, 'বামন অবতারে বলীর নিকট মাত্র

ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করেছিলেন তপস্যা করবেন বলে, আর তুমি অত জমি পেয়েছো। এখন বসে তাঁর নাম কর।' তাঁকে ঠিক ঠিক ডাকলে তিনি সব জোগাড় করে দেন।

বড় অমূল্য — শুধু ডালভাত খেলে একজনের তিন টাকায় হয়ে যায় মাসে। তিন জনের ন'টাকা হলে হয়ে যায়। তাতেও হচ্ছে না?

শ্রীম — ওসব তিন টাকার হিসাব ভাবতে হয় না। তিনি নিজে সব জোগাড় করে দেন। গীতার কথা কি মিথ্যা? 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। (ভক্তদের প্রতি) প্রত্যেকের ভিতর একটা craving (তৃষ্ণা) আছে ভগবানের জন্য। এটি ঠিক ঠিক এলে আপনা হতেই সব আসে, দেহমন রক্ষার জন্য যা দরকার — যেমন আলো দেখলে বাদুলে পোকা আসে। আন্তরিক তাঁকে ডাকছে দেখলে কত লোক তাঁর কাছে যায় সেবা করতে। তিনি সব পাঠিয়ে দেন। দেহের জন্য, পেটের জন্য যে disturbance (বিঘ্ন) হয়, তা তিনি নিজে দূর করেন। ভক্তরা ওরূপ লোকের সেবা করে। পায় কোথা খাঁটি লোক যিনি অনন্যমনে তাঁকে ডাকছেন? যেমন একজন বহু কষ্ট করে কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়েছে, তখন অনেকে আসে আগুন পোয়াতে। তাদের সুবিধা কত, তৈরী আগুন পায়। খাঁটি হলে তিনি ভক্তদের পাঠিয়ে দেন আর দেহধারণের সব ব্যবস্থা করে দেন। তখন সর্বদাই যোগে থাকতে পারে। তবে খাঁটি হওয়া চাই।

শুকলাল — মনোরঞ্জন লিখেছেন, 'এখানে (মিহিজামে) কোনও অভাব নাই।'

শ্রীম — তাই বই কি! কি বা অভাব? দু'টি চাল ফুটিয়ে নেওয়া, আর দু'টি ডাল। (ভক্তদের প্রতি) ঠাকুর একটি ভক্তকে (মাকে) বলেছিলেন, 'তোমার এই কুটীরটি রইলো। আর শাকভাত খাবে নুন দিয়ে। বিকালে একটু বাতাসা পেলে তো পেলে, নয়তো এমনি জলপান। সব সময় বসে হরিনাম করবে। কুটীরটি কিন্তু তোমার হওয়া চাই, নিজের।'

'ওঁদের কি সাধুদের; ওঁরা কারো ধার ধারেন!' গৃহীদের একটু আছে। অনেক mind-এর (মনের) সঙ্গে deal (চলতে) হয়। নিজের

শাকভাত হলেও হয়, কিন্তু অন্যরা মানবে কেন তাতে? তাই ঠাকুর বলতেন, শবসাধনের মড়ার মত তাদের বশে রাখতে হয়। শবসাধনের মড়ার উপর যেই বসেছে, অমনি 'হাঁ' করে ওঠে। ভূতে ধরে কিনা! অমনি মদ আর ছোলা ভাজা মুখে দেয়। মড়াটা তখন কড়র-মড়র করে খেতে থাকে। সেই অবসরে সাধক জপ করে নেয়।

পরিজনদের দাসত্ব — খালি luxury, ভোগ নিয়ে। ভাল কাপড়, ভাল গহনা, গাড়ী, বাড়ি এ সব চাই। এত সব না চাইলে, দাসত্ব থাকে না। বিদ্যেসাগর মশায় কর্ম ছেড়ে দিলেন। প্রিন্সিপাল ছিলেন। পঁচিশ টাকা মাইনে তখনকার দিনে। কি তেজস্বী পুরুষ! বলেছিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, তিন বাড়ি থেকে তিন মুঠো চাল ভিক্ষে করে এনে ফুটিয়ে নুন দিয়ে খাব।' কেন যাবেন দাসত্বের লাঞ্ছনা সইতে? এমন মনের জোর। Want (অভাব) না কমালে simple life (সরল জীবন) হয় না। আর simple life (সরল জীবন) না হলে ধর্মজীবন হয় না।

৮ই জুন, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। অপরাহ্ণ কাল। আদ্যাপীঠের অন্নদা ঠাকুর আসিয়াছেন। শ্রীম আনন্দে নানা কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্নদা ঠাকুরের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, কামিনীকাঞ্চন যোগভ্রষ্ট করে দেয়। এক অবস্থায় একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে থাকতেন পাছে স্ত্রীলোকের আর বিষয়ীদের গায়ের হাওয়া লাগে গায়ে। একজনের বলতেন, পরমহংস অবস্থা। তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বেশী না মিশতে। শোনে নাই। পরে ঐতে তার পতন হয়েছিল শোনা যায়। ঈশ্বরীয় ভাব হৃদয়ে এলে, অতি সাবধানে রক্ষা করতে হয় — যেমন আঙ্গুর রাখে তূলোর বাক্সে। বলতেন, পরমহংস হলেও, লোকশিক্ষার জন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকবে না।

অন্নদা ঠাকুর গম্ভীরভাবে এই মহাবাণী শুনিলেন। মিষ্টিমুখ করিয়া কিছুকাল পরে বিদায় লইলেন।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। নিত্যগোপাল মহারাজের শিষ্য হরেন্দ্র

কীর্তন গাহিতেছেন। 'হরিহরয়ে নমো, কৃষ্ণযাদবায় নমো।' কীর্তন শেষ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গী কোটপ্যান্টধারী ভক্তকে ঠাকুরের কথা শুনাইতে (শ্রীমকে) অনুরোধ করিলেন।

শ্রীম (সহাস্যে, রঙ্গচ্ছলে) — 'সখী গো সখী তোমারই শ্যামের কথা হচ্ছে।' এক ন্যায়ের পণ্ডিতকে আমরা ঠাকুরের একটি গল্প বলেছিলাম। দুই বন্ধু আম খেতে বাগানে ঢুকেছে। একজন ঢুকেই আম খাচ্ছে, আর একজন বাগান দেখছে। সময় হয়ে গেলে মালী বের হয়ে যেতে বললে। যে আম খেয়েছিল সে আনন্দে বের হয়ে এলো। বন্ধুর আর আম খাওয়া হলো না। তাই ঠাকুর বলতেন, আম খেতে এসেছো আম খাও (ঈশ্বরকে ডাক)। অত খবরে কাজ কি, কত গাছ, কত হাজার পাতা। বলতেন, যদু মল্লিকের কত কোম্পানীর কাগজ, কত বাড়ি, কত টাকা — এসব কথা এর তার কাছে জিজ্ঞেস করে কি হবে? যো সো করে আগে যদু মল্লিকের সঙ্গে দেখা কর। প্রয়োজন হলে তার কাছ থেকে সব খবর জানতে পারবে। যদু মল্লিক মানে, ঈশ্বর। আগে তাঁর দর্শন, পরে অন্য কথা। কেশব সেনকে এই কথা বলেছিলেন। হাজার বই-ই পড় আর লেকচারই দাও, কিছুতেই কিছু হবে না। শুধু পণ্ডিতকে চিল শকুনী বলতেন। খুব উঁচুতে উঠে। কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে — কামিনীকাঞ্চনে।

কতকগুলি ব্রাহ্ম ছোকরা, বয়েস বাইশ-তেইশ বছর। বিবেকানন্দের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গেছে। ঠাকুর বলছেন, 'আগে ডুব দাও। উপরে ভাসলে হবে না।' নিচে যে অমূল্য রত্ন রয়েছে তা তো দেখতে পাচ্ছো না। তাই আগে ডুব দিয়ে রত্ন লাভ করে যা ইচ্ছা কর। 'ডুব দাও' মানে, সাধন-ভজন করে তাঁকে দর্শন করা। তারপর তাঁর যেরূপ আদেশ হবে, তাই করা। আগে তাঁর দর্শন পরে অন্য সব। একটি বেশ ছড়া বলতেন, 'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল।' (অর্থ বলিতেছেন*)। কলকাতায় তখন খুব

---

*এক গাঁয়ে পদ্মলোচন নামে একটি ছেলে ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা গাঁয়ের পরিত্যক্ত মন্দির থেকে শাঁখের শব্দে সবাই দৌড়ে এসে দেখল খালি মন্দিরে সে শাঁখ বাজাচ্ছে। ঐ মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠাও হয়নি। শুধু চামচিকার বিষ্ঠাতে অপবিত্র। সর্বদাই এগারোটি চামচিকার — (এগারো ইন্দ্রিয় — পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন) উপদ্রব। আগে চিত্ত শুদ্ধ করে, হৃদয় মন্দিরে মাধবরূপ ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করে শাঁখ বাজাও অর্থাৎ বক্তৃতা, লেকচার দাও।

লেকচার হতো কিনা, তাই ঐ গল্পটি বলতেন। শুধু শাঁখ ফুঁকলে, মানে লেকচারে কাজ হয় না। ‘মাধব’ প্রতিষ্ঠা করা চাই, অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন।

ঠাকুরের কাছে যাবার আগে ব্রাহ্মসমাজে যেতাম। সেখানে খুব লেকচার হতো। ঐ সব শুনে মনে হতো, ঈশ্বর অনেক দূরে! আনন্দ হতো না। ও মা, ওঁর কাছে গিয়ে দেখি কথা কন ঈশ্বরের সঙ্গে। যেন ঘরের লোক। অবতার একটা grand mystery (দুর্বোধ্য রহস্য)! বুঝবার উপায় নাই। তবে তিনি যা বলেন, তা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত। অর্জুনই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। ‘স্বয়ঃঞ্চৈব ব্রবীষি মে’। ঠাকুর বলেছিলেন, ‘আমার চিন্তা করলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না।’ তাঁর চিন্তা করা উচিত আমাদের। ক্রাইস্ট বলেছিলেন এই কথা ...he that hath seen me hath seen the Father. যে কালে আমাকে দেখেছো, ঈশ্বরকেই দেখা হলো। কারণ 'I and my Father are one.' অবতার আর ঈশ্বর এক। মিহিজামের মাঠে দেখতাম রাখালরা ‘বুর্‌রুড় বুর্‌রুড়’ করে। ভাবতুম কেন করে। শেষে বুঝলুম ছাগলের মত কথা কইছে। নইলে বুঝতে পারবে না ওরা। অবতার ঠিক তেমনি। মানুষ হয়ে ঠিক মানুষের মত সব করেন। তাঁর কথায় বিশ্বাস হলে সব হয়ে গেল। ঠাকুর ক্রাইস্ট এঁরা অবতার।

অমৃত — তাই কি রোগ-শোক, সাধন-তপস্যা সব মানুষের মত?

শ্রীম — তা নয়তো কি? সচ্চিদানন্দের একটি রূপ তিনি। তাঁর রোগ-শোকই বা কি আর সাধন-তপস্যাই বা কি? লোকশিক্ষার জন্য, আমাদের ভরসার জন্য সব গ্রহণ করলেন। ত্রেতাযুগে ভরদ্বাজ ঋষি বলেছিলেন রামকে, ‘তুমি সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। আমাদের কল্যাণের জন্য এই মানবরূপ ধারণ করেছো।’ অবতারকে বোঝা বড় কঠিন।

খুব গরম পড়িয়াছে। শ্রীম-র সেদিকে লক্ষ্য নাই। মত্ত হইয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতেছেন। এতক্ষণ একটি ভক্ত তালপাতার পাখা দিয়া হাওয়া করিতেছিলেন। সেদিকে লক্ষ্য পড়িতেই তর্জনীদ্বারা

ভক্তগণকে দেখাইয়া বলিতেছেন, এঁদের করুন এঁদের করুন। যোগীদের সর্বভূতে সমদৃষ্টি। সকলের ভিতর ভগবানকে দর্শন করেন। (ভক্তদের দেখাইয়া) নারায়ণের এক একটি রূপ সব। সংসারে থেকে যাঁরা এরূপ দেখেন, তাঁদের বুঝতে হবে সংসার জয় করেছেন।

অমৃত (শ্রীম-র প্রতি) — আজ্ঞে, সমদর্শন মানে কি?

শ্রীম — যিনি সর্বভূতে তাঁকে দেখেন আর সর্বভূত তাঁ'তে দেখেন — তিনি সব হয়ে রয়েছেন। অন্তরেও তিনি, বাইরেও তিনি। 'সম' মানে ঈশ্বর, 'বিষম' মানে সংসার — unity and diversity.

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিবেকানন্দ দিন কয়েক মা কালীর ধ্যান করেছিলেন। তারপর ঠাকুরকে এসে বললেন, 'কই কিছুই তো হলো না' অর্থাৎ দর্শনাদি। ইনি নিরাকারবাদী ছিলেন কি না প্রথমে। ঠাকুর শুনে বললেন, দার্জিলিং-এ ধোঁয়ার মত মেঘ, (smoky vapour) দেখা যায়। তা আবার ঝুর ঝুর করে পড়ে বরফ হয়ে। তেমনি যিনি নিরাকার তিনিই সাকার হন। ধৈর্য ধরে একটু কর, অবশ্য দেখতে পাবে।

দেবী ভাগবত পাঠ হইতেছে। জগতের আদি কারণ নির্ণয় হইতেছে। বেদব্যাস, নারদ, ব্রহ্মা-গুরুপরম্পরা কেহই কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মা আকাশবাণী শুনিলেন, তপস্যা কর, জানিতে পারিবে। সহস্র বর্ষ তপস্যার পর পুনরায় আকাশবাণী হইল 'জগৎ সৃজন কর'। কে বলিতেছে উহা জানিবার জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারিলেন, ভুবনেশ্বরী ব্রহ্মশক্তি জগতের আদি কারণ।

জগতের কারণ সম্বন্ধে আরও নানা মত আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, পাবক, পবন, যম, কুবের, গণপতি, এঁরাও বিভিন্ন মতে জগতের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হন। মুনিরা বলেন, নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের কারণ, কেহ বলেন, পুরুষোত্তম। আবার কেহ বলেন, জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন, কেহ কর্তা নাই। সাংখ্য মতে প্রকৃতি-পুরুষ কারণ।

শ্রীম — বাবা, কত মত! বহ্মা-বিষ্ণু-শিব গিয়ে দেখলেন তাঁদের চাইতেও আরো বড় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব রয়েছে। অনন্ত ব্যাপার! কে

বুঝবে এ সব। ঠাকুর বলতেন, মায়ার ব্যাপার সব এলোমেলো। বোঝা যায় না। ঠাকুর তাই বলতেন, ‘মা ও সব জানতেও চাই না, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।’ শেষ নাই। আমরা শুনে রেখেছি গুরুমুখে, অবতারের মুখে — যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। যিনিই শক্তি তিনিই ব্রহ্ম। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন বলে শক্তি কই, আর স্বরূপে অবস্থান করলে তাঁকেই ব্রহ্ম কই। যেমন সাপ হেলে দুলে চলে আর কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, ইহাই শক্তি আর ব্রহ্ম।

মানুষের problem (সমস্যা) হলো যে, যো সো করে এই জগৎ কারণকে জানা। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে লেগে যেতে হয়। নিজের বুদ্ধিতে এ সব নির্ণয় হয় না। সেই শক্তি কোথায়? দেবতারাই কত করে তবে জানতে পারলেন! কলির জীবের অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম। নানান খানা চলে না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বলা। তাঁর দর্শন হলে, তিনি সব জানিয়ে দেন যা দরকার। আমাদের এইটুকু জানলেই যথেষ্ট, ঈশ্বর আছেন — তিনি সব করছেন আর সব হয়ে রয়েছেন। কাঁদা চাই, তবে দর্শন দেন — রামপ্রসাদকে দিয়েছিলেন। ঠাকুরও এই রাস্তায় দর্শন করেন প্রথম। তাঁর দর্শন হলে — সব সংশয় যায় ‘ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ’। তখন শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, সহাস্যে) — দেখুন, (পড়া হলে বলছেন), ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিনজন স্ত্রীবেশ ধারণ করে তবে দেবীর নিকট উপস্থিত হলেন। মানে এঁরা সকলেই ব্রহ্মশক্তির অধীন হয়ে আপন আপন কাজ করছেন। এই এক মত — যেখানে আদ্যাশক্তি সেখানে সব স্ত্রী। অর্থাৎ স্ত্রীলোক যেমন পুরুষের উপর নির্ভরশীল তেমনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব আদ্যাশক্তির উপর নির্ভরশীল। স্ত্রী মানে dependent — নির্ভরশীল। উপনিষদে আছে, ব্রহ্মশক্তি দেবতাদের অহংকার নাশ করেছিলেন। ছদ্মবেশে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র তৃণ দিয়েছিলেন। অগ্নি ও পবন সমস্ত শক্তি দিয়ে না পারলেন এটিকে পোড়াতে, না নড়াতে। ইন্দ্র এসে চিনেছিলেন দেবীকে। ঠাকুর সেই আদ্যাশক্তিকেই ‘মা’

বলতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন মানুষের মত। সেই আদ্যাশক্তিই অবতার, ঠাকুর। তাই বলতেন, 'আমায় চিন্তা কর, আর কিছু করতে হবে না।' এ শক্তি কার আছে, ঈশ্বর ছাড়া!

আর একটি কথা বলতেন, জিতেন্দ্রিয় হতে হলে নিজেকে স্ত্রী ভাবা উচিত। তিনি নিজেও ছিলেন অনেক দিন ঐ ভাবে। তাতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান দূর হয়। বলতেন, আমি নিজেকে 'পু' (পুরুষ) বলতে পারি না।

৯ই জুন, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৪

একটি ভক্ত শ্রীম-র হাতে একখানা 'দেবীপুরাণ' দিলেন। 'বঙ্গবাসী' হইতে এইমাত্র পুস্তকখানা শ্রীম-র জন্য আনিয়াছেন। এখন অপরাহ্ন ৫টা। বড় ললিত, সুশীল, অশ্বিনী চক্রবর্তী প্রভৃতি ভক্তরা বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ লোককে বদ্ধ করে তাতেই আবার মুক্ত করে। মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো। যে রূপে মানুষ মুগ্ধ হয়, তার স্থলে ঈশ্বরের সাকার উপাসনা করা। রস — চরণামৃতাদি গ্রহণ করা। গন্ধ — যেমন পূজার পুষ্প, কি গন্ধদ্রব্য, কিম্বা প্রসাদের গন্ধ গ্রহণ। শব্দ — তাঁর নাম গুণগান করা, অথবা শোনা। স্পর্শ—মূর্তির চরণস্পর্শ, গুরুকে প্রণাম, শিরে গুরুর হস্তস্পর্শ। বিষয় ভোগে মন না দিয়ে ভগবানকে মধ্যস্থ রেখে করা। এরূপ করতে করতে আন্তরিক হলে তাঁ'তে মন স্থির হয়ে যায়। দ্বৈত পূজার উদ্দেশ্যই তাই। বললেই মন উপরে উঠে না। তাই যাতে মন রয়েছে সেইগুলি ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে নিয়ে নাও। নানা সাজে সেজে নটী নাচ-গান করছে, শ্রোতারা শুনছে। সকলেই মদ খেয়ে মাতাল। এ এক রকম। তাঁর নামে নৃত্য মাতোয়ারা হয়ে, সে এক রকম। অনেক তফাৎ। ঈশ্বরীয় গান হলে ঠাকুর বলতেন, এই কাজ হলো। গানে মন ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। জগতের গানের সঙ্গেও এক হয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, জগতে অনবরত গান

হচ্ছে। একদিন রাত দুটো তিনটের সময় পোস্তাতে বেড়াতে বেড়াতে এ কথা বলেছিলেন। এরই নাম অনাহত শব্দ। (মেঝেতে আঘাত করিয়া) এই হলো আহত শব্দ। অনাহত অমনি হচ্ছে। যোগীরা শুনতে পান। যখন ভোগ সব ত্যাগ হয়, এদিকের সব থেকে যখন মন উঠে যায়, তখন ঐ শব্দ শোনা যায়। যোগী কে? যার ভোগ ত্যাগ হয়েছে। (সহাস্যে) আপনারা কেউ শুনতে চান ঐ শব্দ, ঐ অনাহত সঙ্গীত? যদি শুনতে চান তাহলে ওদিকে (ভোগে) আর যেতে পারবেন না। (সহাস্যে) ঠাকুর রসিকতা করে বলতেন, গোষ্ঠ বড় মুশকিলে পড়েছে। বৃকোদ-ভেক্ (বৈষ্ণব ত্যাগীর ছদ্মবেশ) নিয়ে বসেছে। ও নিলে আর সংসার ভোগ চলে না।

সংসার ত্যাগ বড় কঠিন। সংসার ত্যাগ মানে ঈশ্বরকে গ্রহণ। ঘরে থেকেও তা হতে পারে। কেউ কেউ বাইরেও ত্যাগ করেন। কিন্তু বড় কঠিন। তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। ঘরে থেকে খুবই কঠিন। নরেন্দ্রের বুকে হাত দিলেন অমনি সমাধি। সে অবস্থায় বলেছেন, 'ও ঠাকুর করলে কি? আমার যে বাপ মা রয়েছে!' রাখাল বলতেন, 'আমার পরিবারের কি হবে' — এঁরা হলেন best (উত্তম) অধিকারী। এঁদেরই এই অবস্থা, অন্যের কথা কি? শরীর ধারণ করলে এ সব হয়। জ্ঞান থাকলে অজ্ঞানও থাকবে। ঠাকুর বলতেন, বিদ্যার চাইতে অবিদ্যার জোর বেশী। অবিদ্যার কাছে গুরুও হেরে যায়। এমন কাণ্ড!

বহু ভক্ত আসিয়াছেন। নিত্যকার ভক্তগণ প্রায় সকলে আসিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমি বলি, ভক্তরা গান-বাজনা শেখে না কেন? স্বামীজী নিজের চেষ্টায় কত সব শিখেছিলেন। সেতার, এস্‌রাজ, বেহালা কত কি! এ-ওস্তাদের বাড়ি, ও-ওস্তাদের বাড়ি ঘুরে সব শিখেছেন। তিনি হারমোনিয়াম বাজাতে দিতেন না সুর নষ্ট হয়ে যাবে বলে। ভক্তরা শিখলে পারে গানবাজনা। (হরেন্দ্র মাস্টারের প্রতি) আপনি বলতে পারেন কেন শিখে না?

হরেন মাস্টার (সহাস্যে) — এতে যে ধরা পড়ে যায়, না পারলে (সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীম — ও-ও-ও এতে ফাঁকি চলে না! আচ্ছা, এ না পারলে ভগবান পাবে কি করে?

হরেন্দ্র মাস্টার — আজ্ঞে ওতে ফাঁকি চলে। (সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীম — ঈশ্বরের বেলাও চলে! কিন্তু ঠাকুর বলতেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিছরির হিসাবও করতে পারে।

শ্রীম-র আদেশে বড় ললিত 'দেবীপুরাণ' পাঠ করিতেছেন। প্রথম তিন অধ্যায় পাঠ হইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। সকলে অন্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে পুনরায় জগবন্ধু পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করিলেন।

শ্রীম — এতে খালি সকাম কর্মের কথা আছে, আর খালি ভোগের কথা। শক্তিটক্তিকে ঠাকুর বলতেন, বেশ্যার গু। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, সিদ্ধাই শক্তিকে দিয়ে এদিককার সব সুবিধা হতে পারে কিন্তু আমায় পাবে না। গোষ্ঠ, নদীতীর, দেবালয়, ভক্তসঙ্ঘ এ সব পুরাণ পাঠের উপযুক্ত স্থান। এটি বেশ। (অন্তেবাসীর প্রতি) আহা, আমরা কেমন গোষ্ঠে বেড়াতাম মিহিজামে! দেবীপুরাণে বলছেন, 'ঘোর' দৈত্য নারায়ণের ভক্ত। কোন অন্যায় করে না। কিন্তু ছেলের সঙ্গে পেরে উঠে না। সে রাজ্য বাড়াতে চায়। (শুকলালের প্রতি) এই দেখুন, ছেলের সঙ্গে পারা যায় না।

একজন ভক্ত রামানুজ-চরিত হইতে কতকগুলি ঘটনা বলিতে লাগিলেন — রামানুজ ও যমুনাচার্যের জীবন-বৃত্তান্ত। ভক্তরা অনেকগুলি গান গাহিলেন। শেষে শ্রীম গাহিতেছেন। 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।'

শ্রীম — এই গানটি স্বামীজী গেয়েছিলেন, ১৮/১৯ বছর বয়সে। গন্ধর্বকণ্ঠ। শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ উত্তরের বারান্দায়। সমাধিদর্শন এই আমার প্রথম।

কলিকাতা, ১৬ই জুন, ১৯২৩ খ্রীঃ, শনিবার।
১লা আষাঢ়, ১৩৩০ সাল।

সপ্তদশ অধ্যায়

'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে' — হীরা চিনে জহুরী

১

মর্টন স্কুল, নিম্নতলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। চারিদিকে বেঞ্চ — ভক্তগণ উপবিষ্ট। শ্রীম পশ্চিমাস্য। দশ হাত দূরে আমহার্স্ট স্ট্রীট সম্মুখে। গগন বিশ্বাস আসিয়াছেন আজ প্রথম। ইনি অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। বয়স একাত্তর — বিলেত ফেরৎ। শ্রীম-র সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

গগন (শ্রীম-র প্রতি) — আচ্ছা, অবতার যে এসেছেন তার পরিচয় কি?

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — গীতার শ্লোকটা কি?

ডাক্তার — আহুস্ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিত দেবল ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥

(গীতা ১০:১৩)

শ্রীম (গগনের প্রতি) — 'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে' — তুমি নিজে বলছো, 'আমি অবতার'। আর অসিত, দেবল, ব্যাস, নারদ এঁরা বলছেন তুমি অবতার। তাই বিশ্বাস করছি। অর্জুন অত বড় উচ্চ অধিকারী তিনিই চিনতে না পেরে এঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন। অন্যের কথা কি! তিনি নিজে না বললে, ধরতে পারে না কেউ। ঠাকুর নিজে বলেছেন, সচ্চিদানন্দ এই শরীর ধারণ করে এসেছেন। তিনি নিজ মুখে বলেছেন, 'আমি অবতার।' তাই তাঁর কথা আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের সাধ্য কি তাঁকে বোঝা? আমরা হলুম একসেরে ঘটি; দশসের দুধ তাতে ধরবে কি করে? তাই 'মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং'। 'চিঁড়া ভেজা বুদ্ধিতে' তাঁকে বোঝা যায় না। জানেন তো গল্পটা?

গগন — আজ্ঞে না।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, ওদেশে (কামারপুকুরে) রকমারী দই

আছে। খাসা, মাঝারী, আর একরকম জলবৎ তরল। এতে আর জলের দরকার হয় না চিঁড়া ভেজাতে হলে। তেমনি 'চিঁড়া ভেজা বুদ্ধি' মানে হীনবুদ্ধি, কামিনীকাঞ্চন লাভের বুদ্ধি। যে বুদ্ধি দিয়ে টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম লাভ হয়, জজ-ব্যারিস্টার হয় সেই বুদ্ধি 'চিঁড়া ভেজা বুদ্ধি', বিষয় বুদ্ধি। ঠাকুর একে 'রাঁড়ি-পুতি বুদ্ধি'ও বলতেন। রাঁড়ির পুত্র অতি কষ্টে মানুষ হয়েছে তাই সংকীর্ণ বুদ্ধি। অর্থাৎ বিষয়বুদ্ধি। ভগবানলাভ হয় না এ বুদ্ধি দিয়ে। তা করতে হলে খাসা বুদ্ধির দরকার। বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের বেদে 'বালাঃ' অর্থাৎ শিশু, অজ্ঞান বলা হয়েছে। আবার 'ধীরাঃ' — যারা শুধু তাঁকে চায়, তাদের বুদ্ধি খাসা। অবতারকে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায় 'আগম'। আগম মানে revelation, অর্থাৎ তাঁর নিজ মুখের বাণী।

গগন — নাস্তিকরা অবতার বিশ্বাস করে না।

শ্রীম — একটি ভক্ত একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি নাস্তিক'। ঠাকুর শুনে ঐ লোকটির পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, 'না না, ইনি কেন যাবেন নাস্তিক হতে — যে কালে এখানে এসেছেন।' (গগনের প্রতি) কেন আপনি ও-কথা বলছেন? মুখে বললেই ঐ হয়ে যায় না। অনেকে তর্কের সময় বলে, আমি নাস্তিক। কিন্তু নাস্তিক নয়। আপনি বললেই তো হলো না। আপনার ভিতরে সংস্কার রয়েছে। টেনে নিয়ে আসবে জোর করে।

গগন — ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর আসা-যাওয়া ছিল। কেশব সেনকে চিনতেন। 'শিবনাথ শিবনাথ'-ও করতেন। শিবনাথ কিন্তু বলতেন, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে বেহেড্ হয়ে যায়।

শ্রীম (সহাস্যে) — একজন ভক্ত রেগে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন, শিবনাথবাবু আপনাকে একজন সাধারণ সাধু বলে মনে করেন। ঠাকুর শুনে উত্তর করলেন, 'তা তুমি ও-কথায় অত চট কেন? একটা গল্প শোন। একজনের এক টুকরো হীরা ছিল, তার বেচবার দরকার তাই বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে গেল। সে বললে ন'সের বেগুন দেব। কাপড়ওয়ালা বললে ন'শ টাকা। জহুরী দেখেই একেবারে লাখ টাকা দাম দিলে।' তেমনি যার যেরূপ আকর সে সেই দাম দেবে। হীরা চিনে জহুরী।

নরেন্দ্র প্রথম প্রথম বলতো, এ সব (ঈশ্বরীয় দর্শন, সমাধি) hallucination (মতিভ্রম)। শুনে, ঠাকুর মাকে বলায়, মা বললেন, তা কি করে হয় বাবা, সব মিলে যাচ্ছে যে। তিনি (ঠাকুর) নরেন্দ্রকে বললেন, 'তোর কথা নিতে পারলুম না। মা বলেছেন, সব মিলে যাচ্ছে।'

ঈশ্বর কথা কন। সব দেশে সব কালেই কথা কয়েছেন। কেউ সঙ্কলন করে রেখেছেন ওসব, কেউ রাখেন নি। এ দেশে বেদব্যাস ঐ সব কথা রেখেছিলেন। পরেও কত হচ্ছে। অবতারের মুখ দিয়ে যা বের হয় সব revelation (বেদবাণী)।

সন্ধ্যা সমাগতা। সকলে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে বৌবাজারের একজন ভক্ত দুটি গান গাহিলেন। অপর একজন রবিবাবুর তিনটি গান গাহিলেন। তৎপর সকল ভক্ত মিলিয়া গাহিতেছেন —

'শ্যামাধন কি সবায় পায়, কালীধন কি সবায় পায়।
অবোধ মন বোঝে না এ কি দায়'॥

শ্রীম — আপনারা কেউ বেহাগ জানেন? এটি বড় মধুর। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে ফিরবার সময় গাইতেন, রাত দশটা এগারটা। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীতে তাঁকে ডাকবার ইচ্ছা হয়। যদি কেউ শিখিয়ে দিত আমায়।

গগন — রবিবাবুর গানে বোঝা যায়, ব্রাহ্ম হলেও সাকার নিরাকার দুই-ই বিশ্বাস করেন।

শ্রীম — তা না হয়ে কি আর যায়! ঠাকুর যেমন বলতেন, আলো বিশ্বাস হলে আঁধারও হবে। এসব co-relative terms (পরস্পর সম্বন্ধ শব্দ)। রবিবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় নন্দনবাগানে — বছর কুড়ি বয়েস তাঁর তখন। আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন। (ভক্তদের প্রতি) রবিবাবুর 'পোস্টাফিস' (ডাকঘর) কেউ পড়েছেন আপনারা? (গগনের প্রতি) ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের একটা necessity (আবশ্যকতা)। আবার সাকার নিরাকার-এর একটাতে হলেই অপরটাতেও হবে।

১২ই জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

আজও গগন বিশ্বাস ইঞ্জিনীয়ার আসিয়াছেন। পঁয়ত্রিশ জন ভক্ত সমাগত। ধ্যানান্তে শ্রীম কমলকে দুটি ভজন গাহিতে বলিলেন। কমল গাহিলেন —

গান।। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥

গান। মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো কামাদি কুসুম সকলে॥

এইবার গগনবাবু শ্রীমকে প্রশ্ন করিতেছেন।

গগন (শ্রীম-র প্রতি) — মানুষের কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে — মানুষ স্বতন্ত্র, কি ঈশ্বরতন্ত্র?

শ্রীম — ওয়েস্টে (পাশ্চাত্ত্যে) কত বড় বড় লোক এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন — The problem of free will and predestination, ঠাকুর কিন্তু একটি ছোট গল্প বলে এ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। কেশব সেনকে বলেছিলেন, এক জমিদারের এক নায়েব আছে। সেই দেখে-শুনে জমিদারী। প্রজাদের বিবাদের বিচার করে। একদিন জমিদার এসেছে inspection (পরিদর্শন) করতে। কাচারীতে সাদা ফরাসের চাদর পাতা। তার উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে জমিদার বসে আছে। নায়েব দাঁড়িয়ে আছে। প্রজারা সব এসেছে। অন্য দিনের মত নায়েবের কাছে নালিশ করছে, অমুক আমার অমুক করেছে। নায়েব জমিদারকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ‘ঐ, মালিক আজ নিজে উপস্থিত, ওঁকে সব বল। আমার হাতে কিছু নাই।’ আজ কর্তা এসেছেন তাই নায়েবের কোন কর্তৃত্ব নাই। ঠিক এইরূপ ঈশ্বরদর্শন হলে বোঝা যায় ঈশ্বরই কর্তা, মানুষ অকর্তা। যতদিন তা না হয় মনে হয় যেন স্বতন্ত্র। সাক্ষাৎ হলে দেখতে পায় সব পরতন্ত্র — ঈশ্বরের অধীন। ‘আমি’ খুঁজে পাওয়া যায় না — যেমন ঠাকুরের হয়েছিল। ওদেশের লোকেদের ঈশ্বর কি বস্তু তারই জ্ঞান নাই। এ সব বুঝবে কি করে।

বড় জিতেন — ঈশ্বর কি মায়ার অধীন হয়ে জগৎলীলা করেন?

মায়া কি ঈশ্বরের চাইতে বড়?

শ্রীম — অত সব বড় বড় কথায় কাজ কি? আমাদের কাজ হচ্ছে 'যদু মল্লিকের সঙ্গে দেখা করা'। যদু মল্লিকের দেখা পেলে তখন জানতে পারা যাবে। এখন দেখা হয় কিসে তারই চেষ্টা করা। যদু মল্লিক মানে ঈশ্বর। হাটের ভিতর ঢুকলে তখন সব দেখা যায়, বোঝা যায়। দূর থেকে খালি 'হো-হো' শব্দ। ভিতরে ঢোকার চেষ্টা চাই। শুধু কি তাই বলেছেন, উপায়ও বলে দিয়েছেন। এক দিন, তিন দিন, সাত দিন অথবা এক মাস — যার যেমন সুবিধা হয়, মাঝে মাঝে গিয়ে নির্জনবাস করতে বলেছেন। নির্জনে থেকে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করা — 'তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই, প্রভো। দর্শন দিয়ে কৃতার্থ কর।' (জনৈকের প্রতি সহাস্যে) তা বলে ভগ্নীপতির বাড়ি যাওয়া নয়। এখন অবতার এসেছেন, বড্ড chance (সুযোগ)। পথ খুব সোজা হয়ে গেছে। তিনি যা বলে গেছেন শুধু তা করলেই হয়। অমুক শাস্ত্র পড়া, অমুক যজ্ঞ করা — এ সবের দরকার নেই। কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা। আন্তরিক হলে তিনি সব শুনতে পান। ছেলে কাঁদছে এক ঘন্টা ধরে। মা দোর বন্ধ করে ভিতরে কাজ করছে। যেই দেখলে আছাড়-পিছাড় খাচ্ছে, অমনি কাজ ফেলে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিল। ঈশ্বরও ঠিক এইরূপ করেন। তিনি চান, আমার জন্য লোক কাঁদুক।

অবতার যা বলে গেছেন এ সব আমাদের শোনা উচিত। এ সব হলো revelation (পরম জ্ঞান)। এ নিয়তই হচ্ছে। আমাদের দেশে — বেদব্যাস মাত্র কয়েকখানা সঙ্কলন করেছেন। এর আগেও ছিল, পরেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে — 'Before Abraham was I am' ঋষিদের মুখ দিয়ে যা বের হয়েছে, অবতার যা বলেন, এ সবই revelation (প্রত্যাদেশ)। ঈশ্বর অনন্ত, বেদও অনন্ত। বেদ তাঁ'র বাণী তাই আবার অপৌরুষেয়। বেদ ছাড়া ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় হয় না। এক জিনিসকেই কেউ বলেছে 'noumena' ('নুমিনা'), স্পিনোজা (spinoza) বলেন 'substantia' ('সাবস্টেনসিয়া), বেদান্ত বলে 'ব্রহ্ম'।

এই সংসারটা তাঁর খেলা। তাঁর সাধ হয় খেলার। তিনি করেছেন, তিনিই সব হয়েছেন, আবার তিনিই এর থেকে বের করে নিয়ে যান — এই গোলকধাঁধা থেকে। তাঁর আহ্লাদ হয়, ছেলেরা আমায় ডাকুক, যেমন বাপ মায়ের হয়। তাঁর দুটো ডিপার্টমেন্ট — যোগ ও ভোগ। সবাইকে তিনি দেখেন। যোগীরা কেবল তাঁকে চায়। তাদের জন্য অবতারের আগমন। এসে বলেছেন, 'আমায় চিন্তা কর আন্তরিক, তাহলেই আমায় পাবে।' যারা ভোগ ডিপার্টমেন্টের তাদেরও ছাড়েন না। শুনতে পাওয়া যায় মল্লিকদের সিংহবাহিনীর আদেশের কথা। অষ্টমীর দিনে বাড়ির সকলে, চাকররা শুদ্ধ, নূতন কাপড় পরে মায়ের সামনে যাবে। মায়ের এই সাধ! আজও করে তারা। এরা ভোগ ডিপার্টমেন্টের হলেও মা ছাড়েন না। ভোগান্ত না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

জনৈক ভক্ত — কখনও খুব ব্যাকুলতা হয়, কখনও একবারেই থাকে না — এরূপ হয় কেন?

শ্রীম — সাধুসঙ্গের দরকার। মন স্থির হচ্ছে না। ঐটি করলে আর ওরূপ হবে না। নিত্য করা উচিত। নেহাৎ না হয়ে উঠলে রোজ অবসর করে নিত্য তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করা উচিত। রূপ, মহাবাক্য, জীবন চরিত — সবই তাঁর ধ্যানের বিষয়। কথাটা হচ্ছে, নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত যোগে থাকা। যোগী মানে যিনি মনকে বশীভূত করেছেন। মন যাঁর বশ, যিনি মনের বশ নন। 'In the world but not of the world' — জ্যান্তে মরা।

১৪ই জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

আজ রথযাত্রা। শ্রীম রথ দেখিতে গিয়াছিলেন। আজও গগন বিশ্বাস আসিয়াছেন। বিক্রমপুর হইতে একজন ডাক্তার আসিয়াছেন। ভক্ত-পরিবৃত হইয়া শ্রীম দ্বিতল গৃহে বসা। ধ্যানান্তে রমণী গাহিতেছেন।

গান। যার মনে লেগেছে যারে ভাল, তারা ভজুক তারে গো।
মোর মনে লেগেছে কেবল শচীর দুলাল গোরা গো॥

গগন (শ্রীম-র প্রতি) — বাবা, কর্তা, গুরু বললে ঠাকুর রেগে যেতেন কেন?

শ্রীম — শিষ্যদের শিক্ষার জন্য। তিনি ঐ সব গ্রহণ করলে রক্ষা ছিল! সকলেই গুরুগিরি আরম্ভ করে দিত। বলতেন, গুরু কেবল সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর। তিনি বৈ আর গুরু নাই।

গগন — আচ্ছা, মায়াবাদীরা জগৎটাকে মায়া বলেন, এ কেমন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা বুঝে উঠতে পারি না।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, ওসব কথায় কাজ কি? তাঁকে কিসে লাভ হয়, সেই চেষ্টা আগে করা উচিত। নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বললে তিনি দেখা দেন। তখন সব বোঝা যায়। বিজয়বাবু ব্রাহ্মসমাজের লোক, প্রথম প্রথম বলতেন, ঈশ্বর সাকার এ কি করে হয়? ঠাকুর শুনে উত্তর করলেন, 'তোমার অত কথায় কাজ কি। তুমি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকো। বল — প্রভু, তুমি যেভাবেই থাক আমায় দেখা দাও। তখন সব জানতে পারবে।'

ঠাকুর তাঁকে দর্শন করেছিলেন। বলতেন, 'ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আরো কত কি।' একটি বহুরূপীর গল্প বলতেন। একস্থানে একজন বাহ্যে গেছে, দেখছে সামনে গাছে গিরগিটি — রং লাল। আর একজন এসে বললে সেটা সবুজ। নীল, পীত, লাল — মত নিয়ে সকলে ঝগড়া আরম্ভ করে দিলে। তারপর ঐ গাছতলায় থাকে এমন একটি লোকের সঙ্গে দেখা হলে সে বললে, ওটা বহুরূপী। কখনও লাল, কখনও সবুজ, নীল, পীত নানা রং ধরে। তেমনি ঈশ্বর।

এ সব তত্ত্ব শুধু বিচার করে বোঝা যায় না। তিনি বুঝিয়ে দিলে তখন হয়। তার জন্য তপস্যা চাই। শুধু বিদ্যা বা বুদ্ধির বিষয় নন তিনি। তা'হলে ত পণ্ডিতদের — বি.এ., এম.এ.-দের একচেটে হয়ে যেতো ঈশ্বরতত্ত্ব। কিন্তু তা নয়। শুধু পাণ্ডিত্যে তাঁকে লাভ হয় না। বিবেক বৈরাগ্য চাই। এ থাকলে তপস্যা করতে ইচ্ছা হয়। তপস্যার দ্বারা ভোগান্ত হলে তখন তাঁর দিকে সম্পূর্ণ মন যায়। ছুঁচের ভিতরে সুতো যাচ্ছে। যেই একটা ফেশো এলো, আর যাচ্ছে না। এমনি

ঈশ্বরদর্শন। এক বিন্দু ভোগবাসনা থাকলে আর হলো না। ক্রাইস্ট একটি ভক্তকে বলেছিলেন, বিষয়-সম্পত্তি সব দান করে চলে এস, আমার কাছে থাকতে হলে। লোকটি পারলে না, গালে হাত দিয়ে বসে রইল। 'The Son of man hath not where to lay his head,' (St. Matthew 8:20) — ক্রাইস্ট সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন তাঁর জন্য, তবে তাঁকে জেনেছিলেন।

যাঁদের ঈশ্বর ভালবাসেন — যাঁরা Sons of God (ঈশ্বরের সন্তান), তাঁদের তিনি ভোগে আবদ্ধ করেন না। বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, 'ডালভাত হতে পারে এর বেশী নয়।' পাণ্ডবদের দেখুন, এতো ঐশ্বর্যের ভিতরে থেকেও ভিতর ফাঁক্। যেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান হলো অমনি এঁরাও রাজ্য ছেড়ে মহাপ্রস্থান করলেন। কই, রাজ্য করবার জন্য তো ওঁরা রইলেন না। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এঁরা যুদ্ধ, রাজ্য এ সব করলেন। এত কাণ্ড করালেন এদের দিয়ে, নজীর রাখার জন্য। রাজ্য গেল, ছেলেরা গেল, কত দুঃখ কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে আছে সব।

তপস্যা করলে ভোগ কমে। পিপ্পলাদ ঋষি তাই বলেছিলেন, এক বছর তপস্যা করে এসো, তখন বলবো এ সব কথার জবাব। তা না হলে প্রশ্নই ঠিক হয় না। উত্তর বুঝবে কি? প্রশ্ন করতে হলেও তপস্যার দরকার। তপস্যা মানে নির্জনে বসে জীবন-মরণের চিন্তা করা — সঙ্গে বাড়ির কেউ থাকবে না। কেউ হয়তো রেঁধে দিলো। কিংবা নিজেই রেঁধে নিলে। আর সারাদিন বসে 'রাম রাম' করা। দিনকয়েক করলেই অনেকটা বোঝা যায়, কোথায় আছি আর যেতে হবে কোথায়!

বিক্রমপুরের ডাক্তার — আচ্ছা, দীক্ষার প্রয়োজন আছে কি?

শ্রীম — ঠাকুর কারুকে কারুকে দীক্ষা নিতে বলতেন। আবার কারো কারো আধার এমনি, ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণা অমনি হয়।

বিক্রমপুরের ডাক্তার — আপনি দীক্ষা নিয়েছেন কি?

শ্রীম — ওসব কথা বলতে নাই। এর দাম টাকাটা-সিকেটা নয়। এ হলো অমূল্য ধন। এতে অমৃতত্ত্ব লাভ হয়। এসব গোপনে রাখতে

হয়।

গগন — 'কথামৃত' পড়ে মনে হয়, আপনি সর্বদা ওঁর সঙ্গে থাকতেন।

শ্রীম — না। তবে তিনি বলতেন, 'অমৃত সাগরের এক কণা খেলেও অমর হয়, আর কলসী কলসী খেলেও অমর হয়', এই ভরসা। আমরা তাঁর এক কণা মাত্র রাখতে চেষ্টা করেছি। তাঁর কথা লিখে শেষ করা যায় না — সেণ্ট জন বলেছিলেন।

বিক্রমপুরের ডাক্তার — শরৎ মহারাজও আমায় বলেছেন, ঠাকুরকে ধরে থাকলে ভয় নাই। আপনার কথাও তাই।

শ্রীম — না, না, এ আমাদের কথা নয়। তাঁর কথা। তিনি বলেছেন, 'আমাকে চিন্তা কর। আর কিছু করতে হবে না।' আমাদের কথার মূল্য কি? এ তাঁর মহাবাক্য।

অবতারকে কেউ চিনতে পারে না তিনি না চেনালে। তিনি যুগে যুগে আসেন। ভাবহীন যাগযজ্ঞ যখন হচ্ছিল শুধু, তখন শ্রীকৃষ্ণ এলেন। এসে বেদের প্রকৃত অর্থ interpret (ব্যাখ্যা) করলেন গীতামুখে। নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ কত কি উপদেশ দিলেন। আবার সাধুদের উদ্ধার করলেন। এটি তাঁর প্রধান কাজ। এই যে ঠাকুর এসেছেন, এও সাধুদের উদ্ধার করতে এসেছেন। সাধুরা যখন বিপথে চালিত হন, তখন তিনি নিজে আসেন এঁদের তুলে নিতে।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪:৮)

শ্রীম (গগনবাবুর প্রতি) — ভোগ ছাড়, একথা সংসারীদের কাছে ভাল লাগে না। গুরু যদি বলেন, ঈশ্বরের জন্য সব ছাড়, অমনি বলে, এ কি রকম গুরু, সব ছাড়তে বলছেন! যদি কেউ বলে, তোমার অর্থ ও পুত্র লাভ হবে, সে আদর পায়। ঠাকুর দেখতেন, ভক্তদের কিসে ভগবান লাভ হয় — পরম ধনের অধিকারী হয়। অন্য কথা নাই। কি হবে পুত্র-বিত্তে? মৃত্যু যে সম্মুখে দণ্ডায়মান!

কলিকাতায় একটি অনাথ আশ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেকগুলি বালক মারা যায়। এই কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীম বলিতেছেন —

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাঁর কাজ আমরা মানুষ কি বুঝবো? উপর উপর দেখে তাঁর কাজের বিচার চলে না। এই দেখুন না, এতিমখানা (Orphanage) ভেঙ্গে গিয়ে এক কোপে তেতাল্লিশ জনকে নিয়ে গেল — এক হাড়িকাঠে। নিষ্পাপ শিশু সব, পাঁচ বার নামাজ পড়তো। লোকে ভাবে, ঈশ্বরের কি অবিচার! আমরা তাঁর কাজের কতটা দেখতে পাই, কি-ই বা বুঝি! ১৮৮৫ সালের বন্যায় অনেক লোক মারা গেল। অনেকে বলতে লাগলো, ঈশ্বরের কি অবিচার! শুনে ঠাকুর উত্তর করলেন, 'আচ্ছা, তিনি যদি এদের আরো ভালো স্থানে নিয়ে গিয়ে থাকেন?' সকলে চুপ এক কথাতেই। ঈশ্বরের কাজ বোঝা যায় না।

এই যে কাণ্ডটা হলো, এতে কত শিক্ষা লাভ হচ্ছে। প্রথম, এরা সব নিষ্পাপ, হয়তো এদের নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয়, লোকের সব চৈতন্য হলো, পুরান বাড়ি সব repair (সংস্কার) করতে লাগলো। কর্পোরেশন, গভর্ণমেন্ট সকলের দৃষ্টি এখন এ দিকে। তৃতীয়, ভক্তরা শিখবে, দেহ কখন চলে যেতে পারে। তাই তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে আরম্ভ করবে। সংসার একটা মহাশ্মশান। চতুর্থ, যাদের একটি ছেলে মারা যায় তারা শোক থেকে বিরত হবে। এক সঙ্গে তেতাল্লিশ জন গেল, তাদের জন্য কে কাঁদছে? আর আমরা একটির জন্য এত কাঁদছি — এ সান্ত্বনা এদের আসবে।

তাই ঈশ্বরের কাজে remark (মন্তব্য) করা উচিত নয়। আমরা উপর উপর একটু দেখতে পাই। কিছু বলতে হলে পূর্বাপর সব দেখে বলা উচিত। ঈশ্বরের কাজের পূর্বাপর এক তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তাই বিচার অনুচিত। একজন লিখেছেন, world-টা (জগৎ) একটা light (আলো) — সার্জেণ্ট গুপ্তির মত। সার্জেন্ট সব দেখছে, আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। ঘুরিয়ে নিজের দিকে ধরলে তখন তাকে দেখা যায়। তেমনি তিনি বোঝালে তাঁর কাজ বোঝা যায়। মানুষের কর্ম নয় তাঁর কাজ বোঝা!

১৫ই জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৪

আজও রথ। আজও গগন বিশ্বাস ইঞ্জিনীয়ার আসিয়াছেন। শ্রীম ভক্তসঙ্গে দোতলার ঘরে বসা। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে, 'রথযাত্রা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গে পণ্ডিত শশধরের মিলন'। পণ্ডিতকে উপদেশ দিতেছেন —

'কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি'।

'যে পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই সে পণ্ডিতই নয়।'

'ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না।'

'তাই বলছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও।' এইবার শ্রীম মোহনকে একটি গান গাহিতে বলিলেন। মোহনের ভাল জানা না থাকায় শ্রীম নিজে মত্ত হইয়া গাহিতে লাগিলেন,

'ডুব ডুব ডুব রূপসায়রে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্ন ধন।'

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর কেশব সেনকে এই গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। পণ্ডিত শশধরকেও শুনালেন। মানে ওঁরা খুব লেকচার দিতেন কিনা। তাই বললেন, আগে তপস্যা করে কিছু সঞ্চয় করে নাও! তখন লেকচার দিলে লোকে শুনবে। আদেশ না পেলে কে শুনে? ঈশ্বরের আদেশ নিয়ে কথা কইলে তখন লোকের হৃদয়ে বসে যায়। দেখুন কাদের এই উপদেশ দিচ্ছেন, যাঁরা সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি — সকলে যাঁদের মানে। শুধু কি তাঁদেরই বলেছেন, 'ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও' — সকলকেই বলেছেন। উপলক্ষ এঁরা। এঁরা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এদের বললেই সকলকে বলা হলো।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে পুনরায় ভজন গাহিতেছেন।

গান। চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপমভাতি মোহন মূরতি ভকত হৃদয় রঞ্জন॥

গান। চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে॥

গান। মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।

গান। গয়া-গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥

গান। ভবদারা ভয়হরা নাম নিয়েছি তোমার।

ভজন শেষ হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ৯টা। পুনরায় কথামৃত পাঠ হইতেছে। 'বলরাম মন্দিরে পুনর্যাত্রা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ'। জগবন্ধু পড়িতেছেন, 'এই নালার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোনও ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবে পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থায় মরা মারা এক মনে হয়। পূর্ণ জ্ঞানী মরেনও না কেউ মারলে, আর মারেনও না কাউকে মারলে। স্বতন্ত্র অভিমান নাই। জগদাত্মার সঙ্গে এক জ্ঞান হয়ে গেছে। তাই গীতায় আছে —

'ন হন্ততে হন্যমানে শরীরে'(গীতা ২:২০)। এই কথাটা খুব মনে উঠছিল এই কয় দিন — তেতাল্লিশ জন বালকের মৃত্যুর পর।

পাঠক (পড়িতেছেন) — 'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, কিছু তপস্যার দরকার। কিছু সাধ্যসাধনা দরকার।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তপস্যা মানে গুরুমুখে, শাস্ত্রমুখে যা শোনা গেছে তার মনন করা। তারপর একান্তে বসে তার নিদিধ্যাসন। তবে তো ভাব পরিপক্ক হবে। মনটাকে দশ ইন্দ্রিয় দশ দিকে বিষয়েতে টানছে। তাকে ঈশ্বরমুখীন করতে হবে — উল্টো পথে নিতে হবে। অত সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের মধ্য থেকে এটি হতে পারে না। তাই একান্তে বসে ঐ চিন্তা করা। মনন যখন পাকা হয়ে যায়, তখন জ্ঞান-ভক্তিলাভ হয়। তখন এসে সংসারে থাকা। তা হলে আর অনিষ্ট হয় না। চারা গাছকে বড় করা, গুঁড়ি মোটা করা। তখন হাতি বাঁধলেও ক্ষতি হয় না। এরই নাম তপস্যা — গুঁড়ি মোটা করা।

পাঠক (পড়িতেছেন) — জ্ঞানের চিহ্ন প্রথম শান্ত স্বভাব, দ্বিতীয় অভিমানশূন্য স্বভাব। জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী; কর্মস্থলে, যেমন লেকচার দিবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে।

জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হলে বিজ্ঞানী। পরমহংস অবস্থা। সে অবস্থায় বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ ও পিশাচবৎ হয়। যেমন চৈতন্যদেব, যেমন ঠাকুর। একদিন বাহ্য করতে এসেছেন, সামনে একটা কুল পেলেন, অমনি খেতে লাগলেন — বালকবৎ। (জনৈক ভক্তের প্রতি) — শুনছেন, ঠাকুর বলছেন, 'সর্বদা স্মরণ মনন থাকা উচিত'। আর 'জ্বলন্ত বিশ্বাস' — 'কি, একবার রামনাম করেছি আমার আবার পাপ!'

১৬ই জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৫

আজ বেলুড় মঠ হইতে দুইজন সাধু আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদের বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে আমহার্স্ট স্ট্রীটে বি.এম.এস. কলেজের সামনে আসিয়া পড়িলেন। ফিরিবার মুখে মেছুয়াবাজারের মোড়ে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর বাড়িতে ঢুকিয়া, দুই চারিটি কথা বলিয়া পুনরায় মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিলেন। এখন অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টা। ভক্ত সমাগম হইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। ধ্যানান্তে একটি ভক্ত গাহিতেছেন, 'রামকৃষ্ণ চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।' গানটি শেষ হইলে শ্রীম বলিলেন, 'মা ত্বং হি তারা' এটি হউক। ভক্তরা সকলে গাহিতেছেন —

মা ত্বং হি তারা তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি ও মা দীন দয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥

গান শেষ হইলে গগন বিশ্বাস প্রশ্ন করিতেছেন।

গগন (শ্রীম-র প্রতি) — আচ্ছা, নিরাকার সাধন কিরূপ?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, যেমন খুব বড় একটা দিঘিতে মাছ ভাসছে। অথবা অনন্ত আকাশে পাখি উড়ছে। পরমাত্মা-সাগরে জীবাত্মা ভাসছে।

গগন — ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ।

শ্রীম — না, ঠাকুর যে এরূপ বলতেন এর মানে আছে। তিনি বলেছিলেন, ধ্যানট্যান কিজন্য? না, তাঁর উদ্দীপন হবে বলে। এ সবে

তো কিছু নাই, তাঁর উদ্দীপন করে বলে এ সবের প্রয়োজন। বলতেন, পাথরকেও যদি ঈশ্বর মনে করে ধ্যান করে, তবে তিনি দেখা দেন। আর বলে দেন, এই সব। কিন্তু আন্তরিক হওয়া চাই।

গগন — ধ্যান করতে বসলে মন স্থির হয় কৈ? কত কথা উঠে।

শ্রীম — তা উঠবে না! ছিচ্ আছে যে। মাঠে দুটো গর্ত, একটার জল শুকিয়ে গেল আর একটাতে রয়ে গেল, কেন? না, এটার ফিডার আছে — মাটির নিচ দিয়ে ছিচ্ আছে। কোনও নদী-টদী থেকে জল আসছে। বিষয়ের ভিতর দিনরাত থাকায় মনেও ঐ সবের ছিচ্ আসছে। তাই নানা কথা উঠে। তাই ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে নির্জনে গোপনে তাঁকে ডাকবে। ভেবে দেখুন না, সারাটা জীবন কি করে আসছি আমরা। এর ভিতর বসে তাঁকে ডাকলে এগুলি তো মনে আসবেই। তাই মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অর্থের জন্য যারা তাঁকে ডাকে তারাও উদার। চার থাকের ভক্ত আছে — আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এরা সকলেই উদার। কিন্তু জ্ঞানীতে তাঁর প্রকাশ বেশী। জ্ঞানী মানে যার আত্মদর্শন হয়েছে, কিংবা দর্শনের জন্য ব্যাকুল — দৃঢ় বিশ্বাসী জন। ভগবান জ্ঞানীকে নিজের স্বরূপ বলেছেন — ‘জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্’ (গীতা ৭:১৮)। এই জন্য জ্ঞানীর সঙ্গ ও সেবা করা উচিত। কারণ ইহাতে ঈশ্বরেরই সঙ্গ ও সেবা করা হয়। তবে মন স্থির হয় — নানা কথা উঠে না।

মথুরবাবুর পঞ্চাশ হাজার টাকার কেস্ চলছে কোর্টে। তিনি ঠাকুরকে বললেন, ‘বাবা, তুমি মাকে এই অর্ঘ্যটি একবার দাও না’। ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন। পরে একজন ভক্ত বললেন, ‘কি ছোট মন মথুরবাবুর’। ঠাকুর বললেন, ‘না, তা নয়। আমি দিলেই কাজ হবে — দেখ, কি বিশ্বাস!’

শ্রীম (গগনের প্রতি) — বেশী কাজকর্মে জড়াতে নেই। কিছু হলো, তো পেটের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন বসে বসে ‘রাম রাম’ কর। দু’ একটি সন্তান হলো, আর না। এখন ভাই বোনের মত

বাস কর স্বামীস্ত্রীতে। এই সব উপায় ঠাকুর বলতেন। দেখুন না, যদুপতিবাবু এমন ভক্ত, কিন্তু বেশী বিষয়চিন্তা করতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল, আর তাতেই শরীর গেল। অত বিষয় সবই পড়ে আছে। তাই ঠাকুর বলতেন, বেশী জড়িও না। অন্নবস্ত্রের যোগাড় করে — পরিবারের মোটা ভাত, মোটা কাপড় হতে পারে — এমনতর ব্যবস্থা করে সরে পড়। একটু ঈশ্বরচিন্তা কর। একটু তপস্যা কর।

শ্রীম — ঋষিদের কাছে প্রশ্ন করতে গেলে বলতেন, আগে এক বছর তপস্যা করে এসো। তপস্যা না করলে প্রশ্নই ঠিক হয় না, নিজের সংশয় কি, তাই ঠিক বুঝতে পারে না।

গগন — পিপ্পলাদ ঋষি বলেছিলেন, তপস্যা করে এসো। তারপর প্রশ্ন কর।

শ্রীম — হাঁ। তাই তপস্যার দরকার। নির্জনে বসে ঈশ্বরচিন্তা করা।

এইবার কথামৃত পাঠ হইতেছে। জগবন্ধু পড়িতেছেন — 'গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইতো না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে, ঈশ্বরকে সম্ভোগ করতে চাইতো।'

শ্রীম — কাশীপুর বাগানে ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই শরীরটাতে একজন ভক্ত আর একজন ঈশ্বর আছেন। ভক্তেরই ক্যানসার হয়েছে।'

অমৃত — দু'জন কেন?

শ্রীম — রস আস্বাদনের জন্য — লীলার জন্য। রাধাকৃষ্ণ — রাধা কৃষ্ণেরই অপরাংশ। এই রস আস্বাদনের জন্য দু'ভাগ হয়েছেন। ১৭ই জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৬

আজ ধ্যানান্তে শ্রীম জগবন্ধুকে 'কথামৃত' পড়িতে বলিলেন। দ্বিতীয় ভাগ, ঊনবিংশ খণ্ড নিজে বাহির করিয়া দিলেন। শুকলাল আগ্রহ

প্রকাশ করায় শেষে তিনি পড়িতে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (জনৈকের প্রতি) — যাদের কুমার বৈরাগ্য তারা একটি আলাদা থাক্। নৈকষ্য কুলীন। উঁচু ঘর, অতি শুদ্ধ ভাব। মেয়েমানুষের সংস্পর্শে এ ভাব নষ্ট হয়ে যায়, নেমে যায়। তাই সাধকের অবস্থায় অতি সাবধান মেয়েদের কাছ থেকে। স্ত্রীলোক জগন্মাতার অংশ। কিন্তু সাধকের অবস্থায় 'কালসাপ, ডাকিনী, বাঘিনী, দাবানল' বলেছেন। কখন খপ্ করে খেয়ে ফেলে। তাই সাবধান। ঈশ্বরদর্শন হলে তখন দেখে জগন্মাতা। স্ত্রীলোক সাধিকার পক্ষেও পুরুষ ঐরূপ — সাবধান। এই জন্য বলতেন, যারা বিয়ে করেছে, দুই একটি সন্তান হয়ে গেলে আর এক বিছানায় শোবে না। দেখুন, বলছেন ভগবানদর্শনের পর বেশী ভয় নেই। মানে, তখনও ভয় থাকে। তাই বলছেন অনেকটা নির্ভয়। যতদিন শরীর থাকে মহামায়া ফেলে দিতে পারেন। তবে যদি মায়ের কোলের শিশু হওয়া যায় — যেমন ঠাকুর, তবে রক্ষা। কিন্তু এ অবস্থা অবতারাদি ছাড়া প্রায় হয় না কারো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সাধন চাই। সাধন না করলে সচরাচর হয় না। সাধন মানে, নানা জিনিস থেকে মনটাকে কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগানো। একেই ভক্তি বলে। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বলতেন, ভক্তিই সার।

১৮ই জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৭

আজ হীরালাল বিশ্বাস আসিয়াছেন। ইনি সুগায়ক — রেকর্ডে তাঁহার গান আছে। বয়স সাতান্ন — শ্রীম-র প্রাক্তন ছাত্র। রিপন কলেজে পড়িতেন। সরকারী কর্ম করেন, অসুস্থ হইলেও একটি গান গাহিয়া শুনাইলেন। শ্রীমও নিজে গাহিলেন, 'চল গুরু দু'জনে যাই পারে, আমার একলা যেতে ভয় করে।' গান শেষ হইলে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (হীরালালের প্রতি) — আহা, আপনি এসেছেন অসুস্থ শরীরে কষ্ট করে! আপনাকে কি দিয়ে আদর করবো? তাঁর কথা উপহার দেওয়া যাক। ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, ‘তোমার জপ-ধ্যানের দরকার নাই। গান গেয়ে তাঁকে ডাকলেই দেখা দিবেন।’ শুধু বই পড়লে কি হয়? ধারণা চাই। সাধুসঙ্গ করলে ধারণা হয়। আর ‘গুরুবাক্যে বিশ্বাস’। ‘সংসার সমুদ্রে গুরুবাক্য ভেলা’ — একদিন দুপুর বেলা একজনকে এই কথা বলেছিলেন। গুরু মানে অবতার, ঈশ্বর।

কথামৃত পাঠ হইতেছে — দ্বিতীয় ভাগ, উনবিংশ খণ্ড। শ্রীম কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ‘ইনি জ্ঞানী’ — শুধু বললেই হয় না। তার লক্ষণ আছে। প্রথম — ঈশ্বরে অনুরাগ, দ্বিতীয় — কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, শুধু বসে বিচার করছে, এতে হয় না। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে ভাব ভক্তি প্রেম হয়। ঠাকুর একে ভক্তিযোগ বলতেন। নিক্তির কাঁটা যোগের দৃষ্টান্ত। উপরের কাঁটা আর নিচের কাঁটা সমান হয়ে যাবে। আর দীপশিখা, এও দৃষ্টান্ত। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা। মন একেবারে স্থির হয়ে যাবে। ঈশ্বরে লীন হয়ে যাবে। এইটে মানুষের normal state (স্বরূপ)। ভোগবাসনায় যোগভ্রষ্ট ক’রে দেয়। এক একবার বলতেন, ‘সংসারে আছ থাকলেই বা, কিন্তু কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দাও।’ তা’হলে সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী। খুব কঠিন পথ; বলতেন, তবে তাঁর কৃপায় কেহ কেহ এরূপ হয়।

কলিকাতা, ১৯শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ, বৃহস্পতিবার।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম

১

মর্টন স্কুল। সন্ধ্যার পর ধ্যানান্তে শ্রীম গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম'। ভক্তগণ মেঝেতে উপবিষ্ট। কিছুকাল ভজনের পর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর এক সময়ে এই রাম নাম করে ক'রে পাগলের ন্যায় হ'য়ে গিছলেন। পঞ্চবটীতে বসে কাঁদতেন।

আমরা হৃষিকেশে ছিলাম। বছর দশেক আগের কথা। তখন লছমনঝোলায় একটি মহারাষ্ট্রীয় সাধু থাকতেন। বয়স ত্রিশ বৎসর হবে, খুব ভাল সাধু। সঙ্গে নারায়ণ শিলা। রোজ ভোগ লাগিয়ে পাঠ করে, তবে খাবেন। আমাদের সঙ্গে আলাপ ছিল — তাই মাঝে মাঝে আবার প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন, যেমন হয়ে থাকে সাধুদের। আমরা তখন স্বর্গাশ্রমে। বছরখানেক পরে আমরা তখন কলিকাতায়। আর একটি মহারাষ্ট্রীয় সাধুর মুখে শুনলাম, ঐ সাধুটি গোদাবরী-তীরে কুটির নির্মাণ করে, 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম' এই মহামন্ত্র জপ করছেন। তের বৎসর এই জপব্রত পালন করবেন। তেরটা অক্ষর কিনা, তাই তের বৎসর। এমন সাধুও আছে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকছে।

এতক্ষণে শুকলাল, ডাক্তার, বড় জিতেন, বিনয়, জগবন্ধু, কিরণ, ছোট জিতেন, শচী, অমৃত, মনোরঞ্জন, সুধীর, রমেশ, ছোট অমূল্য, গদাধর প্রভৃতি আসিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আপনারা সকলে করুন না এই নাম। এই বলিয়া শ্রীম নিজে ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও গাহিতেছেন — 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।' ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতেছে।

কিছুক্ষণ নাম হইতেছে, আবার অল্পক্ষণ শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন, আবার নাম। এইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে লাগিল। ভক্তগণ সব ভুলিয়া, মত্ত হইয়া রাম নাম করিতে লাগিলেন। মর্টনের দ্বিতল গৃহে আজ অপূর্ব স্বর্গীয় ভাবপ্রবাহ চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পাঠ কিছুতেই কিছু হয় না, তপস্যায়ও হয় না তাঁর কৃপা না হলে। কৃপা হয় যখন দেখেন, সব ছেড়ে কষ্ট ক'রে তাঁকে ডাকছে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে, তখন দেখা দেন। বলতেন, আন্তরিক হ'লে দেখা দেবেনই দেবেন।

উচ্চ কণ্ঠে সকলে গাহিতেছেন — 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।' আবার থামিল। আবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই রাম নাম, ঠাকুর বলেছিলেন, স্বয়ং মহাদেব মণিকর্ণিকায় মুমূর্ষুদের কর্ণে দেন। তিনি দেখেছিলেন, শিবকে এইরূপ করতে। (সাগ্রহে ভক্তদের প্রতি) — গান ঐ নাম আপনারা, গান।

ভক্তসঙ্গে শ্রীম গাহিতেছেন, 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম'। কিছুকাল পর পুনরায় শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর ধ্রুবচরিত অভিনয় দেখতে গিছলেন। সুনীতির কান্না দেখে বলেছিলেন, 'এখানে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি — আন্তরিক হলে দেখা দেবেনই দেবেন, দেবেনই দেবেন।' দু'বার বললেন তার মানে নিশ্চয়ই দেখা দেবেন। আন্তরিক হওয়া চাই। কেঁদে কেঁদে নির্জনে গোপনে — সাইনবোর্ড মেরে নয়। কেমন, যেন বিড়াল-ছানা। মা বৈ কিছু জানে না। খালি 'মিউ মিউ' করছে। মা জানে সব। কখনও ভাল জায়গায় রাখছে কখনও খারাপ। যেখানে রাখে সেখান থেকেই কেবল 'মিউ মিউ'। এমনি আন্তরিক হলে হবে। অথবা বৎস যেমন গাভীর জন্য ডাকে। এমন করে ডাকলে তবে হয়। এই সাধুটিও তাই করছেন। আজও এমন লোক আছে! কি কঠোর তপস্যা! সব সময় 'রাম রাম'। এমন লোকের কথা মনে হলে, মনে কত জোর হয়! এ ভারতে আজও

এমন হচ্ছে।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে পুনরায় উচ্চ কণ্ঠে গাহিতেছেন, 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম' — আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, যাঁকে বেদে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলে আমি তাঁকেই 'মা মা' বলছি। তাঁকেই 'রাম রাম' বলছি। বিবেকানন্দ প্রথম জ্ঞানমার্গী ছিলেন কি না!

শ্রীম ভক্তসঙ্গে আবার গাহিতেছেন — 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম'। আবার উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অধ্যাত্মে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) আছে শরভঙ্গ ঋষি ও সিদ্ধ শবরী শ্রমণার কথা। রামের সম্মুখে এঁরা দেহত্যাগ করেছিলেন! দু'জনে দুই কুটীরে বসে দিবানিশি 'রাম রাম' জপ করছেন। শবরী ঋষিদের সেবা করেছিলেন তাই তাঁর উপর ঋষিদের কৃপা হয়েছে। তাই 'রাম রাম' এই মহামন্ত্র জপ করছেন। বনবাসকালে রাম ঐ আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত। রামকে উভয়ে পূজা করলেন। চলে আসছেন, তখন শরভঙ্গ বললেন, 'রাম, একটু অপেক্ষা কর। তোমার সামনেই এই বৃদ্ধ দেহ ত্যাগ করি!' শ্রমণা ব্যাধকন্যা রামকে ফলমূল খাওয়ালেন। রোজ রামের জন্য ফল তুলে রাখতেন। তাজা ছিল সব ফল। তিনিও শেষে রামের সামনে দেহ রাখলেন। ঐ মহারাষ্ট্রীয় সাধুটি অমন করছেন। শুনতে পাই, ঈশ্বরের জন্য অনশনে প্রাণত্যাগ করে কেউ কেউ। মহেশ বীণকার তাই করেছিলেন। ইনি বীণাযন্ত্রে ঠাকুরকে গান শুনিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে দেখতে গিছলাম। কাশীতে থাকতেন। বীণার দাম দু'হাজার টাকা। সেই বীণাতে ঠাকুরকে যে গান শুনিয়েছিলেন, সেই রাগিণী আমাদের শুনালেন — কানাড়া।

ডাক্তার — আচ্ছা, এতে অপমৃত্যু হয় না?

শ্রীম — না। জ্ঞানের পর হয় না। দেওঘরে গিয়ে একজন প্রাণত্যাগ করেছিলেন। ইনি (গোপাল সেন) ঠাকুরের কাছে আসতেন। বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যা করলেন। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, ভগবানদর্শন হয়ে গেলে দোষ নাই। তিনি

ভগবানকে অর্থাৎ ঠাকুরকে দেখেছিলেন কিনা, তাই দোষ নাই। (ভক্তদের প্রতি) — গান, গান আপনারা। এই বলিয়া শ্রীম মত্ত হইয়া ভক্তসঙ্গে গাহিতে লাগিলেন — 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।'

ঈশ্বরীয় কথা, তারপরই রাম নাম, উপদেশ ও অভ্যাস একসঙ্গে অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল। এই মণিকাঞ্চন সংযোগ, স্থান-কাল গুলাইয়া দিল। ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ সঞ্চারিত হইল। শ্রীম পুনরায় উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তপস্যা চাই। তা নইলে হয় না। তপস্যা করলে তাঁর কৃপা হয়। একটি মিস্ত্রী কাল কি পরশু এখানে কাজ করছিল। আমায় বল্লে, বাবাজী, আপ তো বুড্ডা হো গিয়া। আভি তপস্যা করনে যাও।' আহা, কি কথা! ভারতের লোক বলে এই কথা—সামান্য মিস্ত্রীর মুখে জ্ঞানের কথা। ভারতের mass-এর (জনসাধারণের) ভিতর এই গভীর জ্ঞান! এই স্বরূপ ভারতের! এই জীবনীশক্তি ভারতের! এইজন্য আজও ভারত জীবিত। কত রাজা এলো, কত অত্যাচার হলো — ভারতকে ধ্বংস করতে পারে নি। তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নি। সেই শক্তি নেই আক্রমণকারীদের। তাই ধনদৌলত 'লাউ কুমড়ো' নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভারতের পরম ধনের সন্ধান পায় নাই। সেই ধন রয়েছে ভারতবাসীর হৃদয়ে। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য। ঈশ্বরলাভ আগে, সংসার পরে। দেখুন, সামান্য মিস্ত্রীর মুখে কি জ্ঞান। কোথায় পাবেন এই জিনিস? ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) এ পাবেন না। ওরা সব ড্রিংকিং-ফ্রিংকিং নিয়ে আছে। কি কথাই শুনিয়েছেন ঠাকুর ঐ মিস্ত্রীর মুখ দিয়ে! ঠাকুর ওকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের চৈতন্যের জন্য। তবুও কি চৈতন্য হয়? জিজ্ঞেস করলুম, সাধুসঙ্গ হয়েছে কিনা! বললে, 'মেরা গুরুজী জ্ঞানী হ্যায়'।

ঠাকুর বলতেন, ঝিনুক স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য সমুদ্রের surface-এ (জলের উপর) ভাসতে থাকে। যেই জল পড়লো অমনি আর উপরে নেই। পেটে oystar (মুক্তা) হবে, তাই গভীর

জলে ডুবে গেল। কাশীতে শোনা যায় এইরূপ একটি ঘটনা হয়েছিল। একজন অপর একজনকে* মহাপুরুষ বলে জানতেন। নিত্য গঙ্গাস্নান করেন দু'জনেই। একদিন মহাপুরুষ একটি নাম করতে করতে ঘাট থেকে উঠছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ নাম শুনে নিয়ে একেবারে নির্জনে পলায়ন। ঐ নাম জপ, আর ঐ বস্তু ধ্যান করতে লাগলেন। গভীর তপস্যায় মগ্ন হলেন। এমন বিশ্বাস, আর এমন মনের জোর। দীক্ষা-ফিক্কার দরকার কি? এই আগ্রহ চাই — একবার শুনে একেবারে দৌড়। তাই ঠাকুর বলতেন, 'যে খেলে সে কানা কড়িতে খেলে। ছুতোর মিস্ত্রী আমায় চৈতন্য করিয়ে দিলে।'

শ্রীম ভাবোন্মত্ত হইয়া নাম করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন, 'রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।' ক্ষণকাল পর আবার উপদেশ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সব ছেড়ে দূরে গিয়ে তপস্যা করলে তিনি দেখা দেন। ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ডাকলে দেখা দেন। ঠাকুর পঞ্চবটীতে মাটির ঢেলা মাথায় দিয়ে কত রাত কাটিয়েছেন। কান্না শুনে কত লোক জমে যেতো। আর প্রবোধ দিতো — 'কেঁদো না আর, তুমি পাবে, তোমার হবে।' (জনৈক যুবকের প্রতি) — স্নেহ কাটার নামই সংসার ত্যাগ। সংসারের একটি নাম স্নেহ। যীশু একজনকে বলেছিলেন, 'come and follow me' — বাড়িঘর ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে এসো। স্নেহবন্ধন ছেড়ে চলে আসা। এরই নাম সন্ন্যাস — সর্বস্ব ত্যাগ। যে একবার এই আস্বাদ পেয়েছে, সে কি আর ঘরে থাকতে পারে, না আর কিছু করতে পারে! '...when he had found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it.'(St. Matthew 13:46) মানে, সর্বস্ব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছে — সন্ন্যাস হয়েছে।

কতকগুলি ভক্ত প্রবেশ করিলেন। কথাপ্রবাহ ক্ষণকাল বন্ধ হইয়া রহিল। পুনরায় শ্রীম কথা কহিতেছেন।

---

* রামানন্দ এবং কবীর।

শ্রীম — (বড় জিতেনের প্রতি) — শশধর পণ্ডিতকে বলেছিলেন, ‘গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! আগে তপস্যা কর, কিছু সঞ্চয় হোক। তারপর লেকচার দিও। আগে ঈশ্বর — না, দেশ উদ্ধার, বক্তৃতা’?

কথা কহিতে কহিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া গাহিতে লাগিলেন —

গান। আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাকো কারু ঘরে।
যা চা’বি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।
পরমধন ঐ পরশমণি, যা চা’বি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।।*

গান। অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।।
কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি,
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি।
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি,
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি।।**

(*কথামৃত ১:১২:৯ এবং **কথামৃত ৫:১৬:৪)।

শ্রীম — ‘দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি’ — সব ছেড়ে ঈশ্বরকে সার করেছেন। দুদিক রাখা যায় না। ঈশ্বরকে চাইলে সংসার ছাড়তে হয়। দেহ ধারণ করার নামই সংসার। তাই ‘দেহ বেচে’ অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করে, ভোগ ছেড়ে দিয়ে — ‘দুর্গানাম কিনে এনেছি’ — 'bought one pearl of great price'; অর্থাৎ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েছি। প্রথম দুদিক রেখে চলে, শেষে আর পারে না। মদ বেশী খেয়ে ফেললে আর হুঁশ থাকে না। ‘দেহের মধ্যে সুজন যেজন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি’ — মানে, ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন। সেই জন্য, ‘আর কি যমের ভয় রেখেছি’ অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করেছেন। ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেলে আর জন্মমৃত্যুর অধীন হতে হয় না। তাই ‘দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি’। শরীরটা চলে গেলে একেবারে নির্বাণ, মুক্তি।

২০শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

আজ রথের পুনর্যাত্রা। সন্ধ্যার পর শ্রীম নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। সঙ্গে জগবন্ধু, ছোট রমেশ, শচী আর শান্তি। বৈদ্যুতিক আলোকে কলিকাতার রাজপথ আলোকিত। শ্রীম আনন্দে পূর্ণ হইয়া মেছুয়াবাজার দিয়া চলিতে লাগিলেন। ডান হাতে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মন্দির দেখিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এই মন্দিরে ঠাকুর বহুবার এসেছেন। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে তাঁর ভাব ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পশ্চিম দিকে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া বলিলেন, এই দেখ, রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি। প্রথম প্রথম ঠাকুর এই বাড়িতে পূজো করতেন। আমরা তখনও তাঁকে দেখি নি। আরো খানিক দূর অগ্রসর হইয়া ডান হাতের একটি বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন, এই বাড়ি ঈশান মুখুয্যের। এখানেও ঠাকুর এসেছিলেন। আমি ঠাকুরের সঙ্গে এই বাড়িতে এসেছিলাম — সোজা-রথের দিন। আজ আপনাদের তিনটি স্থান দেখালাম। ঈশানবাবুর বাড়িটা যদি ওদেরই কারো হাতে থাকতো, বেশ হতো। এই বাড়িতে আমি পূর্বে অনেকবার এসেছি। ঈশানবাবুর ছেলে শ্রীশ আমার সঙ্গে পড়তো। শেষে ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছিল। এত বছর হয়ে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সেদিন।

শ্রীম মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দোতলার ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়াছেন। ভক্তগণকে গান গাহিতে বলিয়া নিজেই গাহিতে লাগিলেন — 'কিঙ্করে করুণাময়ী'। গান শেষ হইলে বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর এই গানটি গাইতেন এই লাইনটির জন্য — 'ঘুম নাই তার ধনের লাগি'। ব্যাকুলতার গান। বলতেন, 'পাশের ঘরে ধন রয়েছে, চোর ঢুকতে পারছে না। সে যেমন ব্যাকুল হয় ঐ ধনের জন্য, তেমনি ব্যাকুল হলে ঈশ্বরদর্শন হয়।' অবতার এলে ব্যাকুলতা বেড়ে যায় লোকের। ব্যাকুলতা বাড়াতেই আসেন তিনি। এসে বলেন, 'নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে

কেঁদে কেঁদে ডাক। তিনি দেখা দেবেন।’ অবতারের আসার পূর্বে লোকে গঙ্গাস্নান, জপ, পুরশ্চরণ বিধিমত সব করতে থাকে। তিনি এসে বলেন, ‘এতে হবে না। এগিয়ে চল, ব্যাকুল হয়ে কাঁদ।’

শ্রীম মত্ত হইয়া গান গাহিতে লাগিলেন।

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি,
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।

গান। সুরাপান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥

গান। শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে॥

গান শেষ হইলে ছোট ললিতকে গাহিতে বলিলেন। ছোট ললিত গাহিতেছেন।

গান। গাওরে সঘনে বীণে হরিগুণ গান।

গান। বাজে শ্যামের মোহন বেণু।

এই গানও শেষ হইল।

শ্রীম (অমৃতের প্রতি) — হাঁ, অমৃতবাবু আপনি গান। একজনকে গান গাইতে বলা হয়েছিল। খুব লাজুক। সে বলল, ‘আলো নিভিয়ে দাও’ (সকলের হাস্য)। এখানে কিন্তু তা নাই, আলো আদপেই নাই (সকলের উচ্চহাস্য)। এখানে গাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, উনি দেখছি ঘোমটা খুলতে রাজী নন। তা হলে আর কি করা, আপনারই হউক। ললিত পুনরায় গাহিতেছেন, ‘মহাদেব পরমযোগিন মহতানন্দে মগন।’ ২৩শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

আজ সন্ধ্যার ধ্যানের পর শ্রীম মোহনকে একটি গান গাহিতে বলিলেন। মোহন গাহিলেন, ‘সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।’ শেষ হইলে শ্রীম নিজে আবার ঐটি গাহিলেন। অপর একজন গাহিতেছেন,

'ডুব ডুব ডুব রূপসায়রে আমার মন।' এই গানে শ্রীম-র ভাবসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি মত্ত হইয়া অবিরাম গাহিতে লাগিলেন।

গান। পাড়ার লোকে গোল করে বলে আমায় গৌর কলঙ্কিনী।
একি কয়বার কথা, কইব কোথা লাজে মরি ও
প্রাণসজনী॥

মোহন — আজ্ঞে 'কয়বার' না, কইবার?

শ্রীম — না, 'কয়বার'। ঠাকুর তাই গাইতেন।

মোহন — এটা ভুল না?

শ্রীম — হাঁ। তোমরা শুদ্ধ করে গাও। আমাদের 'His Master's Voice' (গুরুবাণী)।

গান। আমি সাধনভজনহীন। (গৌরলীলার গান)।

শ্রীম — এই গানটি একটি ভক্ত পঞ্চবটীতে একলা গেয়েছিলেন। শুনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন।

গান। সুরধুনীর তীরে গৌর ব'লে কে যায় রে।
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে রে॥

শ্রীম — ঠাকুর ঘরের ভিতরে হেঁটে হেঁটে এই গানটি গাইতেন।

গান। গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল, হে প্রভো।

শ্রীম — এটি সর্বদা গাইতেন। চণ্ডীর গান যারা করে, তাদের এই গানটি শিখিয়ে দিছলেন। এখন শুনতে পাই, ওরা চণ্ডীর গানের সঙ্গে এটিও গায়।

গান। হরি ব'লে আমার গৌর নাচে, শ্রীবাস-অঙ্গনে;
নাচে সংকীর্তনে ভক্তসঙ্গে।

গান। গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়,
তার হুঙ্কারে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।
মনে করি কূলে দাঁড়িয়ে রই,
গৌরচাঁদের প্রেমকুমীরে গিলেছে গো সই;
এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে,
আমায় হাত ধরে টেনে তুলায়॥

গান। তারে কই পেলাম সই, হলাম যার জন্যে পাগল।

ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব,
তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙ্গলো নবদ্বীপ॥
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঝে।
রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে॥
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে।
রাধাপ্রেম সুধা বলে করোয়া কীস্তি হাতে॥

ছোট অমূল্য সুকণ্ঠ। শ্রীম-র কথায় তিনি একটি গান গাহিলেন কৃষ্ণলীলার, আর একটি গৌরাঙ্গের। পুনরায় শ্রীম গাহিতেছেন।

গান। কে কানাই নাম ঘুচালে তোর, ব্রজের মাখন চোর।
কোথায় রে তোর পীত ধড়া, কোথায় তোর মোহন চূড়া॥
হয়ে নেড়া মুড়া, ধরেছ কৌপীন ডোর॥
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গ, পুলকে পূরিত অঙ্গ,
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ হরিনামে হয়ে ভোর॥

সকলে গাহিতেছেন।

গান। বাজে শ্যামের মোহন বেণু,
বেণুরব শুনে জুড়াল তনু।
যে বনে বাজিছে সেই বনে যাই,
এ ছার জীবনে আর কাজ নাই॥
পঞ্চমেতে পাখি ধরিয়াছে গান,
পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে তান।
যাহার নামেতে যমুনা উজান,
হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিত ধেনু।

২০শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৪

আজ সারা দিন বৃষ্টি হইতেছে। শ্রীম ঠাকুরবাড়ি যাইয়া আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন বৃষ্টির জন্য। এই মাত্র মর্টন স্কুলে আসিলেন। এখন রাত্রি আটটা। বহু ভক্ত অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। বেলুড় মঠের স্বামী গিরিজানন্দ আসিয়াছেন।

শ্রীম — (গিরিজানন্দজীর প্রতি) — দেখ, বিষয় কি ভীষণ চিজ্। মানুষের সত্তা নাশ করে দেয়। যদুপতিবাবু বিষয়ের ফাঁদে পড়ে, ঐ ভেবে ভেবে পাগল হলো, শেষে প্রাণটা গেল। (সহাস্যে) একজন স্ত্রী ভক্তকে ঠাকুর শিখিয়েছিলেন, 'তুই বরং বলিস্ তোর বাপকে, আমার টাকা নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে।' তাহলে appeal (করুণা উদয়) করবে ওর মনে। বাপের কাছে টাকা জমা ছিল। বাপের মারবার (আত্মসাৎ করার) ইচ্ছা। কেন ঐ কথা শিখিয়েছিলেন? ওরা ঐ আনন্দ নিয়েই রয়েছে কিনা, তাই। আর ঠাকুরের নিজের কি হতো। দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল একজন। শুনেই মূর্ছা হয়েছিল। আমি স্বকর্ণে শুনেছি ঠাকুর বলছেন, 'আমার মূর্ছা হয়েছিল। যখন মূর্ছা ভাঙ্গলো তখন বললুম, না বাপু, মা আমায় এমন অবস্থায় রাখেন নি।' দেখ, অত উঁচু অবস্থা কিন্তু নিজে credit (বাহবা) নিচ্ছেন না। তাই বলছেন, 'মা আমায় এমন অবস্থায় রাখেন নি।' শ্রীম এই কথাগুলি কয়েকবার আবৃত্তি করিলেন এক-একজন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন কি ব্যাপার! আমরা কি নিয়ে আছি, আর ঠাকুরের কি অবস্থা! টাকার নামে একেবারে মূর্ছা। যদুপতিবাবু অতবড় ভক্ত — তাঁরই এ অবস্থা, অন্যের কথা কি? ব্যবসায়ে বহু অর্থ নষ্ট হয়ে যায়, তাই চিন্তা করে মাথা বিগড়ে গেল, তাতেই দেহ যায়। তাইতো ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন তাদের শুধু ডালভাতের সংস্থান হয়। এর বেশী নয়। তা'হলে যে ভুলে যাবে তাঁকে।

শ্রীম-র দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ। চক্ষু স্থির, উন্মনা ভাব।

শ্রীম (স্বগত) — কামিনীকাঞ্চন নিয়ে পাগল মানুষ, আর ঠাকুর পাগল ঈশ্বরের জন্য। ধন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালবাসে মানুষ, ধন না পেলে পাগল। আর ধনের নাম শুনে তাঁর মূর্ছা, স্পর্শ করা দূরের কথা! ডাক্তার হাতে টাকা স্পর্শ করিয়েছিল, অমনি হাত বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে গেল — যেন পাথর। আর দম বন্ধ।

শ্রীম কিছুকাল মৌন হইয়া রহিলেন, পুনরায় কথা বলিতে

লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ‘ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট’-এ আছে, avoid woman, rich man and young man (কামিনী, ধনী আর যুবক — এদের সঙ্গ ত্যাজ্য)। ঠাকুরও বলেছিলেন, ‘হাজার ভক্ত হলেও স্ত্রীলোকের সঙ্গে বেশী কথা কইবে না।’ একজন একটি স্ত্রী ভক্তের সঙ্গে তিন ঘন্টা কথা কয়েছিল। অপর একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘আচ্ছা, এ ব্যক্তি যদি গোঁফওয়ালা পুরুষ ভক্ত হতো, তবে কি তিন ঘন্টা কথা কইতে?’ সে উত্তর করলে, ‘না।’ এমনি আকর্ষণ! তাই avoid woman (স্ত্রীসঙ্গ ত্যাজ্য)। Rich man (ধনী) একজন এলো, হাতে ঘড়ি, ফিটবাবু। ‘আসুন মশায়, বসুন মশায়’ বলে তাকে আদর করা হলো। আবার যখন এই ব্যক্তিই একখানা ভাঙ্গা ছাতা, ছেঁড়া ময়লা কাপড়-জামা পরে আসে অবস্থা-বিপর্যয়ে, তখন কি আর তাকে ওরূপ আদর করা হয়? Rich man-কে (ধনীকে) ভালবাসা, কাঞ্চনকে ভালবাসা। তাই avoid rich man (ধনী ত্যাজ্য)। আর young man (উঠন্ত যুবক) বেশী কথা কয়। কি বলতে কি বলে, বাচাল। নর্দমার কথা বলতে গিয়ে বলে ফেলবে, ‘একটা ইলিশ মাছ দেখলুম নর্দমায়’ (সকলের হাস্য)। সংযম নাই কথায়, অস্থিরচিত্ত। এই জন্য avoid young man (উঠন্ত যুবক ত্যাজ্য)।

শ্রীম (জনৈক নবাগতের প্রতি) — মারোয়াড়ী ভক্ত দশ হাজার টাকা হৃদয় মুখুয্যের কাছে রাখতে চাইলে, তবুও ঠাকুর মানলেন না। কেন? তাতে কাজ বেড়ে যায়। হয়তো অন্যায় মত খরচ হচ্ছে দেখে প্রতিবাদ করতে হবে। আর ভাল কাজে খরচ হচ্ছে না দেখে, তা করতে বলতে হবে।

আজ শ্রীম-র ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন উচ্চ ভাবপ্রবাহ চলিতেছে। উহা যেন দেখা যাইতেছে। কখন তার কিঞ্চিৎ স্ফূরণ, কখনও আবরণ। পর্বতের ভিতর যেন প্রস্রবণ-প্রবাহ, কোথাও স্ফূরণ, কোথাও আবরণ, তাই বুঝি কথাগুলি বাহ্যত অসংলগ্ন। শ্রীম বলিতেছেন — আবার বলতেন, ‘একটা কিছু আছে (ঠাকুরের ভিতর); আবার কথা কয় যে।’

২৬শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৫

আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা। সকাল হইতে বৃষ্টি। তথাপি ভক্তগণ পূর্ব্ববৎ আসিয়াছেন। সন্ধ্যার ধ্যানান্তে শ্রীম-র আদেশে মাখন গান গাহিতেছেন।

গান। পাবি না ক্ষেপা মায়েরে ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে,
সেয়ান পাগল বুঁচকি বগল কাজ হবে না ওরূপ হলে।।

গান। জয় শিব শঙ্কর হরত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিনাকধারী।

গান সমাপ্ত হইল। নাগমহাশয়ের ভক্ত পার্বতী মিত্রের কথা একজন ভক্ত বলিতেছেন। খুব ভাল লোক। সর্বদা পূজা-অর্চা লইয়া থাকেন। একটা বিলাতি অফিসের বড়বাবু। নাগমহাশয়ের বাৎসরিক উৎসব করিয়া থাকেন। এই সব কথা শুনিয়া শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, 'একদিন ওখানে গিয়ে সব খবর নিয়ে আসতে হবে।' ভক্তদের দলাদলির কথা হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর কিন্তু বলতেন কেশবাদি ভক্তদের, 'আচ্ছা, তোমরা না দেখে শিষ্য কর কেন? অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে তবে করা উচিত। তা না হলে পরে লাঠালাঠি হয়।' নিজের কথায় বলতেন, 'আমার — গুরু, কর্তা, বাবা — হবার যো নাই। আমি খাই-দাই আছি। মা জানেন সব।' একদিন বলেছিলেন, 'আমিটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখছি মা সব জুড়ে বসে আছেন।' নিজে কিচ্ছুর credit (প্রশংসা) নেবেন না। অপর লোক কি করে? একটু কিছু করলে কারো, অমনি বলে, আমার কথায় করেছিল বলে হলো — claim (দাবী) করে। ঠাকুরের তা নাই। অত করলেন, কিন্তু claim (দাবী) নাই। একটুতেই অন্য লোক গুরুগিরি, দলটল কত কিছু করে বসে। ঠাকুর মায়ের কোলের শিশু।

শ্রীম (জনৈক এটর্নির প্রতি) — সব লোক কি ফস্ করে সব ছাড়তে পারে? যে মনে করে গুরুগিরি করছে, সংসারে নানা বিষয় নিয়ে আছে, সে কেমন করে ফস্ করে তা ছাড়বে? তাই বলতেন কখন কখন, 'বললেই কি পারে?' এর ভিতর থেকেই যতটুকু করান যায়, অবতার তার চেষ্টা করেন। নৌকা ডুবছে ঝড়ে, মাঝি বলছে,

'নড়ো না, ঠিক হয়ে বসে থাক যেখানে আছ। আমি ঠিক নিয়ে যাব। যেই একজন উঠলো অমনি চীৎকার করে বললে, 'বস বস'। কেন? তা না হলে যে সব লোক ডুবে মরবে। আর মাঝিও পড়ে যাবে। ঠাকুর পাকা মাঝি। তাই বলতেন, 'সংসার-ফংসার করে লেও — খেয়ে লেও, পরে লেও, আর কিছু করে লেও।' কিন্তু তারই মধ্যে আবার (ঈশ্বরীয় ভাব) ঢোকাতে চেষ্টা করতেন। ঐটি ঢুকলে আপনি সংসার আলগা হয়ে যাবে। ভিতর ফাঁক হয়ে যাবে। একজন অত কষ্ট করে একটি দল করেছে। এক কথাতে ছাড়ে কিরূপে? তাই এর ভিতর রেখেই ক্রমশঃ ভিতর ফাঁক করিয়ে নিতেন।

শ্রীম (জনৈক যুবকের প্রতি) — কেশব সেন যখন বিলেত থেকে আসেন, আমরা তখন স্কুলে পড়ি। দোতলায় উঠে দেখতুম 'মেইল লেটার্স' লিখছেন। কত কি করছেন। ইংরেজী বাংলা পত্রিকা লেখা, ব্রাহ্মসমাজ করা, বিয়েটিয়ে কত কি নিয়ে ব্যস্ত। এর পাঁচ বছর পর ঠাকুরের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ হয়। তখন শুনতাম, ওঁর sermon-এ (ধর্মবক্তৃতায়) 'আদেশ পাওয়া', 'ঈশ্বর কথা কয়' এই সব কথা। দলের অনেকে তাঁকে পাগল বলে ছেড়ে দিল। প্রায় চৌদ্দ আনা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে চলে গেল। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার পরই বদলে গেলেন। ঠাকুরকে উনি বুঝতে পেরেছিলেন। তা নইলে কি ঠাকুর দৌড়ে দৌড়ে চলে আসতেন! এর সাত বছর পর আমরা meet (সাক্ষাৎ) করলাম ঠাকুরকে। তখন বুঝতে পারলাম, কেন কেশব সেনের sermon (বক্তৃতা) এত ভাল লাগতো — কোন্ fountain (উৎস) থেকে ঐ সব কথা আসছিল। এ সাত বছর ব্রাহ্মসমাজে যেতাম। তাই ম্যাক্সমূলার বলেছিলেন, 'কেশব সেনের হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ কি? হঠাৎ কেন মত বদলালেন? মনে হয়, অন্য একটা force (শক্তি) তাঁর উপর act (কাজ) করছে।' তখনও ম্যাক্সমূলার ঠাকুরের কথা জানতে পারেন নি। পরে যখন তাঁর life (জীবনচরিত) শুনলেন, তখন বুঝতে পেরেছিলেন, কেন বদলালেন। 'চিঁড়াভেজা' বুদ্ধিতে তাঁকে পাওয়া যায় না। এর কর্ম নয়। 'খাসা' বুদ্ধির দরকার। আর এও ঠিক, সকলের কাছে এক জিনিস ভাল

লাগে না। কেউ সংসার ভালবাসে, কেউ ঈশ্বরকে ভালবাসে — সব ছেড়ে চলে যায়। শুনছি, ঝরিয়াতে একটি সাধু প্রান্তরে কুটীর বেঁধে তাঁর চিন্তায় নিমগ্ন। কখনও কুটীরে থাকেন, কখনও গুহাতে।

২৭শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৬

আজ কলিকাতা জলময়। বহু রাজপথ সম্পূর্ণ জলমগ্ন। যানবাহন প্রায় সব বন্ধ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে এই পরিস্থিতি। কিন্তু এই দৈব দুর্বিপাকেও শ্রীরামকৃষ্ণ-কমলমধু-লোভে ভক্ত-অলিকুল, ভাণ্ডারী শ্রীম-সমীপে উপনীত হইয়াছেন। এখন রাত্রি আটটা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অচলানন্দ ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'তুমি কি শিবের কলম মান না?' ইনি তন্ত্রমতে সাধন করতেন। ঠাকুর ভক্তদের তন্ত্রটন্ত্র বড় বলতেন না। নিজে কিন্তু সব করে রেখেছেন। ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কি জানি বাপু, সেও একটা পথ আছে। কিন্তু আমার মাতৃভাব।' নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, 'ও সব নোংরা পথ — পায়খানার পথ।' ভাল রাস্তা দিয়েও বাড়িতে প্রবেশ করা যায়, আবার পায়খানার রাস্তা দিয়েও হয়। ও সব পায়খানার পথ। এ যুগে তিনি নিজে পালন করে দেখিয়ে গেছেন — মাতৃভাবের সাধন যুগোপযোগী।

শ্রীম (জনৈকের প্রতি) — নির্জলা একাদশীর কথা বললে কে শোনে? যে গুরু বলে, তার শিষ্য হয় না বেশী। যদি একটু ভস্ম দিয়ে রোগ সারিয়ে দেয়, কিংবা হেঁটে গঙ্গা পার হয়ে যায়, তবে অনেক শিষ্য হবে। 'কামিনীকাঞ্চন ছাড়' বললে আর লোক আসবে না। যদি বলা হয়, ভোগটোগও কর, ঈশ্বরকেও ডাক, তবে গুরু ভাল human estimation-এ (মানুষের বিচারে)। তার কত নাম। লোকে বলে, 'তিনি আসার পর থেকেই তো আমাদের যা কিছু উন্নতি। আর ছ'টি মেয়ের পর ছেলেটি হলো তাঁরই আশীর্বাদে।' এ সব হলে লোক জোটে অনেক। ঠাকুরের কাছে নির্জলা একাদশী, তাই লোক কম। (সহাস্যে) কাশীপুর বাগানে বলেছিলেন, 'ও নটো, গোন তো ক'জন ভক্ত হলো।' এক, দুই, তিন করে গুনে একুশজন

হলো। ঠাকুর শুনে বললেন, 'তেমন আর কি হলো।' (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে আছেন। এক জুড়ি গাড়ী গিয়ে হাজির। একটি বাবু বললে, 'আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। অমুক মল্লিকের একশিরা হয়েছে চলুন (সকলের হাস্য)।' ঠাকুর বললেন, 'ঐ লোক পঞ্চবটীতে থাকে।' লোকটি wrong place-এ (ভুল জায়গায়) এসেছে বুঝে ক্ষমা চেয়ে চলে গেল। একদিন একটি স্ত্রীলোক বললে 'আমার নাংকে এনে দিতে হবে গুন-টুন করে।' হাত জোড় করে ঠাকুর বললেন, ও সব আমি জানি না মা। (সকলের হাস্য)।

মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন আর প্রধান কর্তব্য ভগবৎ-ভজন — বিষয়ভোগ নহে, এই মহামন্ত্র ভক্তগণের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য শ্রীম আজ হাসি তামাসারূপ অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — সন্ন্যাস নিয়ে বার বছর নিখোঁজ হয়ে থাকতে হয়। তারপর ভগবানে ভক্তি হলে, তাঁর দর্শন হলে, তখন এসে দেখা করা যায় ওদের সঙ্গে। কাছে থাকলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কাশীতে একজন সন্ন্যাস নিয়ে আট বছর আছে। বাড়ির লোকেরা সংবাদ পেয়ে চলে গেল। একদিন শালী গিয়ে ধরে ফেললে, আর বলছে, 'আচ্ছা, তুমি অমন সামান্য কথায় রেগে গেলে, দিদির একটু দেরী হয়েছিল ভাত দিতে। চল বাড়ি, আর কেন?' (সকলের উচ্চহাস্য)। টেনে নিয়ে চললে। দেখুন, ভাতের দেরী হওয়ায় বৈরাগ্য (হাস্য)। স্ত্রী ঘোমটা দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিন স্বামীছাড়া তাই লজ্জা। (সহাস্যে) আরো আছে — ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শালী বলছে, ওটা আবার কি ঢং পরেছ, নাও এই ধুতি! এই বলে, টান মেরে গেরুয়া ফেলে দিয়ে ধুতি পরিয়ে দিলে। বাবাজীর প্রতিবাদের ক্ষমতাটি নেই। এমন কাণ্ড! মঠেও কেউ দু'এক বছর থেকে ঘরে চলে এসেছে। বড় মুশকিলের কাজ। এক পয়সার পোস্টকার্ডে মন বদলিয়ে দেয়। তাই ভগবান-দর্শন না হওয়া পর্যন্ত কারো সঙ্গে দেখা

না হয়। পরে বরং চলতে পারে। কিন্তু প্রথমে মরণপণ চাই।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — হাঁ, ওদের কেমন দেখলে। নাগ-মহাশয়ের উৎসব কেমন হলো?

অন্তেবাসী — ওঁরা খুব গুরুভক্ত। নাগমহাশয়ের ছবিতে পূজা হলো, ঠাকুরের ছবি দেখতে পেলাম না। বাড়িটি যেন দেবালয়। কর্তা-গিন্নী সর্বদা পূজার ভোগরান্না এ সব নিয়ে থাকেন। দু'টি ছেলে, ওরাও ঐরূপ। প্রসাদ ছাড়া ওঁরা অন্য কিছু খান না। এমন প্রায় দেখা যায় না। মঠে যাওয়া-আসা খুব কম।

শ্রীম — হাঁ, চন্দন কাঠের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু ও নিয়ে বসে থাকলে হয় না। ঠাকুর বলতেন, এগিয়ে পড়। রূপো, সোনা, হীরে — কত খনি আছে আগে। (সহাস্য নয়নে) ঘটক গিছলো ঘটকালী করতে। ক'নে সুন্দর দেখে নিজে বিয়ে করে বসলো — তা না হয় শেষে! সাধু, সাবধান!

শ্রীম (গম্ভীরভাবে ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর ভক্তদের weakness (দুর্বলতা) সব জানতেন। পাছে পড়ে যায়, তাই আগে থেকেই সাবধান করে দিতেন। কতভাবে রক্ষা করতেন। কারো দোষ ধরতেন না। দেখতেন কিনা, মা-ই সব করাচ্ছেন। তাঁর মায়াতে সব মুগ্ধ। তাই প্রার্থনা করতেন, 'ভুলিও না মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।'

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — একটি দরিদ্র-নারায়ণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই স্কুলের শিক্ষক, হেমন্তবাবু। ছেলেপুলে রয়েছে, আয় কম। তাঁকে দেখলে হয় একবার।

ডাক্তার এই জলেতেই বাহির হইয়া পড়িলেন। শ্রীম বিনয় ও ছোট অমূল্যকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে সাগু, মিছরি, মধু ও পথ্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। নিজে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, ইঁহারা হাঁটুজল ভাঙ্গিয়া চলিতেছেন।

২৮শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৭

মর্টনের দ্বিতলগৃহে শ্রীম বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার ধ্যানের পর মিহিজাম-বাসের অনুধ্যান করিতেছেন। চারিদিকে ভক্তগণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি সন্দর নির্জন স্থান, কি প্রশস্ত মাঠ! যতীনবাবুর বাড়ি, পরেশবাবু, বিনয়বাবু, ব্যারিস্টারবাবু, পুলিনবাবু, 'আমাদের কবি', সাঁওতালদের ছেলেরা — এই সব places and personalities (স্থান ও পাত্র)।

জনৈক ভক্ত — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম — এঁরা সব আমাদের friends and neighbours (প্রতিবেশী ও বন্ধু)। আবার নীরব রজনীতে নক্ষত্রখচিত আকাশ! কেমন, না?

ভক্ত — আজ্ঞে হাঁ। আর উন্মুক্ত বাতাস, আমবাগান, ভ্রমর।

শ্রীম — ভ্রমরেরা কেমন মধুপানে মত্ত। ফুলে বসেছে আর গুন্ গুন্ নাই।

আবার কেওরজালি গমন — নিতাই কবরেজমশায়, রামনবমীর মেলা। মণ্ডপে রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা — কত মূর্তি। ঠাকুরের ছবিও আছে। সংকীর্তন হচ্ছে —

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।'

খোলীরা কেমন তাক্‌টি তাক্‌টি করছিল।

ফিরবার পথে উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুর দেখে জয়রামবাটির উদ্দীপন। খোলা মাঠে চাঁদ দেখে কালিদাসের কবিতা স্মরণ। কালিয়া পাহাড়, সাঁওতালদের বিয়ে।

ভক্ত — আর ছেলেদের, 'সেলাম বাবাজী'।

শ্রীম (আহ্লাদে) — সরল কিনা ওরা সব। শহুরে ভদ্রতা জানে না। প্রকৃতির সন্তান! আহা মন তো চাইছে ছুটে চলে যেতে। ওদিক (শরীর) যে সয় না। ভাগ্যে কি আর হবে — কে জানে?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — নির্জনে গেলে মনের প্রসার হয়। এখানে বরাবর থাকলে মন limited (সীমাবদ্ধ) হয়ে যায়। যেমন

চীনাদের পা। ছেলেবেলায় জুতো পরিয়ে দেয়, আর বড় হতে পারে না। যতটুকু ছিল ততটুকুই থাকে। এখানে মনেরও সেই অবস্থা। এখানে থাকা যেন হাঁড়ির মাছ। আর নির্জনে গেলে দীঘির মাছ — স্বাধীন, মুক্ত। সংসারটা বেড়া — বড় হতে দেয় না মনকে। তাই যোগীরা নির্জনে চলে যায়। সেখানে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়। যোগীরা অনাহত শব্দ শুনতে পায় নির্জনে। এই কর্ণে নয়। নূতন কান হয়। সর্বদা প্রণবধ্বনি হচ্ছে — 'আমি আছি, আমি আছি'। লোকালয়ে শোনা যায় না — নির্জনে। নির্জনে থাকলে উপাধির লোপ হয়। আমি অমুকের ছেলে অমুকের পিতা, অমুকের অমুক — এই সব উপাধি। তখন স্বরূপকে চিনতে পারে। স্বরূপকে চিনলেই তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়। খালও নদী হয়ে যায়। এখানেও জোয়ার ওখানেও জোয়ার। একই জল। ভক্তির পথ দিয়ে চিনলেও নিজেকে কত বড় বলে মনে হয়। আমি তাঁর ছেলে। কার ছেলে? — ঈশ্বরের। এ কি কম বড় কথা! জ্ঞানের পথ দিয়ে চেনা — তাও কত বড়। তাঁ'তে আমাতে কোন ভেদ নাই! তিনিই আমি 'সোঽহং'! এ সব অমূল্যধন, নির্জনের সম্পদ। 'চিঁড়া-ভেজা' বুদ্ধিতে এই ঐশ্বর্য লাভ হয় না। এ দিককার সব হতে পারে — ধন, বিদ্যা, যশ। ঈশ্বরকে লাভ হয় না। তা যদি চাও, নির্জনে যাও — বুদ্ধি 'খাসা' হবে।

শ্রীম (সুরেনের প্রতি) — নানা জনে নানা কথা বলে, শুনে ঠাকুর মাকে বললেন সব কথা। বললেন, 'মা, শিবনাথ বলে, এই কর; ইংলিশম্যান বলে, যা যুক্তিযুক্ত তা কর; আবার এক এক শাস্ত্র বলছে এক এক কথা — কার কথা শুনবো? কারো কথা শুনবো না — খালি তোমার কথা শুনবো।' 'তোমার কথা' মানে revelation (বেদ) — ঈশ্বরের কথা। তাই বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়।

শ্রীম (বিরিঞ্চির প্রতি) — আজ আমরা 'কথামৃত' পড়ছিলাম বিকালে। চার থাকের ভক্তের কথা আছে। 'প্রবর্তক' — সবেমাত্র ঈশ্বরের নাম নিতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন ধরে তপস্যা করলে, তাঁকে পাবার চেষ্টা করলে, বলা হয় 'সাধক'। তাঁর দর্শন হলে 'সিদ্ধ' হয়। এ-অবস্থায় জীবন্মুক্ত হয়। সর্বদা তাঁকে বোধে বোধ হয়। সৎ

অসৎ আলাদা হয়ে যায়। তার উপরে ‘সিদ্ধের সিদ্ধ’। তখন তাঁর সঙ্গে কথা কয়। দর্শন, স্পর্শন ও কথন।

শ্রীম গাহিতে লাগিলেন —

গান। কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।

গান। জীবন-বল্লভ তুমি প্রাণ-রমণ হে।

গান। সুন্দর তোমারি নাম দীণশরণ হে।

গান। রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও।

অমৃত (শ্রীম-র প্রতি) — এখন রাত সাড়ে ন’টা হয়ে গেছে।

শ্রীম (গানে উত্তর দিতেছেন) —

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।।
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩য় ভাগ, ১১শ খন্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এ একটি অবস্থা — ‘যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের লোক’ পাওয়া অর্থাৎ সমাধি লাভ করা। এটাই হলো মানুষের normal state (স্বরূপ)।

২৯-৩০শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৮

শ্রীম দ্বিতলে গৃহে বসিয়া আছেন। নাগমহাশয়ের ভক্ত পার্বতী মিত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাকে শ্রীমকে দর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। দুর্গার হাতে উপহারার্থ তাহার মায়ের লিখিত নাগ-মহাশয়ের জীবনী। একজন ভক্ত সূচীপত্র পড়িয়া শুনাইতেছেন। ‘ঠাকুরের সঙ্গে মিলন’ অধ্যায়টি শ্রীম দুর্গাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। কিন্তু অন্যকথা আসিয়া পড়ায় আর পাঠ হইল না। দুর্গা চলিয়া গেলে ছোট অমূল্য উহা পড়িয়া শুনাইলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বাজারে গেছেন নাগমশায়, দোকানদার

যা চাইছে সেই দাম দিয়ে দিলেন। একজন বললে, 'ওরে, উনি যে সাধু, অত দাম কেন নিলি?' তখন পয়সা ফিরিয়ে দিতে এলো। উনি বললেন, 'না, আপনার লোকসান হবে। রেখে দিন।'

বড় অমূল্য — কিন্তু ঠাকুর নাকি বলতেন, বাজারে গেলে পাঁচ দোকান দেখে কিনবি?

শ্রীম — তা কি সকলের জন্য? যারা সংসার নিয়ে আছে তারা পাঁচ দোকান দেখবে না তো কি? যাঁরা ছাদে উঠেছেন তাঁদের জন্য নয়। তাঁরা 'যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের লোক।' যে এখানে ঠকে যায় সে কি করে ঈশ্বরদর্শন করবে? তাই তারা দেখে-শুনে নেবে। পয়সা বাঁচানোর চাইতেও ঠকে না যাওয়া অভ্যাসটির দাম বেশী। এই সজাগ অভ্যাসের মোড় ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া! তাই বলতেন, 'যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরির হিসাবও করতে পারে।' কিন্তু যে ছাদে উঠেছে, যার ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে, তার জন্য এ নিয়ম নয়।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — বাজার থেকে মুটে এসেছে। সমস্ত শরীর ঘামে ভেজা। অমনি (নাগমশায়) পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। তারপর বাড়িতে যা মিষ্টান্ন ছিল, তা এনে খাওয়ালেন। ভেদবুদ্ধি নাই। সংসারী লোক মনে করবে, ইনি মুটের উপর দয়া করলেন। কিন্তু এ দয়া নয় — পূজা। দয়াতে বড় বলে অভিমান থাকে। যিনি সর্বভূতে নারায়ণ-দর্শন করেন তাঁর সব কাজই পূজা। দয়াতে credit (প্রশংসা) নেয়, অপরকে কৃতার্থ করে ব'লে পূজায় নিজে কৃতার্থ হয়। তাই হিন্দুর জীবনটা আগাগোড়া পূজা।

শ্রীম (জনৈক ছাত্রের প্রতি) — যাদের প্রথম জন্ম তারা ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত। যাদের অনেক জন্ম হয়ে গেছে তাদের ভোগ কেটে গেছে। অন্য জিনিসে মন নাই, সর্বদা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন। এমনও শোনা, যায়, কেউ কেউ তাঁর জন্য অনশনে প্রাণত্যাগ করে। অবতার এলে টাটকা সব, খুব সুবিধা। এখন যারা জন্মেছে তাদের খুব chance (সুবিধা) শুনতে পাচ্ছি, কেউ কেউ আদপেই বিয়ে করবে না। পরিবারের কত গঞ্জনা, কি যন্ত্রণা! কেন যাবে এ ঝঞ্ঝাটে?

শ্রীম (বিরিঞ্চির প্রতি) — এ পাড়ায় এক উকিলের দ্বিতীয়পক্ষ। বউ সর্বদা ঝগড়া করে শাশুড়ীর সঙ্গে। উকিলবাবু মাকে বলেন, ‘কেন বিয়ে দিয়েছিলে, ‘না’ করি নাই তখন?’ মা চুপ। যে করায় তার উপর ভার পড়ে। অক্ষম ছেলেকে বিয়ে করালেও এই জ্বালা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই সংসারের দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায়, সব পুরুষ-প্রকৃতি, শিবশক্তির মিলন। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, জীবজন্তু সবেই ঐ! শিবলিঙ্গ দেখবেন ব্রহ্মযোনির উপর রয়েছে। সেখানেও শিবশক্তির মিলন। দিনরাত এটি ধ্যান করলেও হয় — ‘পুরুষ-প্রকৃতি, পুরুষ-প্রকৃতি’, ‘শিবশক্তি, শিবশক্তি’। বসে বসে এই চিন্তা করলেই ঈশ্বরদর্শন হবে। আর কিছু দরকার হবে না। এই পুরুষ ও প্রকৃতি তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর organisation (প্রপঞ্চ) রক্ষার জন্য।

অমৃত — স্ত্রীলোক না থাকলেই ভাল হতো।

শ্রীম (গম্ভীর সহাস্যে) — এতক্ষণে বুঝি আপনি এটা ঠাওরিয়েছেন ভেবে চিন্তে? তাঁর grand organisation (বিশ্বতন্ত্র) রক্ষার জন্য শিব-শক্তির মিলন। জন্মও দেন তিনি, সংহারও করেন তিনি। সংহারের কারণ মোটামুটি আমরা যা বুঝি (সহাস্যে), তা না হলে ধরবে না যে। অত জীব থাকবে কোথায় যদি না মরে? তাই epidemic, pestilence (রোগ-মহামারী)। সব থাকলে জায়গা হবে কোথায়? অপর কারণও আছে। শুনেছি, ঋষিরা বলেন, এই সব প্রাণী অন্য লোকেও যায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই হঠ করে কিছু করতে নেই। কচি অবস্থায় আমের খোসা ফেলে দিলে, আম হবে না। শাঁস হবে, বিচি হবে, পাকবে, তখন ফেল, কোন ক্ষতি হবে না। Unprepared (অপক্ক) অবস্থায় কিছু করতে নেই। Natural way-তে (স্বাভাবিকভাবে) যাওয়া ভাল। ত্যাগ-ট্যাগ সময় হলে তিনি করিয়ে নেন। ভিতর পাকুক, তখন ছাড় দোষ নেই। অসময়ে জোর করে করতে গেলেই বিপদ। কিন্তু চেষ্টা করতে থাকা আর প্রার্থনা ও সৎসঙ্গ।

কলিকাতা, ৩১শে জুলাই ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার।

ঊনবিংশ অধ্যায়

আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান ও ক্রাইস্ট

১

মর্টন স্কুলের আফিসঘর। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট, পাশেই একটি ভক্ত শিক্ষক। এখন বেলা ৯-৪৫। ঘরে অন্য লোক নাই। গতকাল শ্রীনাগপঞ্চমী তিথি ছিল। এই তিথিতে শ্রীম-র জন্ম। ডাক্তার-বাড়িতে কাশীপুরে ভক্তগণ উৎসব করিয়াছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কালকের উৎসবের খরচ কে দিয়েছেন, ডাক্তারবাবু দিয়েছেন কি? আর খেটেছেন কে কে? ভক্তটির সব কথা শেষ না হইতেই অপর শিক্ষকগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম ভক্তকে নিজের গা ঘেঁষিয়া অপর একটি চেয়ারে বসিতে বলিলেন, আর মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, কর্মকাণ্ড বড় শক্ত, মুশকিলে ফেলে দেয়। মন ওতেই পড়ে থাকে দিনরাত। তাই তিনি এ পথ গ্রহণ করতে বারণ করতেন। কেউ কেউ এমন করে — মঠে দিয়ে দেয় টাকা। কিম্বা কোন জিনিস কিনে দিয়ে দেয়। কেমন উত্তম কাজ হয় এতে। প্রথম, ঠাকুরকে নিবেদন করা হলো, তারপর সাধুরা সকলে প্রসাদ পেলেন। ঐ সঙ্গে ভক্তরা পেলে আরও ভাল। ঠাকুরের জন্মোৎসবে অনেকে এইরূপ করে, দেখেছি। এতে নিজের কোনও ঝঞ্ঝাট থাকে না। তাঁরাই সব করলেন, আপনারাও কেউ কেউ গিয়ে সাহায্য করলেন। একজন গিয়ে প্রসাদ এনে ভক্তদের দিলেন। ভক্ত, মানে যারা গৃহে রয়েছে। এ সব কাজ পারেন ওঁরা; অনেক লোকজন, organisation (সঙ্ঘ) রয়েছে ওঁদের। যাঁদের এরূপ সুবিধা নাই তাদের পক্ষে বড়ই মুশকিল। নিজেদের সব করতে হয়। এই ডাক্তারবাবু, সারা দিন খেটেছেন। এদিকে তো

শরীর (তর্জনী দেখাইয়া) এই। তার উপর অত খাটুনী। ঠাকুরকে খাইয়ে সাধুরা প্রসাদ পেলে খুব ভাল। কি বলেন আপনি? মঠে টাকা দিয়ে বললেই হলো — ঠাকুরসেবার জন্য। রোজই তো হচ্ছে। আজ আর একটু। কি উপলক্ষে দেওয়া হচ্ছে অত বলবার দরকার কি? ঠাকুরসেবা, সাধুসেবায় লাগলেই কাজ হলো।

এখন বেলা সাড়ে তিনটা। শ্রীম ভক্ত শিক্ষকের হাতে বড় এক বোতল উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত দিয়া বলিলেন, হেমন্তবাবু অসুস্থ, তাঁকে এটা দিয়ে আসুন। এই ঘৃত শুকলাল শ্রীমকে উপহার দিয়াছিলেন। যাইবার সময় পুনরায় বলিতেছেন, মঠে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। আপনি সেই দরিদ্রনারায়ণকে এইটে দিয়ে আসুন। ইতিপূর্বে আর একদিন ডাল, চাল, সাগু, মিছরি প্রভৃতি পাঠাইয়াছিলেন। হেমন্ত মর্টনের শিক্ষক।

সাড়ে পাঁচটায় চারতলার ছাদের ফাটা স্থানে সিমেন্ট দিয়া শ্রীম নিজহস্তে সংস্কার করিতেছিলেন। একস্থানে ফাটা দিয়া পিঁপড়ে উঠিতেছে দেখিয়া শ্রীম একটি ভক্তকে বলিলেন, না, এখানে দেবেন না, এরা তা হলে বের হতে পারবে না। ইহা কি সর্বভূতে নারায়ণদর্শন?

এখন সন্ধ্যা। নিত্যকার ভক্তগণ সবই আসিয়াছেন। নূতন ভক্তও কয়েকজন আসিয়াছেন। ডাক্তারের খুল্লতাত, গায়ক ললিত ও নায়েব আসিয়াছেন। ধ্যানান্তে একজন নূতন ভক্ত প্রশ্ন করিতেছেন।

নূতন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — আচ্ছা, আস্তিক্য বুদ্ধি যে এসেছে তার লক্ষণ কি?

শ্রীম — সাধুসঙ্গ। তিনি সাধুসঙ্গ করবেন। এটা হলো — beginning of the religious life (ধর্মজীবনের প্রারম্ভ)। এক ধনী ব্যক্তিকে যীশু বলেছিলেন, আমার সঙ্গে থাকতে হলে সব ছাড়তে হবে —'...Give (your all) to the poor,...and follow me.' সে কিন্তু পারলে না। যে আন্তরিক সাধুসঙ্গ করবে, বুঝতে হবে সে ঈশ্বরকে সার বুঝেছে। A man is known by the company he keeps, and the ideal he worships (আদর্শ ও সঙ্গ দেখে মানুষ চেনা যায়)। একজনের ideal (আদর্শ)

যদি কোন কংগ্রেসম্যান হয়, তবে বুঝতে হবে তার patriotism (স্বদেশপ্রীতি) আছে, পলিটিক্স ভালবাসে। একজন যদি বিদ্যেসাগর মহাশয়ের কাছে বসে, তবে বুঝতে হবে তার একটু philanthropy (পরোপকার ব্রত) আছে, দয়া আছে। আর একজন যদি সাধুর কাছে আসে, তবে বুঝতে হবে ও-সবে তার মন নাই। সে বুঝেছে ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য। তাই eternal life-এর (অমৃতত্বের) জন্য ব্যাকুল — কিসে তাঁকে লাভ হয়।

নূতন ভক্ত — মর্কট বৈরাগ্য আর আসল বৈরাগ্যে পার্থক্য কি?

শ্রীম — মর্কট বৈরাগ্য, সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া নিয়ে কাশীতে বাস করছে। দু'মাস পর বাড়িতে চিঠি লিখলো, 'আমার একটি কর্ম হইয়াছে। শীঘ্র বাড়ি আসিতেছি।' কাজকর্ম ছিল না, তাই বৈরাগ্য। আসল বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকূয়ো আর আত্মীয়-স্বজন কালসর্প বলে বোধ হয়, ঠাকুর এই কথা বলতেন। একজন আট বছর কাশীবাস করে, গেরুয়া ফেলে ঘরে এসেছে। ভাত দিতে দেরী হওয়ায় পরিবারের সঙ্গে রাগ করে বৈরাগ্য। এ বৈরাগ্য ধোপে টেঁকে না। ঈশ্বরে অনুরাগ ঠিক ঠিক হলে, সংসারে বিরাগ হয়।

দ্বিতীয় ভক্ত — আচ্ছা লোকে খামাকা মিথ্যা কথা বলে কেন?

শ্রীম — আর একদিন হবে এ কথা।

এতক্ষণে শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, মনোরঞ্জন ও বড় জিতেন আসিয়াছেন। ছোট অমূল্য বীরেন, সুধীর, সুরেন গাঙ্গুলী, গদাই প্রভৃতিও আসিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এমনও শুনা যায় যেমন নাগমহাশয়, বিয়ে হয়েছে, ঘরে যুবতী ভার্যা; কিন্তু তাকে গ্রহণ করলেন না। এক ঘরে বাস, কিন্তু গ্রহণ করেন নি। এ সব সিদ্ধ পুরুষের হয় — মহাপুরুষদের। প্রথম বিয়ে হলো, স্ত্রীর বয়েস বছর ষোল। ঐ রকম, গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করবেন না। ঘরে মা নাই, বাবা কাঁদছেন ছেলের বিয়ের জন্য, জানতে পেরে বাবাকে বললেন, বিয়ে করবেন। বিয়ে করলেন, কিন্তু ঐ — দেহ-সম্পর্ক নাই। এ কামের হাত থেকে মহাপুরুষ ছাড়া কে এভাবে নিষ্কৃতি পায় —

যীশুখৃস্ট তাই বলেছিলেন, 'Who are married let them live as they were not married. ঘরে স্ত্রী কিন্তু গ্রহণ করছেন না — কি মনের জোর!

শ্রীম (বীরেনের প্রতি) — দশরথের নিকট একজন ঋষি এসেছেন। বলছেন, 'মহারাজ আপনি বহু রাজ্য জয় করেছেন সত্য, কিন্তু একটি জিনিস এখনও বাকি আছে।' দশরথ বললেন, 'সেটি কি?' ঋষি উত্তর করলেন, 'আপনি কাম জয় করেছেন কি?' দশরথ বললেন, 'না'। ঋষি বললেন, তা হলে আর কি করেছেন — গুচ্ছের রাজ্য জয় করলে শুধু, কি হবে? যে কাম জয় করেছে সে-ই যথার্থ বিজয়ী।'

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — নেপোলিয়ান সেন্ট হেলেনাতে শেষ সময়ে এই কথাই বলেছিলেন — সিজার, আলেকজাণ্ডার ও আমি কি করলুম? দু'দিনের জন্য রাজ্য জয়। কিন্তু যীশুর বিজয় চিরকাল থাকবে ঃ 'Our kingdom breaks even while we are living, but his (Christ's) kingdom begins at his death, and extends for ever'. বলেছিলেন, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ানের এই দুরবস্থা, আর ক্রাইস্টের শাশ্বত শান্তি সুখ — আকাশপাতাল প্রভেদ। 'Behold the destiny of him who has been called the great Napoleon! What an abyss between my deep misery, and eternal religion of Christ.' আবার বলেছিলেন, অনন্ত মহিমময় শ্রীভগবানের নিকট নেপোলিয়ানের উজ্জ্বল প্রতিভা কিছুই নয় — অত্যন্ত নগণ্য। 'There exists an Infinite Being. Compared with Him, I Napoleon with all my genius, am truly nothing, a pure nothing!'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ক্রাইস্ট কামক্রোধাদি সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন। এর পরই শাশ্বত সুখশান্তি লাভ হয়। তাই তাঁর ধর্মোপদেশ চিরকালের সত্য। তাঁর ধর্মরাজ্যের বিনাশ নাই।

সংসারী জীব কি সব নিয়ে আছে! Environments অন্য রকম। ওতেই adaptation হয়ে গেছে। তাই বলে, 'বেশ আছি।'

অবতার আসেন এই জড়তা ভাঙ্গাতে। তিনি এসে শক্তি দেন তবে এই জড়তা ভাঙ্গে। Source of strength (শক্তিকেন্দ্র) হলেন অবতার। তবুও কি চৈতন্য হয় লোকের? এই সবে মাত্র এয়েছেন। ক'টা লোকের চৈতন্য হচ্ছে? চৈতন্যদেব তাই মাকে বলেছিলেন, 'তুমি গৃহে থাকতে বলছো তাই থাকবো, কিন্তু দেহ থাকবে না এই অগ্নির ভিতর।' মা শুনে বললেন, 'যেখানে তোমার শরীর থাকে যাও'। তবে সন্ন্যাস হলো। 'সংসার জ্বলন্ত অনল' ঠাকুর বলতেন। ঠাকুরও কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন জগন্মাতাকে, 'মা, এ কামিনীকাঞ্চনের ভিতর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। দেহ থাকবে না।'

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — আজকাল কত সুবিধা। মঠ এত কাছে। আবার ঠাকুর স্টিমার ক'রে দিয়েছেন। কত ভাল ভাল লোক আছে মঠে — বি.এ., এম.এ. অনেক আছে। কিসে ভগবান-লাভ হয় সেই জন্যে তাঁরা ব্যাকুল। যে যাই বলে তাই করছে। কখনও ধ্যান করছে, কখনও বাজার করছে। কখনও আবার বন্যায় সাহায্য করতে যাচ্ছে। 'ব্রহ্মজ্ঞানী' মায়ের মত ব্যাকুল। 'ব্রহ্মজ্ঞানী' মা ঠাকুর-দেবতা মানে না, বলে, 'লাথি মারি ঠাকুর দেবতায়'। পায়ে না মারলে মুখে বলে বটে। কিন্তু যেই ছেলের অসুখ হলো, ডাক্তার কবরেজ কিছু করে উঠতে পারছে না, পাড়ার বুড়িরা তখন বললে, তারকনাথে হত্যা দাও। কি আর করে, শেষে হত্যা দেয়। এখন যে ছেলের জন্য ব্যাকুল। তেমনি মঠের সাধুরা ব্যাকুল ঈশ্বরের জন্য। মঠের সাধুদের কি শুধু বিদ্যার জোর — সঙ্গে আবার অটুট ব্রহ্মচর্য রয়েছে! তাই তাঁদের knowledge (জ্ঞান) কত বেশী। যা পড়বে, যা শুনবে তাই মনে থাকবে — ব্রহ্মচর্য রয়েছে যে। এনসাইক্লোপিডিক্ নলেজ (বহুমুখী জ্ঞান) এঁদের। ঠাকুর বলতেন, 'ছিদ্র কলসীতে হাজার জল ঢাল, থাকবে না।' তেমনি ব্রহ্মচর্য না থাকলে কিছুই মনে থাকে না। দু-পাতা পড়ে পরীক্ষা পাশ করল, তারপর সব ভুলে গেল — ব্রহ্মচর্য নাই ব'লে। পুরীতে চৈতন্যদেব ভক্তসভায় বসে আছেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈশ্বরীয় কথা সংসারী লোকের মনে থাকে না কেন?' চৈতন্যদেব বললেন, 'ওরা যে যোষিৎসঙ্গ করে।'

ঠাকুরও এই কথাই বলতেন।

এইবার শ্রীম-র কথায় ললিত তিনখানা গান গাহিলেন। তাঁহার কণ্ঠ অতি মধুর, আর তিনি বিবাহ করেন নাই। শেষে গাহিতেছেন —

এমন দিন কি হবে মা তারা।
যখন তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে বইবে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে মনের আঁধার যাবে টুটে।
ধরাতলে পড়বো লুটে তারা বলে হয়ে সারা॥

গান সমাপ্ত হইল। সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই কি শ্রীম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন প্রদান করিতেছেন? শ্রীম বলিতেছেন, বুঝলেন ললিতবাবু, সংসারের এই সব দেখে, কেউ কেউ আদপেই স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় না। কেন যাবে এ গোলকধাঁধায় মরতে?

এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা।

২রা আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

মর্টন স্কুলের তিন তলার বারান্দায় সিক্সথ্ ক্লাস। শ্রীম এই ক্লাসে প্রবেশ করিয়া ছেলেদের বলিতেছেন, দেখ, এখন আমি উপরে গিয়ে চারতলার ছাদ দিয়ে যেখানে জল পড়ে সেই সব জায়গায় চুন সুরকি দেব নিজে। এই কথায় ছেলেরা কেহ কেহ অবাক হইয়া শ্রীম-র মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কেহ বিস্ময়ে বলিল, 'আপনি নিজে দেবেন, রেক্টার মশায়?' শ্রীম বলিলেন, হাঁ গো হাঁ, আমি নিজে দেব। কেহ আবার হাসিয়া ফেলিল। স্কুল ছুটি হইয়াছে। শ্রীম চারতলার ছাদ নিজে হাতে সংস্কার করিতেছেন। একটি ভক্ত সাহায্য করিতেছেন। শ্রীম ভক্তকে বলিলেন, ছেলেরা তখন হাসছিল — এ কাজ নিজে করবো শুনে। এ কথাটি কিন্তু সারা জীবন মনে রাখবে। নিজের কাজ নিজে করবে না তো কে করবে?

অপরাহ্নে একটি ভক্তকে স্বামী অভেদানন্দজীর বেদান্ত সোসাইটিতে

পাঠাইয়া দিলেন। বেদান্ত সোসাইটি সেন্ট্রাল এভিনিউতে স্থাপিত হইয়াছে সম্প্রতি। কিন্তু আজ বক্তৃতা হয় নাই। ভক্ত ফিরিয়া আসিলে বলিলেন, বেদান্ত মানে revelation — ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বর নানা মুখে কথা কন — শুধু কি অবতারের মুখ দিয়ে কথা কন? পঞ্চবটীতে একটি কুকুর এসেছে কি, ঠাকুর বললেন, 'যাই, মা হয়তো এই কুকুরের মুখ দিয়ে কিছু বলবেন'।

৩রা আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

আজ সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা শ্রীম সৎপ্রসঙ্গ সভাতে ছিলেন। উহা মর্টন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রের রবিবাসরিক সম্মেলন — শ্রীম কর্তৃক স্থাপিত। প্রথম প্রার্থনা, তারপর উদ্বোধন সঙ্গীত হয়। তারপর গীতা ও ভাগবত পাঠ। তৎপর ধর্মপ্রসঙ্গ। প্রায়ই মহাপুরুষগণের জীবন-কথার আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয় পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে। সভা শেষ হইলে শ্রীম অন্তেবাসীকে দক্ষিণেশ্বর পাঠাইয়া দিলেন। ইনি সন্ধ্যা সাতটায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে দক্ষিণেশ্বরের সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পঞ্চবটী, বেলতলা, ঠাকুরঘর, হাঁসপুকুর, নহবত, বকুলতলা, মা কালী, রাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবমন্দির, চাঁদনি ও বকুলতলার ঘাট, নাটমন্দির প্রভৃতির কথা, পরম শ্রদ্ধেয় কোনও জীবন্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ন্যায়, অতি ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন। আজ রবিবার, কত লোক হইয়াছিল — ঘাটে ক'খানা নৌকা বাঁধা ছিল — সব জিজ্ঞাসা করিলেন। মনে হইতেছিল, স্বীয় গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন — অমনি শ্রদ্ধা ও সজীব ভাব। সব কথা শুনিয়া শ্রীম বলিতেছেন, 'A good day's work' (আজকের দিনের সদ্ব্যবহার হইল)। ঐ স্থানে ঠাকুর ত্রিশ বৎসর ছিলেন। ওখানকার 'atmosphere is surcharged with spirituality' (ওখানকার বাতাবরণ ধর্মভাবে ওতপ্রোত)।

দোতলার সিঁড়ির বামপার্শ্বের ঘরে শ্রীম উপবিষ্ট। সন্ধ্যার ধ্যানাদি শেষ হইয়াছে। ঘরের মেঝেতে ভক্তগণ বসা। দুই জিতেন, ডাক্তার, বিনয় ও ছোট অমূল্য আসিয়াছেন। অনেক দিন পর 'হিলিং বামের' দুর্গাপদ আসিলেন। শচী, অমৃত, বীরেন, গদাই, মনোরঞ্জন ও ছোট নলিনীও রহিয়াছেন। আরও কেহ কেহ আছেন।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — বেদান্ত সমিতিতে কি সব কথা হলো?

মোহন — অভেদানন্দ মহারাজ বললেন, আত্মার সুখ-দুঃখ নাই, লাভালাভ নাই। ধর্মের দু'টি ভাগ আছে — একটি non-essential (অসার ভাগ) আর একটি essential (সার ভাগ)। আর বললেন, জগৎ চৈতন্যের সহিত জীবের খণ্ড চৈতন্যের যোগ ক'রে দেওয়া — এটা হলো problem of life (জীবন-সমস্যা)।

শ্রীম — ঠাকুর কিন্তু বলতেন, তপস্যা চাই। হাজার বই-ই পড়, আর যাই কর, নির্জনে তপস্যা না করলে কিছুই বোঝা যায় না। ভারতের লোক ধন্য এখানে জন্মেছে বলে। এদের কাছে শুধু পাণ্ডিত্য কাজ করতে পারে না। ও সব ওদেশে — ওয়েস্ট-এ। এখানকার কথা 'তপস্যা কর'। কেশব সেন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন খুব। আমরা তখন স্কুলে পড়ি, সেকেণ্ড ক্লাসে। ইংরেজী ভাল বুঝতে পারি না। তবুও, সন্ধ্যায় লেকচার হবে আর আমরা তিনটের সময় গিয়ে বসে থাকতাম। ইংরেজি, কি তোড়! ফেরার পথে রাস্তায় সব বলাবলি করছে, 'বুঝি নাই এক বিন্দু, কিন্তু বলেছেন খুব' (সকলের হাস্য)! বক্তৃতা যেন নীরস। ওমা, এরপর যখন ঠাকুরের কাছে গেলুম, তখন দেখছি প্রত্যেকটা কথা রসে মাখানো — প্রাণ শীতল হয়ে যায় শুনলে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শাস্ত্রাদি পড়া, তাতেও বিপদ আছে। ঠাকুর বলতেন, শাস্ত্রে চিনিতে-বালিতে মিশান থাকে। শুধু চিনি বেছে কে দেবে তোমায়? সব খাও অসুখ করবে। শাস্ত্র interpret (ব্যাখ্যা) করতে আসেন অবতার। তাঁর কথার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া — যা মিলবে তা নেওয়া, যা মিলবে না তা ত্যাগ করা। যারা লোক-শিক্ষা দেবে তাদের একটু একটু জানা ভাল। এ সব ঢাল-তলোয়ার অপরকে

মারতে হ'লে কাজে লাগে। নিজের জন্য ঠাকুরের একটি মহাবাক্য যথেষ্ট।

শ্রীম (দুর্গাপদর প্রতি) — কাঁচা মনের অনেক ভয়। নিষ্কাম কর্ম করতে গিয়ে অনেকে বাঁধা পড়ে যায়। কর্মযোগ কঠিন। মঠে শুনতে পাই অনেকে ছটফট করে, কখন অবসর হবে তাঁকে ডাকবার। অনেক কাজ কিনা! অনেক সময় মানুষ ঘটকালি করতে গিয়ে নিজেই বিয়ে করে ফেলে। ঘটকালি মানে পরোপকার, এ করতে গিয়ে নিজে বাঁধা পড়ে যায়। কতবড় ভয় কাঁচা মনের! তাই দেখতে পাই, মঠের ওঁরা, যেই একটু অবসর হলো অমনি ছুটে পালান! একজন গিয়েছেন দেরাদুনের দিকে, নির্জনে তাঁকে ডাকবেন বলে।

নির্জনে গেলে তবে ধাত ঠিক থাকে, ঠাকুর বলতেন। আর বলতেন, 'তাঁর কৃপা হলে বেদবেদান্ত আপনা থেকে জানা যায়। মা আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন।' নেহাৎ সুবিধা না হলে, যে অবস্থায় থাকা যায়, সেই অবস্থায় থেকেই তাঁকে ডাকতে হয়। আফিসে কর্ম করছে একজন। সে যদি ভাবে, পরিজনদের শান্ত করবার জন্য আমার এ কর্ম; এরা শান্ত হলে, সম্পূর্ণ মন দিয়ে তাঁকে ডাকবার অবসর হবে — এই ভেবে করলেও কর্মযোগ হয়। উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। যেই অবসর হলো অমনি নির্জনে গিয়ে তাঁকে ডাকা। কর্ম প্রকৃতিতে থাকলে কি যেতে চায়? গুরু ইচ্ছা করেন, তুমি ঐ পথেই তাঁকে লাভ কর। অতবড় উত্তমাধিকারী অর্জুন, তাঁকেই কর্ম করতে হলো। সঙ্কেত বলে দিছলেন, 'আমার জন্য কর, তাতে তোমার বন্ধন হবে না।' কিন্তু তপস্যা চাই। মাঝে মাঝে নির্জনে যাওয়া উচিত।

ভক্তগণ সকলে বিদায় লইয়াছেন। ডাক্তার, বীরেন প্রভৃতি রহিয়াছেন। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। বারান্দায় দাঁড়াইয়া শ্রীম ডাক্তারকে বলিতেছেন, সংসারে থাকতে হলে গৃহপালিত পশুদের আপনার সন্তানের মত দেখতে হয়। ঘোড়াটা মরলো ভারি tragically (মর্মান্তিকভাবে)। এতে গৃহস্বামীকে দোষ স্পর্শ করে। সংসার করা কি মুখের কথা! এলোমেলো হলে হবে কেন? এর চাইতে সংসার

ছেড়ে দেওয়া ভাল।

বীরেন — আমরা কি সংসারের উপযুক্ত?

শ্রীম — ঠিক বলেছেন। পাকা খেলোয়াড় হলে তবে সংসার করা যায় — ঠাকুর বলতেন। গড়ের মাঠে আট আনার সিটে বসে ভক্তদের সঙ্গে সার্কাস্ দেখলেন ঠাকুর। বাইরে এসে বলেছিলেন, দেখ, বিবি অত অভ্যাস করে তবে চলন্ত ঘোড়ার উপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তেমনি পাকা খেলোয়াড় হলে সংসারে থাকতে পারে। নয় তো চাকনা-চুর।

৫ই আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৪

শ্রীম দ্বিতল গৃহে ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটি নক্সা হাতে জনৈক ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। নক্সাটি একটি বাটীর। উহা মর্টন স্কুলের জন্য লইবার কথা হইতেছে। শ্রীম-র ইচ্ছায় ভক্ত নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন — তিনি বলিতেছেন —

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা আমায় এমন একটি অবস্থায় রেখেছিলেন তখন পাঁচজনে আমায় পূজা না করলে অশান্তি হতো।' ভিতরে মাকে দেখতেন কি না, তাই ঐ অবস্থা হতো। আবার বলতেন, 'কখনও এমন অবস্থায় রাখতেন তখন হয়তো পায়খানা পরিষ্কার করতেই লেগে গেলাম।'

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — মা নাগমশায়কে আদর্শ গৃহীর নজিরের জন্য রেখেছিলেন। যাদের লোকশিক্ষার জন্য রাখেন তারা এটা ছেড়ে ওটা ধরা, এরূপ পাঁচটায় হাত দেয় না। একটাতেই crystallised (একাগ্রচিত্ত) হয়। নাগমশায় জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন সেবা কাকে বলে! বাড়িতে অতিথি এলো, তিনি দেখছেন সাক্ষাৎ নারায়ণ এসেছেন। তাঁকে খাইয়ে, তামাক দিয়ে তুষ্ট ক'রে, বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে তবে নিজে খাবেন। তিনি সর্বজীবে সমদর্শী ছিলেন।

নারায়ণের অধিষ্ঠান দেখতেন। তাই সকলকে পূজা করতেন। এ দয়া নয়। দান, দয়া, সেবা — পর পর বড়। দয়াতে বড় বলে অভিমান থাকে। সেবাতে তা নষ্ট হয়ে যায়। ভগবানকে সর্বদা দেখছেন, তাঁর সেবা করছেন। নিজেকে ছোট করেন তাঁর কাছে। তার জন্যই জগতে সেবক সকলের বড় হন। চণ্ডীতে এই কথাই আছে। যারা ভগবানের কাছে ছোট, তারা জগতের আশ্রয়, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।' গৃহে থেকে সম্পূর্ণ সন্ন্যাস কি করে হয় তার দৃষ্টান্ত নাগমশায়। ওঁরা কি কম? ঠাকুর অবতার হলে — সঙ্গের ওঁরা তাঁরই অংশ। নাগমশায় সেবাতে Crystallised (একাগ্রচিত্ত) হয়েছিলেন। কি জানেন, ঈশ্বর মাঝে মাঝে ইনস্পেকশন করতে আসেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। আমরা তখন বলি অবতার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চৈতন্যদেব নিজে সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে রইলেন। নিতাইকে পাঠিয়ে দিলেন বিয়ে করে গৃহী হতে। কি ত্যাগ! আবাল্য সন্ন্যাসী গৃহী হলেন। কেন? গৃহীদের শিক্ষার জন্য। কি করে গৃহে থেকে ভগবানকে ডাকতে হয় তা দেখাবার জন্য নিত্যানন্দ গৃহী। গৃহকে কাজলের ঘর বলতেন ঠাকুর। এখানে থাকলে একটু অন্য রকম হয়। কোথায় সন্ন্যাসীর মুক্ত জীবন — আর কোথায় গৃহী! একবার পুরীতে গেলেন নিতাই, কিন্তু চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে যান না — লজ্জা হচ্ছে। সব ভক্তরা দেখা করলেন। নিতাইকে না দেখে তিনি বললেন, 'আমার নিতাই কোথা?' ভক্তরা বললেন, নরেন্দ্র সরোবরের তীরে। অমনি দৌড়ে গিয়ে দেখা করলেন নিজে, আর সকলকে বললেন, নিতাইয়ের চরণামৃত যে নেবে তার ঈশ্বরদর্শন হবে। কেন এই মান? কত বড় ত্যাগ, জগতের কল্যাণের জন্য! ভগবানের কথায় সন্ন্যাস ত্যাগ করলেন, তাঁর কাছে ছোট হলেন — কিন্তু জগতের কাছে বড়। নিতাই ভক্তগণের আশ্রয়।

বড় জিতেন — এরূপ সম্মান দেওয়ার আর কি কোন মানে আছে?

শ্রীম — আছে বৈ কি? ভগবান কাউকেই ছাড়তে পারেন না।

সকলের উপর তাঁর সমান ভালবাসা। আমরা তাঁকে ভুলে থাকলেও তাঁর দৃষ্টি আমাদের উপর সমান। তবে তো সংসারীরা সাহস পাবে। তা হলেই একেবারে ডুবতে পারবে না সংসারে। এই মনে করবে যে, আমরা ভুললেও তিনি ভোলেন না আমাদের। যেমন নিতাইকে ভুলতে পারেন নাই। তাই ক্রাইস্ট বলেছেন, '...for he maketh his sun to rise on the evil and on the good,' (St. Matthew 5:45) – সূর্যের ন্যায় তাঁর করুণা সকলের উপর সমান।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — রামচন্দ্র রাজ-দরবারে বসে আছেন নারদ গিয়ে উপস্থিত। রামসীতা সিংহাসন থেকে নেমে অমনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। আর স্তব করে বলতে লাগলেন, ‘প্রভো, আপনারা জগদ্‌গুরু সন্ন্যাসী — লোকশিক্ষার জন্য গৃহীকে দর্শন দেন।’ নারদ উত্তর করলেন, ‘রাম, আমার কাছে গোপন করা চলবে না। আমি জানি তুমি কে। তুমি পরব্রহ্ম, তারক ব্রহ্ম; ইদানীং নরদেহ ধারণ করে এসেছো — রাবণ বধের জন্য।’ রাম মুচকি হাসলেন। মহাপ্রভু নিতাইকে কেন এই সম্মান করলেন, নারদকেই বা কেন রাম সাষ্টাঙ্গ করলেন? কারণ, তিনি করলে অপরেও করবে। অপরে করলে উদ্ধার হয়ে যাবে। ‘আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।’ তাই আমাদের উচিত, তিনি যা বলেন ও করেন তা পালন করা। তিনি আমাদের জন্য ভাবছেন বেশী। আমরা তাঁর হাতে।

রমণী গাহিতেছেন —

আশুতোষ শিবশঙ্কর ভোলা
আধ চাঁদ ভালে, কপাল কুণ্ডল, কণ্ঠে হলাহল ফণীন্দ্র দোলা॥
বিভূতিভূষণ বৃষবরবাহন, বাঘাম্বরধর ডমরু বাদন;
বববম্ বববম্ উথলে ঘন, কল কল খল খল উথলে গঙ্গা॥

কলিকাতা, ৬ই আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।
২১শে শ্রাবণ ১৩৩০ সাল, সোমবার শুক্লা দশমী।

বিংশ অধ্যায়

‘অজ্ঞান’-রোগের হাসপাতাল — মঠ

১

মর্টনের সেই দ্বিতল গৃহ। সন্ধ্যার পর শুকলাল ‘কথামৃত’ পাঠ করিতেছেন। তৃতীয় ভাগ ঊনবিংশ খণ্ড ও চতুর্থ ভাগ চতুর্বিংশ খণ্ড — শ্রীম-র নির্দেশ মত। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম বলিতেছেন, যা পড়া হলো, তা কিছুক্ষণ ধ্যান করা যাক্। তারপর অন্য কথা বলা ভাল। ধ্যান মানে, environments (পরিবেশ) থেকে মনকে perfectly detached (সম্পূর্ণরূপে পৃথক) করা। যার ভিতর born and brought up (জন্ম ও বড় হয়েছে) তা থেকে মনকে একেবারে তুলে আনা। এই বলিয়া শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন। ভক্তগণও ধ্যান করিলেন। তৎপর ঈশ্বরীয় কথা হইতে লাগিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলছেন, ‘আমি কে, আর তোরা কে — এ জানতে পারলেই হলো। আর কিছুর দরকার হবে না।’ অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর, অবতার হয়ে এয়েছেন — এ জানলে, ভক্তরা তাঁর অংশ, পার্ষদ হবে — এ কথা জানতে পারলে তারা আর মায়ায় পড়বে না। ঠাকুর বলেছিলেন, (শরীর দেখাইয়া) ‘এর ভিতর দু’টি আছে — একটি ভক্ত, আর একটি “মা”।’ ভক্তেরই ক্যানসার হয়েছে। দু’টি পক্ষী — একটি সাক্ষিস্বরূপ, অপরটি সুখদুঃখ ভোগ করছে। ন্যাংটাকে (তোতাপুরীকে) বলেছিলেন, ‘এটি যতদিন না বোধ হচ্ছে, তোমার যাবার যো নাই।’

বড় জিতেন — তাঁর আবার জানবার বাকী ছিল কি?

শ্রীম — লোকশিক্ষার জন্য সব করতে হয়েছিল। লোক ভাবুক — দেহ অনিত্য, তখন সুখ-দুঃখে সর্বদাই তাঁকে ডাকবে। তাই অসুখ গ্রহণ। মা’র অনন্ত রূপ। ন্যাংটা সেজে তিনিই বেদান্ত

শুনিয়েছিলেন। যারা লোকশিক্ষা দেয়, তাদের পাঁচ রকম জানার দরকার হয় কি না! তাই মা একটু শুনিয়েছিলেন। শুনে, দেখে (বললেন), 'ও, এ-এই'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিবেকানন্দ যখন ও-দেশ (পাশ্চাত্ত্য) থেকে এলেন, তখন একদিন বলরামবাবুর বাড়ির ছাদে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়' — তাঁর (ঠাকুরের) এ কথাটা এখনও বুঝতে পারি নাই। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন কিন্তু। কেউ কেউ একটু-আধটু পড়ে বা তপস্যা করেই বলে, আমি বুঝে ফেলেছি, 'সোঽহং'। তা কি অত সহজে হয়? সংসারে যারা আছে তাদের তো বোঝা আরো কঠিন। সংসারে adaptation-এ (জড়িত হয়ে) সব ভুলে আছে। এক মাতাল খানায় পড়ে আছে। চৌকিদার ডেকে বলছে 'ওঠ।' মাতাল উত্তর করলো, 'বেশ আছি বাবা, কেন সুস্থ দেহ ব্যস্ত করছো ডেকে।' সংসারীদের এই অবস্থা। কামিনীকাঞ্চনে বেহুঁস। জোর করে তুলতে গেলে খুব কষ্ট পায়, কাঁচা দাঁত তুলতে গেলে যা হয়। তবে উপায় আছে, গুরু সহায় হলে সব হতে পারে। তাঁর কৃপাতে হাজার গাঁটওয়ালা দড়িও খুলে যায়। গুরুকৃপা! গুরু হলেন সচ্চিদানন্দ। তিনি অবতার হয়ে আসেন। তিনি ছাড়া আর গুরু নাই। গুরুকৃপা, গুরুকৃপা — গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

'গুরুকৃপা' হলে এক এক করে পরদা উঠে যায়, আর ভেতরের mystery (ঐশ্বর্য) দেখে লোক অবাক হয়ে যায়। কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থেকে থেকে মনের উপর এমনি পাক পড়ে যায় যে শীঘ্র খুলতে চায় না। এই প্রতিকূল সংস্কার একমাত্র গুরু বদলাতে পারেন। 'গুরু মেহেরবান তো চেলা পালোয়ান।' গুরুবাক্যে বিশ্বাসের জন্যই তপস্যার দরকার। তপস্যা করলে কিছু বোঝা যায়। Intellectually (বিচার দ্বারা) বোঝবার বিষয় নয় এসব।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — তিনি দেখছেন সব। আমাদের অত ভাবতে হবে না। আমরা তাঁর হাতে পড়েছি। তিনি আমাদের হাতে পড়েন নাই। যা বলেছেন, তা করতে চেষ্টা করা। বাকী সব তিনি

করবেন। অনেকের এমনি শুভ সংস্কার যে, ঠাকুরকে অবতার বলে ফস্ করে চিনে ফেললো, অনেকে তা পারলো না। কেন তাদের হলো? না, পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা করা ছিল। গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হলেই বলে — 'কিন্তু'। তপস্যা ছিল বলেই তারাও চিনলো আর ঠাকুরও ভালবাসলেন। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করলে আর কিছু করতে হয় না। নইলে কাজ বেড়ে যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমার জন্য এ সব জ্ঞাতি বধ হলো।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'ও কিছু নয়।' যুধিষ্ঠিরের 'কিন্তু' রয়ে গেল। এই জন্য রাজসূয় যজ্ঞ। কাজ বেড়ে গেল। হাজার বই-ই পড়, আর তপস্যাই কর, গুরুকৃপা না হলে কিছুই হবে না। সেইজন্য প্রার্থনা করতে হয় — শরণাগত শরণাগত। আর মাঝে মাঝে মাকে ডাব-চিনি মানতে হয়।

ডাক্তার — তা হলে তপস্যা করতে বলেন কেন গুরু?

শ্রীম — তপস্যা কি আর কেউ করে? গুরুই করেন ভক্তের দ্বারা। এইটি একটি লীলা। গুরুর উপদেশ নিয়ে তপস্যা করলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস হয়। তাঁর কথায় বিশ্বাস হলেই হয়ে গেল। কর্ম অনেক কমে যায়। তিনি নিজে সব করে দেন তখন। আর গুরুর উপদেশ না নিয়ে তপস্যা করলে, অমনি একটি ঘর হবে, তাতে বসে পুরশ্চরণের আয়োজন হবে। আর দশজনে দেখে বলবে, 'আহা ইনি বড় সাধু।' গুরু-করণ হলে তিনি বলে দেন, তাঁকে ডাকতে হয় অতি গোপনে, আর নির্জনে। অপর কেউ জানতে না পারে। নির্জনে গোপনে তপস্যা করলে স্বরূপকে জানা যায়, 'আমি'-কে চেনা যায়। উপাধি সব দূর হয়ে যায় — আমি অমুকের পিতা, অমুকের পুত্র এই সব।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'সোঽহং' কে বুঝতে পারে? যার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে কামিনীকাঞ্চনের ভিতরে থেকে। এমন কারো হয় কি, কেউ আছে? মুখে বললেই হলো, 'সোঽহং, সোঽহং'? ও বলবার যো নাই, তপস্যা না করলে। ও বুঝবার উপায় নাই। মেনে নিলে হয় না।

একটি ভক্ত তপস্যার কথা বলায় ঠাকুর বললেন, 'অমৃত বেশ বলে। একজন অতি কষ্ট করে কাঠখড় জোগাড় করে আগুন

জ্বালিয়েছে। তখন অনেকেই সে আগুন পোয়াতে পারে কি না বল?' অর্থাৎ তিনি আগুন ক'রে রেখেছেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে তাদের কিছু করতে হবে না। তারা গুরুর তপস্যার benefit (সহায়তা) পাবে। ভক্তটির ইচ্ছা, তপস্যা করে। ঠাকুর কেমন সুন্দর ভাবে অমৃতের নাম ক'রে জবাব দিলেন, two sides meet করে (দু'দিক মিলিয়ে) দিলেন।

জগবন্ধু — কা'কে বলেছিলেন একথা?

শ্রীম — একটি ভক্তকে। অনেকে নাম প্রকাশ করতে চায় না কি না, ইচ্ছা করে না পাঁচজনে জানে।

শ্রীম (বিনয়ের প্রতি) — মঠের সংবাদ কি বল।

বিনয় (অতি মৃদু স্বরে) — আজ্ঞে, আজ যাই নাই।

শ্রীম (শুনতে না পেয়ে) — Louder please (সকলের উচ্চহাস্য)।

বড় জিতেন — হাইকোর্টে একজন উকিল আস্তে আস্তে মিন্ মিন্ করছিলেন, আমরা বললুম জোরে বলুন।

শ্রীম — না, এঁরা তা করবেন না — মঠের লোক যাঁরা। তাদের সঙ্গে এঁদের তুলনা! এঁদের অজুত হস্তির বল। (উত্তেজিত হয়ে) কি বলছেন আপনি, এঁদের সঙ্গে সংসারীগুলোর তুলনা? এগুলোর নিজের ideal (আদর্শ) নিজেই — ছ্যা ছ্যা! মঠে খুব গুণবান লোক অনেক আছে। কত পাস করে গেছেন। তাঁদের রোখ্ কত — কি earnest (ব্যাকুল)! হবে না! এদিককার কত সব ছেড়ে গেছেন।

জনৈক ভক্ত — ঠাকুর নাকি আগে থেকেই জানতে পারতেন, কেমন সব লোক আসবে?

শ্রীম — হাঁ, মা আগে থেকেই জানিয়ে দিতেন, কি রকম ভক্ত আসবে। গৌরাঙ্গদর্শন হলে বুঝতেন, গৌর ভক্ত আসবে। কালী দেখলে শাক্ত আসতো, এইরূপ। কিন্তু অন্তরঙ্গদের প্রত্যেককে মা বহু পূর্বেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বাইশ-তেইশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁদের জন্য। তারপর অন্তরঙ্গরা গিয়ে সব জুটলো।

৭ই আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

শ্রীম-র শরীর খারাপ। কয়েকদিন ধরিয়া বাম হাতে বাতের বেদনায় ভুগিতেছেন। তথাপি ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নাই। এ দিকে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব চলিতেছে। ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বলিয়া এই ব্রাহ্মসমাজকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করেন। অসুখ লইয়াও উৎসব দর্শন করেন। সমাজের আচার্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন উপলক্ষ্য করিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। ১৭ই আগস্ট শুক্রবার সেই দিন ছিল। কিরূপে কি আলোচনা করিতে হইবে উপদেশ দিয়া শ্রীম মোহনকে পাঠাইয়া দিলেন। মোহন, আচার্য নন্দলাল সেন, প্রমথনাথ সেন প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন। সেই সময় দেখিলেন, অসুস্থ শরীর লইয়া শ্রীম কয়েকজন ভক্তসঙ্গে সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঈশ্বরীয় কথায় শ্রীম দেহের অসুখ ভুলিয়া গিয়াছেন।

আজ ২০শে আগস্ট। শ্রীম-র শরীর ভাল নয়। বেলুড় মঠ হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। ইনি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান তীর্থস্থান দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। বিভিন্ন তীর্থ, সাধু ও ভক্তগণের কথা মত্ত হইয়া শ্রীম শুনিতেছেন। সাধু ভুবনেশ্বর, পুরী, মাদ্রাজ, কাঞ্চী, পক্ষীতীর্থ, চিদম্বরম, শ্রীরঙ্গম, বালাজী, মীনাক্ষী, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী দর্শন করিয়াছেন। তারপর নাসিক, পঞ্চবটী, পুণ্যপত্তন, দ্বারকা, প্রভাস প্রভৃতি দেখিয়া হিমালয়স্থিত যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদার, বদ্রী, হৃষিকেশ, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি সমুদয় তীর্থ দর্শন করিয়াছেন। নানা স্থানের প্রসাদ ও নির্মাল্য লইয়া আসিয়াছেন।

শুষ্ক বিল্বদল কিংবা তুলসীপত্র যেন মহামূল্য মণি। আর চন্দন, কুমকুম, মিষ্টান্নাদি প্রসাদ যেন অমূল্য সম্পদ। এই সব অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়া শ্রীম আজ জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। বালকের ন্যায় আনন্দ ও চপলতায় পরিপূর্ণ। স্বভাবগম্ভীর শ্রীম আজ বাচাল। অতি আগ্রহে একটি একটি তীর্থের নাম দশ বার লইতেছেন। ভক্তদের বলিতেছেন, এই দেখুন, মহাপ্রসাদ ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন। দর্শন,

স্পর্শন ও সেবন করুন। এই দর্শন করুন জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, এই রামেশ্বরের, এই কন্যাকুমারীর — এটি মায়ের প্রসাদ। এই দ্বারকানাথের প্রসাদ। এই হিমালয়ের কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণের মহাপ্রসাদ। এই বিশ্বনাথের নকুলদানা।

এতক্ষণে বহু ভক্ত আসিয়াছেন। ডাক্তার, শুকলাল, দুই জিতেন, অমৃত, যোগেন, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট নলিনী, রমেশ ও নায়েব প্রভৃতি আসিয়াছেন। কাটিহার হইতেও একজন আসিয়াছেন, ইনি আজই স্বামী সারদানন্দজীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গেও একজন ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীম-র অনুরোধে সন্ন্যাসী দুইটি গান গাহিলেন। একটি ঠাকুরের, আর একটির ভাব — হরি এসো, হৃদয়েতে বসো, তোমার রাতুল চরণ অশ্রুজলে ধুইয়ে দেব। সাধুটি গাইয়ে লোক। গান শুনিয়া শ্রীম বলিলেন — ঠাকুর বলতেন, 'গানেও তাঁকে ডাকা যায়।'

সঙ্গী ভক্ত — কথামৃতে আছে, আপনি ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আজ কি আর গান হবে?'

শ্রীম (উচ্চ হাস্যে) — হাঁ, তাঁকে তো আর বলা যায় না, একটি গান হউক। আর ঐরূপ বললুম। কতক্ষণ চিন্তা করে ঠাকুর বললেন, 'না, আজ আর হবে না। কলকাতা বলরাম বসুর বাড়ি যাব সেখানে হবে, তুমি যেও।' বলেই বললেন, 'কি বললাম বল দেখি।' আমরা বললাম, 'বলরামবাবুর বাড়ি — বোসপাড়া, বাগবাজার — যাব। ওখানে গিয়ে শুনব গান।' তখন বললেন, 'হাঁ ওখানে যেও।'

শ্রীম (সকলের প্রতি) — সাধু ভক্ত অবতার — এঁরা গিয়েই তো তীর্থ উদ্ধার করেন। শঙ্কর কেদার বদ্রী উদ্ধার করলেন, চৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবন। ধান ক্ষেতে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। পূর্বের (শ্রীকৃষ্ণরূপের) কথা মনে হয়েছে কিনা! আর ভাবে বললেন, এই 'রাধাকুণ্ড'। তারপর ঐ স্থানে খনন করে এখনকার রাধাকুণ্ড হয়। ব্রজবাসী ছেলেরা মা'দের কাছে গিয়ে বলছে, গানে আছে, 'দেখে এলাম এক নবীন সন্ন্যাসী গৌরবরণ। আমাদের কানাইয়ের মত, কাঁদছে তরুর ডাল ধরে!'

লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত করলেন। আবার নূতন তীর্থের সৃষ্টি করলেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। অন্দরে সকলে ঢুকতে পারে না। বৈঠকখানায় সকলেই যেতে পারে। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না; কিন্তু সাধুরূপে, সিদ্ধপুরুষরূপে, পরমহংস, ভক্ত — এই সব রূপে পেতে পারে। ইনি ঈশ্বর, অবতার — এ অন্দরের হিস্যা। ওখানে ঢোকা কঠিন। তিনি permit (অনুমতি) না দিলে ওখানে যাওয়া যায় না। (স্বগতঃ) তিনি কে গো — যাঁর কথায়, যাঁর চিন্তায় মন স্থির হয়ে যায়? যাঁর একটি গান শুনলে জগৎ ভুল হয়ে যায়, যোগীর অবস্থা হয়, তিনি কে? (ভক্তদের প্রতি) — যোগীর অবস্থা মানে, যাঁর মন সর্বদা তাঁর পাদপদ্মে স্থির হয়ে থাকে — 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। (পাতঞ্জলীর যোগসূত্র) একেই সমাধি বলে। যোগী — যিনি মনকে বশীভূত করেছেন, ভোগী — যিনি মনের বশীভূত।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ আমাদের কত সৌভাগ্য। এখানে বসিয়ে কত তীর্থ করালেন। তাঁর মহাবাক্যে রয়েছে — 'শরীর কিছু করে না, মনই সব'। বেশ্যালয়ে যে গেল তার বৈকুণ্ঠে গতি হলো — আর যে ভাগবত শুনছিল সে গেল নরকে — দুই বন্ধুর গল্প বলে এই কথাই বলেছিলেন ঠাকুর। শরীর তো সর্বদা সকল স্থানে যেতে পারে না, মনকে পাঠিয়ে দিলেই হলো। বুড়ো হয়েছি, যেতে পারি না, তাই এঁদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। এঁদের মুখে শুনে সে বিষয়ে ধ্যান করলে প্রায় যাওয়ার কাজ হয়। ষোল আনা না হলেও চৌদ্দ আনা হয়। কারো কারো ষোল আনাই হয় — যাদের খুব powerful imagination (সুতীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তি)। তাই আমি সব তীর্থ, মহাপুরুষ, তপস্বী এ সবের কথা শুনি। আর খুঁজে খুঁজে প্রসাদ নি। আজ আমাদের মহাভাগ্য, ঘরে বসে সব তীর্থ হলো।

২০শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

আজ ঝুলন একাদশী। ভক্তের বৈঠক বসিয়াছে দ্বিতলের রাস্তার পাশের ঘরে। গতকল্যের সকলেই আসিয়াছেন, অধিক আসিয়াছেন শচী, মণি ও বিরিঞ্চি। এখন রাত্রি আটটা। শচীকে ভাগবত পাঠে নিরত করিয়া শ্রীম আহার করিতে গেলেন। আসিয়া শুনিলেন, ধ্রুবলোকের কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ধ্রুবলোকের কথায় মিহিজামের কথা মনে পড়লো। আমরা দেখতাম জামতলায় বসে তারকামণ্ডল, সপ্তর্ষি। সপ্তর্ষি ধ্রুবের চারিদিকে ঘুরছে। এখানেও আছে — কিন্তু দেখবার সুবিধা হয় না। এখানে মনকে ছোট করে রাখে। (তর্জনী দিয়া গৃহ দেখাইয়া) এই compartment-এ (গৃহস্থাশ্রমে)।

ওখানে, মানে নির্জনে বড় জিনিস দেখা যায়। 'ব্রহ্ম' মানে বড় জিনিস। নির্জনে গেলে এ সব উদ্দীপন হয়। তখন যেমন একটা হাঁড়ির মাছ সাগরে গিয়ে পড়লো, মনে হয়। এখানে সব সময় কামিনীকাঞ্চনের বেড়ার ভিতরে থেকে মন ছোট হয়ে যায়। এ environment-এ (আবেষ্টনীতে) বেশী থাকতে থাকতে adaptation (অভ্যস্ত) হয়ে যায়। মনে হয়, বেশ আছি। মন চীনা মেয়েদের পায়ের মত হয়ে যায়। শৈশব থেকে তাদের পা লোহার জুতায় বেঁধে রেখে দেয়। তাই তেমনি ছোট থাকে সারা জীবন। এটাকে সৌন্দর্যের চিহ্ন বলে, কিন্তু ওদিকে যে ছোট হয়ে গেল সেদিকে লক্ষ্য নাই। মনও সংসারে থেকে ছোট হয়ে যায়। মথুরবাবুর বাড়ি থেকে রাত দু'টোর সময় ঠাকুর চলে এলেন। কোথায় জানবাজার আর কোথায় দক্ষিণেশ্বর! মথুরবাবু বললেন, বাবা, অত রাত্রে গাড়ী কি করে জোতে? ওরা সব ঘুমিয়ে আছে।' 'আমি হেঁটে যাব' — বলেই রওনা। তখন আর কি করেন, ঐ সময়ই গাড়ী ক'রে পাঠান। যতক্ষণ ভক্তির বাঁধন ছিল ততক্ষণ ছিলেন। বুঝি বা কোনও দোষ হয়েছে, তাই চলে এলেন! কামিনীকাঞ্চনের ভিতর আর থাকতে পারলেন না। যতক্ষণ ছিলেন, শুধু ভক্তির জোরে ছিলেন।

শ্রীম — এটি কি জিনিস এই ধ্রুব — যার চারদিকে সপ্তর্ষি

ঘুরছে? কেনই বা ঘুরছে? আমরা দেখতুম আর ভাবতুম। (মোহনকে দেখাইয়া) এই ইনিও দেখেছেন। (মোহনের প্রতি) কেমন, না? (ভক্তদের প্রতি) আজ ঝুলন, শ্রীকৃষ্ণের কথা হওয়া উচিত, তবে তাঁর উদ্দীপন হবে। এই বলিয়া গান ধরিলেন ঃ

বংশী বাজিল ঐ বিপিনে।
(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ, ২য় খন্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীম — রাত দশটা-এগারটা। বিছানায় বসে ঠাকুর গেয়েছিলেন। অসুখ তখন। (ছোট নলিনীর প্রতি) ভাগবত পাঠ হোক, রাস পঞ্চাধ্যায়। আজ গোপীদের কথা পড়া ভাল। গোপী গীতা।

পাঠক (পড়িতেছেন) — গোপীগণ বলিলেন, হে সখে, তুমি বাস্তবিক যশোদার সন্তান নহ। নিখিল প্রাণীর অন্তরাত্মা তুমি। বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি যদুকুলে উৎপন্ন হইয়াছ।

শ্রীম — অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্যমনের অতীত, তিনি ঠিক মানুষের মত হয়ে এসেছেন জগতের কল্যাণের জন্য। প্রথম প্রথম নন্দ, যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলে জানতেন। কিন্তু এখন তাঁর কৃপায় তাঁকে ঈশ্বর বলে চিনতে পেরেছেন। তাই জগতের অন্তরাত্মা বলছেন তাঁকে। গোপীরাও চিনেছিলেন। তাই বলছেন, 'আমরা তোমার অশুল্ক-দাসিকা'। মানে, আমরা তোমার বিনে-কড়ির দাসী — মাইনে নেই। 'কথামৃতে'র প্রথম মন্ত্রটিও গোপীদের এই সময়কার উক্তি — 'তব কথামৃতম্'...। রাসমণ্ডল থেকে অন্তর্ধান হলেন ভগবান, গোপীগণ একেবারে বিরহে উন্মাদিনী। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল — এমনি ভালবাসা! সেই ভগবানের ঝুলন চলছে। তাঁর বিষয়ে একটু গান হোক।

নিজেই গাহিতে লাগিলেন ঃ

গান। আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।

গান। কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব-মনমোহন, মোহন-মুরলীধারী।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন।

নয়ন-বাঁকা, বাঁকা-শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদিরঞ্জন;
গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাসরসবিহারী।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)।

(কথামৃত ৩য় ভাগ, ১৯খন্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)

২১শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৪

মর্টন স্কুল, দ্বিতলের পশ্চিমের ঘর। রাত্রি এখন প্রায় আটটা। শ্রীম মেঝেতে দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন। সম্মুখে তিন দিকে মনোরঞ্জন, ছোট নলিনী, শচী, বীরেন, যোগেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয় প্রভৃতি ভক্তগণ উপবিষ্ট। জগবন্ধু বেদান্ত সোসাইটি হইতে বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছেন। আজ সারাদিন বৃষ্টি।

ছোট রমেশ ভাগবত পাঠ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধাতুর হইয়া যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে পাঠাইলেন। বিপ্রগণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। দ্বিতীয়বার যাজ্ঞিক-পত্নীগণের নিকট যাজ্ঞা করিলে, তাঁহারা চতুর্বিধ অন্ন লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন ও তৃপ্তি করিয়া ভোজন করাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। তখন যাজ্ঞিকগণ অনুশোচনা করিতে লাগিলেন!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই ঠাকুর ভক্তদের বাড়িতে গেলে চেয়ে খেতেন। নন্দ বোসের বাড়িতে গেছেন। ওরা জানে না এসব, তাই চেয়ে খেলেন। নিজেই বললেন, 'কিছু মিষ্টি মুখ করাতে হয়'! ভক্তদের নিকট থেকে ভগবান এরূপভাবে চেয়ে খান। তার মানে, তাদের কৃপা করেন। যাজ্ঞিক-পত্নীগণের নিষ্কাম ভক্তি ছিল, তাই তাঁরা সংবাদ পেয়ে অন্ন নিয়ে ছুটে এলেন। যাজ্ঞিকগণ সকাম ভক্ত ছিলেন। তাই যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হলে অন্ন দিলেন না। এঁদের এই জ্ঞান নাই — যজ্ঞেশ্বর ভগবান স্বয়ং শরীর ধারণ করে অন্ন চাইছেন। তাঁরই মহামায়া আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁদের দোষ নাই। পরে পত্নীদের দেখে ওঁদের চৈতন্য হলো, আর অনুশোচনা করতে লাগলেন।

স্ত্রীলোকদের কিন্তু কোনও উচ্চ সংস্কার ছিল না। একমাত্র নিষ্কাম ভালবাসায় ঈশ্বরলাভ করলেন। তাঁরা এখন ঈশ্বরতুল্য — ঠিক ঠিক ভক্ত আর ভগবান এক। তাই তাঁদের কৃপায়, তাঁদের পতিগণের শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে বোধ হলো।

নন্দ বোসের বাড়িতে ঠাকুরকে ওরা চিনতে পারে নাই। ওরা জানতো দক্ষিণেশ্বরের সাধু এসেছেন। সাধু যদি গৃহস্থ-বাড়িতে যান সাধ্যমত তাঁদের সেবা করতে হয়, তাও ওরা জানতো না। তাই চেয়ে খেলেন। এতে ওদের শিক্ষা হবে। তাঁকে — সাক্ষাৎ ঈশ্বর নররূপে এসেছেন — কি করে তারা বুঝবে, না বোঝালে?

তাই ঠাকুর বলতেন, 'কথাটা হচ্ছে, সচ্চিদানন্দে প্রেম'। তাঁকে ভালবাসা। বিপ্রপত্নীগণ এই প্রেম দিয়ে ঈশ্বর লাভ করলেন। তাঁরা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেছিলেন। মন পড়ে ছিল শ্রীকৃষ্ণে, শরীরটা দিয়ে গৃহকর্ম করতেন। তাই ঠাকুর দুই বন্ধুর গল্প বলতেন। তার সার — মনই সব।*

শ্রীম — (ডাক্তারের প্রতি) — খুব কঠিন, গৃহে থেকে ঈশ্বরলাভ। নানা আসক্তিতে জড়িত হয়ে পড়ে। তবে তাঁর ইচ্ছায় সব হতে পারে। একটা গল্প আছে। একজন উট খুঁজতে গিছলো চারতলার ছাদে (সকলের হাস্য)। মানে, উট যদি চারতলার ছাদে পাওয়া যায়, তবে ভগবানকেও গৃহে থেকে পাওয়া যাবে। অত কঠিন বলেই ঠাকুর বলতেন, নিত্য সৎসঙ্গ, আর ব্যাকুল প্রার্থনা। আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস চাই।

শ্রীম (বিনয়ের প্রতি) — হাঁ বিনয়বাবু, ক'দিন যাচ্ছ মঠে? মঠে গেলে তাঁদের কাজ করতে হয়। মঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয়, আপনাদের কোন কাজ করতে পারি কি? ঠাকুর দেখতে গেল, আর মন্দিরে ঢিপ করে প্রণাম করে চলে এলো — এতে কি আর হয়? একজন ভক্ত মঠে গেছেন সাধু-দর্শন করতে, তাঁরা তখন কাজে

---

*ভাগবত পাঠে ও বেশ্যালয়ে গমনকারী দুই বন্ধু — প্রথমটি যায় নরকে, দ্বিতীয়টি বৈকুণ্ঠে।

ব্যস্ত। 'আচ্ছা, তাহলে এখন আসি' — এই বলে চলে এলেন (সকলের হাস্য)। হাঁ সুধীরবাবু, বাসায় কে চলে এসেছিল — সাধুরা যখন আলমারি নামাচ্ছিলেন? তাঁদের কত কষ্টের অন্ন, তা গ্রহণ করলুম, আর একটু কাজের বেলায় পলায়ন। তাঁদের যে সেবা করতে পারে সে যে ধন্য। যে ঠাকুরবাড়ির উঠোন ঝাড়ু দেয়, যে বাসন মাজে, সে যে ধন্য! পায় কে সে কাজ? মঠের একটি সাধু ভারতের সমস্ত তীর্থ — চারধাম করে ফিরেছেন। এখানে এসেছিলেন সেদিন। তিনি বললেন, 'আমি যেখানেই গেছি, খাওয়া-দাওয়া রাজার মত পেয়েছি'। আমি বললুম, তা কি আর ওঁর সন্ন্যাসের জন্য পেয়েছেন? কত বড় ঘরের লোক, কার সঙ্গে সম্বন্ধ। ঠাকুরকে চিন্তা করেন কিনা, তাঁরা তাঁর আশ্রিত। তাই এ পূজা পেয়েছেন সর্বত্র। সাক্ষাৎ ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। ঠিক ঠিক যাঁরা তাঁর চিন্তা করেন, তাঁরা সর্বত্র পূজিত হন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর একটি গল্প বলতেন — পাঁচ বছরের শিশু পূজোর বাড়িতে গেছে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। কর্তা তাকে কত আদর করতে লাগলো। রূপোর থালায় দু'তিন রকমের সন্দেশ। ওরা সন্দেশ রোজই খায় কর্তা জানে। সোনার বাটি আর গ্লাস। নিজে কাছে বসে কর্তা খাওয়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে আপ্যায়ন করে জিজ্ঞেস করছে — 'হাঁ খুকু, তোমার দাদু ভাল আছেন — হাওয়া খেতে যান?' (হাস্য)। আবার যাওয়ার সময় — অত চাকর গোমস্তা রয়েছে — কিন্তু নিজে কোলে করে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিলো। কেন করলে এ সব? তার খাতিরে, না দাদামশায়ের নাতনী বলে? দাদামশায় শুনে খুশী হবে তাই করলে। এ সম্মান দাদামশায়ের প্রাপ্য।

ঐ সাধুটি যে সর্বত্র আদর পেয়েছেন, ওতে আর আশ্চর্য কি? কত বড় ঘরের ছেলে। ও ঘরের চাকরী পায় কে? যে পায় সে ধন্য — মহা সৌভাগ্য তার। তাই মঠে গেলে সাধুদের সেবা করতে হয়।

মোহন — একবার মঠে উৎসবে দিনরাত খেটে খেটে সকলে

পরিশ্রান্ত। এখানকার ভক্তদেরও ততোধিক অবস্থা। সন্ধ্যার সময় আমরা বসে একটু বিশ্রাম করছি। কেষ্টলাল মহারাজ এসে সস্নেহে বললেন, ‘যাও, উঠোনটা একটু ধুয়ে দাও — তবে ঠাকুরের ভোগ রান্না হবে। আর কাকেই বা বলি, কেউ করবে না।’

শ্রীম (আহ্লাদে) — আহা, এ কি কেষ্টলাল মহারাজ বলেছেন — ঠাকুরই বলেছেন। পরের সেবা কর, নিজে সেবা নিও না — এই কথা ঠাকুর বললেন এই ঘটনায়। ঠাকুর এই একটি গান গাইতেন।

শ্রীম ভাবোন্মত্ত হইয়া গাহিতে লাগলেন ঃ

গান — আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই (গো)।
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কে বা পায়,
সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী॥....
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে,
পিতা জ্ঞানে নন্দের বোঝা মাথায় বই॥

শ্রীম — তিনি যাদের সেবা গ্রহণ করেন, বুঝতে হবে তাদের প্রতি তাঁর কৃপা হয়েছে। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, ‘চিনির রসে মঠ, হাতি এ সব মিষ্টি তৈরী হয়। আবার সব গুঁড়িয়ে দিলে সেই চিনির রসই হয়ে যায়।’ এই সবই তিনি — বিশ্ব ব্যাপিয়া। তাঁ-থেকে এসে তাঁ’তেই যায়। সকলের খবর করেন তিনি। সুরেশ মিত্রের গাড়ী কলকাতায় আসছে। ভক্তেরা বললেন, ‘ভিতরে স্থান না হয় ছাদে বসবো’। অমনি ঠাকুর বললেন, ‘কি গো, তোমার ওদিক বুঝি খেয়াল নাই, — ঘোড়াটা যে মরবে।’ তিনি সর্বভূতের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছেন কি না, তাই এ কথা। পাতা ছিঁড়তে পারতেন না, — ফুল, বেলপাতা তোলা বন্ধ হয়ে গিছলো। ফুলের গাছকে একটি তোড়া মনে করতেন, বিশ্বনাথের পূজায় নিবেদিত — দেখতেন incessantly (অবিরত) তাঁর পূজা হচ্ছে। তাই আমরা ডাক্তারবাবুকে বলছি, আধ ঘন্টার বেশী থাকলে, গাড়ী বিদেয় করে দিয়ে ট্রামে যাবেন। নূতন ঘোড়া, তাই কষ্ট হবে — আবার সইসেরও কষ্ট।

২২শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৫

শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন। নূতন চারিজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। এখন ছয়টা। ভক্তগণ চলিয়া গেলেন। নিম্নে দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে ভক্তের আসর জমিয়াছে। শ্রীম কিছুকাল পরে আসিয়া ঐ ঘরে উপবেশন করিলেন। শুকলাল ডাক্তার, মনোরঞ্জন, বিনয়, ছোট নলিনী, ছোট রমেশ, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বিরিঞ্চি, যোগেন, মণি, দুর্গাপদ, যতীন নাগ, সুধীর, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়াছেন; গুরু ট্রেনিং স্কুলের একজন শিক্ষকও আসিয়াছেন। ইনি নাগমহাশয়ের সঙ্গ করিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন — চলুন, আমরা ওখানে গিয়ে বসে কথা কই। ওঁরা সব এখন জপটপ করবেন। এই বলিয়া তাঁহারা গিয়া বারান্দায় বসিলেন। শ্রীম-র এই কথা শুনিয়া, ঘরের মধ্যে ছোট জিতেন ও আর একজন ভক্ত ধ্যান করিতে বসিলেন। তারপর সকলে ধ্যান করিতেছেন। এখন সাড়ে আটটা। শ্রীম ঘরে আসিয়া মেঝেতে বসিয়াছেন। সব শান্ত। ক্ষণকাল পর তিনি ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ দু' থাকের ভক্ত। অন্তরঙ্গ যারা, তাদের চৈতন্য সহজেই হয়ে যায়, বহিরঙ্গদের একটু অহংকার থাকে। তাহাদের ভাব, তপস্যা না করলে জ্ঞান লাভ হবে না। ঠাকুর উপমা দিতেন, নাটমন্দিরের ভিতরের থাম আর বাইরের থাম। ভিতরের থাম যেন অন্তরঙ্গ, বাইরের বহিরঙ্গ। কিন্তু সবই থাম। অন্তরঙ্গদের দ্বারা কাজ করাবেন তাই অত ভালবাসতেন। আমেরিকা ইউরোপ, কত স্থানে কাজ করাচ্ছেন।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — এক দিন রাত ন'টা। ঘরে কেউ নাই। ঠাকুর পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে গঙ্গা কল কল রবে বয়ে যাচ্ছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেখ, কেউ যেন মনে না করে, আমি না হলে, চলবে না।' অমনি চুপ, আর কোনও কথা নাই। তখন এর অর্থ বুঝতে পারতুম না। এখন একটু একটু বোঝা যাচ্ছে। জলের কত নল রয়েছে। একটি নল

ভেঙ্গে গেলে কি আর জলের কল বন্ধ হয়ে যায়? ইঞ্জিনীয়ার ভাঙ্গাটা বদলিয়ে ভাল একটা লাগিয়ে দেয়। তাঁর অনেক নল আছে। একটা ভাঙ্গে তো নূতন আর একটা বসিয়ে দেবে। তাই ভক্তদের অহঙ্কার না হয় — আমি নইলে চলবে না।

শ্রীম (দুর্গাপদর প্রতি) — আর একদিন পূর্ণিমা। কলুটোলায় নবীন সেনের বাড়ি ঠাকুর গেছেন। কেশব সেনের শরীর গেছে। আমি তখন শ্যামপুকুরে থাকি। একটু risk (বিপদ) নিয়ে বাসায় সব ঘুমালে চলে এলাম। নবীন সেনের বাড়ির রোয়াকে বসে সব গান শুনছি। ঠাকুর উপরে। আঃ, কি নৃত্য! কথা শুনতে পাই নি। গান সব শুনেছিলাম। ওদের বাড়ির অপর সব ঘুমন্ত। আমি যে নিচে বসে আছি, তাঁরা কেউ জানতে পারে নাই।* তারপর রাত তখন বারটা, একা ফিরে যাচ্ছি। আহা, কি চাঁদ কোজাগরী পূর্ণিমার! আজও মনে হচ্ছে যেন সে-দিন। পরের দিন সকলে বসে। একঘর লোক। আমি একটু তফাতে ছিলাম। ঠাকুর নিকটে এসে ফস্ করে বললেন, 'গোপনে খুব ভাল'। তিনি জানতে পেরেছিলেন আমি এসেছিলাম। বললেন, গোপনে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় — এ খুব ভাল। আমাকে encourage (উৎসাহিত) করলেন।

শ্রীম আহার করিতে উপরে গেলেন। ভক্তগণ কথামৃত পাঠ শ্রবণে নিরত। জন্মাষ্টমী ১৮৮৫, পাঠ চলিতেছে। গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া স্তব করিতেছেন। এম. ডি. পাস ডাক্তার ভগবান রুদ্রের কথাও হইল।

শ্রীম-র নিচে আসিতে একটু দেরী হইল। উপরে একটি বিড়াল-ছানার সেবা করিতেছিলেন। নিজে উহাকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া এই বাচ্চাটি অতিথি। আপনিই আসিয়া উপস্থিত। তদবধি উহাকে খাওয়ানোর ভার দিয়াছিলেন যতীন নাগের উপর। সে আজ খাওয়ায় নাই। তাই নিজে খাওয়াইতেছিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আসতে দেরী হলো। গৃহে একটি

*এই সেন পরিবার শ্রীম-র শ্বশুরসম্পর্কীয়। কেশব সেন মহাশয় শ্রীম-র সম্বন্ধী।

অতিথি এসেছেন, তাঁর সেবা হচ্ছিল। যার উপর ভার ছিল তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ভাত দিতে। তাই দুধ খাওয়ানো হলো। অতিথিটি একটি বিড়ালের বাচ্চা। এইটুকু তো, কিন্তু এরই ভিতর আত্মরক্ষা করতে শিখেছে। কি আশ্চর্য, কি করে এলো!

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — শুনলেন, ‘কথামৃতে’ ডাক্তার রুদ্রের কথা। ঠাকুর বলেছিলেন, যেন গরুর জিভ্ ধরে টানলে। ডাক্তার হয় তো মনে করলেন, ভাল করে বুঝে যাই। কিন্তু রোগীর যে এদিক দিয়ে হয়ে যাচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই। ডাক্তারগুলি, বিশেষ করে যারা ছুরি চালায়, তারা heartless (নির্দয়) হয়ে যায়। সর্বাধিকারীর দলের লোক — একটু কিছু হলো, অমনি বলে, এসো কেটে দিচ্ছি। আমাদের এক আত্মীয়ার উরুস্তম্ভ হয়েছিল বড় বড় সার্জেনরা বললে, amputation (দূষিত অংশ কেটে বর্জন) করতে হবে। মেয়ে বললে, কাজ নেই, আমি অমনি মরবো। শেষে কবিরাজ ধরিয়ে বেশ ভাল হয়ে গেল। বার্ড সাহেব লেকচার দিচ্ছিলেন, 'The operation was successful, unfortunately the patient succumbed' (সকলের উচ্চ হাস্য)। কাটা-ছেঁড়া ভাল হয়েছিল কিন্তু রোগী সইতে পারলো না, তাই মরে গেল। নন্দ হালদার বলেছিলেন এই কথা, কাটলে তো ভাই ভাল, কিন্তু ওদিকে যে রোগীর হয়ে গেল, তার কি করলে?

একজন ভক্ত স্ত্রীলোক আর একজন স্ত্রী-ভক্তকে লিখেছেন সান্ত্বনা দিয়ে, ‘মা, তুমি ভেবো না। ওরা ডাক্তার, ছুরি চালায়। ওদের হৃদয় নাই। ওদের দিকে চেয়ে থাকলে হবে না। ঈশ্বরকে ডাক। তিনি তার সুমতি দেবেন। তোমার দুঃখ দূর করবেন।’ এই স্ত্রী-ভক্তটির পতি ডাক্তার। পতি সাধুসঙ্গ করছেন, স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে।

এখন রাত্রি দশটা। ভক্তগণ বিদায় লইতেছেন। ডাক্তার কার্তিক বক্সী যেই নমস্কার করিলেন, শ্রীম কল্পিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন — ডাক্তারবাবু, আপনি এখানে ছিলেন! (শ্রীম ও সকলের গভীর হাস্য)।

২৪শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৬

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের পশ্চিমের ঘর। এখন রাত্রি পৌনে আটটা — ভাদ্র মাস। শ্রীম নিত্যকার ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। মুকুন্দ আসিয়াছেন। ইনি রামপুরহাটে রেক্টর। আর একটি নূতন যুবক ভক্ত আসিয়াছেন। ধ্যানান্তে যুবক শ্রীমকে একটু বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীম ও যুবক রাস্তার উপরের বারান্দার উত্তর প্রান্তে দাঁড়াইয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া কি পরামর্শ করিতেছেন। ভক্তগণ অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন — শ্রীম-র শরীর অসুস্থ, এতে অসুখ বাড়িয়া যাইবে ভাবিয়া। আরো কিছুকাল পরে উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম মেঝেতে বসিলে, যুবক পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় লইলেন। ক্ষণকাল পর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (জনৈক যুবকের প্রতি) — এই young man-এর (যুবকের) কি তেজ — খাপখোলা তলোয়ার! বিয়ে করেছে — ঘরে ষোল-সতের বছরের স্ত্রী। শ্বশুর আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায় — সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার। ভাইরা সব আলিপুরের উকীল, বাপ রিটায়ার্ড। মা দু'বছর মারা গেছেন। নিজে ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজে লেকচারার ছিল। পি.আর.এস.-এর জন্য ভবানীপুরের দিকে একটা বাগানে থেকে পড়াশোনা করতো। কিন্তু পড়া তেমন হতো না — খালি ঈশ্বরচিন্তা করতো। কাল ঝুলন পূর্ণিমা। এই শুভ দিনে সংসার ছেড়ে চলে যাবে। তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত। আমি suggestion (পরামর্শ) দিলুম, আরো দিনকতক অপেক্ষা করতে, এবং আরো কারো কারো সঙ্গে consult (পরামর্শ) করতে। বলে, না, কাল পূর্ণিমা — কালই যাব। কি রোখ্! কেউ কেউ আছে, সংসারে তাদের কোনও বন্ধন নাই, তবুও হচ্ছে না — চিঁড়ের ফলার! বিয়ে যারা করে নাই তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। বিয়ে না করলে world of difference (আকাশ-পাতাল তফাৎ)। A world of difficulties (দুঃখ-পূর্ণ সংসার) থেকে বেঁচে গেল। (শচীর প্রতি) কি বল শচীবাবু, পনের বৎসর পর হবে বিয়ে-টিয়ে। এখন ভাল না। এই যে যাচ্ছে ছেলেটি, কি রকম বৈরাগ্য! জিজ্ঞাসা করে জানলাম,

স্ত্রী অনুগত। বলছে, 'ভগবান তার সুমতি দেবেন। আমি আর কি করবো? খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না ওর।'

শ্রীম ভাবের সহিত গান গাহিতে লাগিলেন ঃ

গান। হরে মুরারে হরে মুরারে হরে মুরারে।
এই যৌবন প্রেম তরঙ্গ রুধিবে কে।
ভেঙ্গে বালির বাঁধ পুরাব মনের সাধ। ইত্যাদি।

এই যুবকটির এই অবস্থা — 'ভেঙ্গে বালির বাঁধ পুরাব মনের সাধ।'

২৫শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৭

সন্ধ্যা হয় হয়। এই ঘরে বসিয়া শ্রীম একটি আগমনী গান গাহিতেছেন। শরৎকাল পড়িয়াছে। তাই মা দুর্গার উদ্দীপন হইয়াছে।

গান। কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই,
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে
তুই নাকি মা তারি সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখিস্ ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে জামাই নাকি ভিক্ষা করে;
এবার নিতে এল পরে বলব উমা ঘরে নাই॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — স্বামীজী সবে শিখেছেন এই গানটি। ঠাকুর জানতে পেরে বলেছিলেন, 'তুই নাকি আগমনী শিখেছিস, গা না?' স্বামীজী গাইছেন, আর ঠাকুর পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। ডান হাতে নহ্‌বত, বাঁ দিকে গঙ্গা। মাকে বাৎসল্যভাবে দেখে এই সমাধি। দেবীপক্ষ —সন্ধ্যা হয় হয়।

ভক্ত ভূপতির ভাই (বিনীতভাবে যুক্তকরে) — আজ্ঞে, আমার স্ত্রী স্বপ্নে দীক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর মন্ত্র স্মরণ করতে পারেন নাই। এখন এর উদ্ধারের উপায় কি?

শ্রীম (গম্ভীরভাবে) — ভারি শক্ত কথা। মঠে যান না? মঠে

শিবানন্দ স্বামী আছেন, তাঁকে বলবেন। মঠে ক'বার গিয়েছিলেন?

ভক্ত — পাঁচ-ছ' বার।

শ্রীম — আর একদিন গিয়ে প্রণাম করে আসুন। তারপর গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। প্রথম দিন কাজ নাই।

ভক্ত — (সঙ্গীকে দেখাইয়া) একে একদিন পরমহংসদেব রাত্রে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু এর তেমন ভক্তি নাই ওঁর প্রতি।

শ্রীম — এ অতি গুহ্য কথা। কৃপা হয়েছে এঁর উপর। তিনি কৃপাময়। ডাকলে আসবেন, না ডাকলে নয় — তা নয়। তিনি আমাদের কথা বেশী ভাবেন, না আমরা ভাবছি তাঁর কথা বেশী? কৃপা করেছেন এঁকে।

ভক্ত — আজ্ঞে, স্বপ্নে যে দেব-দেবী দর্শন হয়, এ সব সত্য, না মিথ্যা?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, সবই সত্য — দেব-দেবীর স্বপ্ন। একটিও মিথ্যা নয়। একদিন একজন ভক্ত বলেছিলেন, স্বপ্নে অনেক দেব-দেবী দর্শন করেছি। ঠাকুর এই কথা শুনে কেঁদেছিলেন।

শ্রীম আহার করিতে উপরে গেলেন। ভক্তগণ ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন — শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। রাত্রি এখন পৌনে ন'টা। শ্রীম-র শরীর ইদানীং ভাল নয়। তাই ভক্তরা কিয়ৎকাল পর উপরে গেলেন বিদায় লইতে। তাঁহারা ভাবিলেন, অত রাত্রে নিচে আসিলে অসুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তিনি বিদায় দিলেন না। ভক্তদের সঙ্গে লইয়া দোতলায় আসিলেন। বলিলেন, 'রাত তেমন কিছু হয় নাই। একটু কথামৃত শুনুন সব।' এই বলিয়া কথামৃত পাঠ করিতে লাগিলেন।

শ্রীম পড়িতেছেন — সন্ধ্যা হইল, ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মা'র নাম করিতেছেন আর মা'র চিন্তা করিতেছেন। ঘরে মাস্টার — কিয়ৎক্ষণ ধ্যান-চিন্তার পর ঠাকুর আবার ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। ...শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তাঁর সন্ধ্যার কি দরকার? 'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।' ...সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয় — গায়ত্রী ওঁকারে

লয় হয়। একবার ওঁ বললে যখন সমাধি হয় তখন পাকা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই একটি scene (দৃশ্য)। আপনারা এটি চব্বিশ ঘন্টা চিন্তা করুন। এতে ধ্যান হয়ে যাবে — তাঁর উদ্দীপন হবে।

ভক্তগণ বিদায় লইতেছেন।

ভক্ত ভূপতি — গুরু মহারাজ চলে যাবার পর কত কথাই মনে উঠছে।

শ্রীম — সব মীমাংসা হয়ে যাবে সাধুসঙ্গ করলে। মঠে যাবেন। ঠাকুর তো মঠ এই জন্যই করে দিয়েছেন। রোগ সারাতে যেমন হাসপাতালে যায়, তেমনি 'অজ্ঞান'-রোগ সারাতে হলে মঠে যেতে হয়। মনের রোগ সারাবার এমন উত্তম হাসপাতাল আর কোথাও পাবেন না এই যুগে।

কলিকাতা, ২৭শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

১০ই ভাদ্র ১৩৩০ সাল। সোমবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

একবিংশ অধ্যায়

ভারত উঠলে জগৎ উঠবে

১

শ্রীম দোতলার পশ্চিমের ঘরে উপবিষ্ট। এখন রাত্রি আটটা। শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, অমৃত, ছোট নলিনী, যোগেন, মনোরঞ্জন, ছোট জিতেন প্রভৃতি রহিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দজী ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় সেন্ট্রাল এভিনিউতে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীম-র ইচ্ছায় মোহন ঐ সভার একজন মেম্বর হইয়াছেন। মোহন ঐ সমিতি হইতে ফিরিয়াছেন — সঙ্গে মণি ও রমণী। শ্রীম বলেন, উনি পঁচিশ বছর আমেরিকায় ছিলেন। ঠাকুরকে এক বৎসর প্রায় সেবা করেছেন সব ছেড়ে। আবার অদ্বিতীয় পণ্ডিত। খুব তপস্যা করতেন, তাই সকলে বলতো 'কালীতপস্বী'! এমন সুযোগ কোথায় পাবে! সকলের যাওয়া উচিত। (মোহনের প্রতি) পরে শুনবো বেদান্ত সোসাইটির কথা। এখন কথামৃতের scene (দৃশ্য) পড়া হচ্ছে শুনুন।

শ্রীম 'কথামৃত' পড়িতেছেন — ঠাকুর বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। আনন্দময় মূর্তি। ..... আজ পুনর্যাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের পিতা প্রভৃতিকে বলিতেছেন — বৈষ্ণবদের একটি বই 'ভক্তমাল'। বেশ বই, কিন্তু একঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে।...শ্রীমদ্ভাগবত, তা'তেও নাকি ঐ রকম আছে। কেশব-মন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা। সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে। শাক্তরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী — পার করছেন। শাক্তরা বলে, তাতো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী। তিনি

কি আপনি এসে পার করবেন? ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য (সকলের উচ্চ হাস্য)। নিজের নিজের মত নিয়ে আবার অহংকার কত! যে সমন্বয় করেছে সে-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে, আমি কিন্তু দেখি সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত এককে নিয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।... বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা; পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমরা মনে করেছি, রোজ একটি দু'টি scene (দৃশ্য) পড়বো। তা হলেই তাঁর চিন্তা হবে। তাঁর ধ্যান হয়ে যাবে। পূর্বে দু'দিন হয়ে গেছে, আজ তৃতীয় দিন।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — কি কি হয়েছে ঐ দু'দিনে, এঁদের শুনিয়ে দিন।

মোহন — একটি — ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজ-ঘরে বসেছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভক্তদের বলছেন, 'যে নিশিদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তা'র সন্ধ্যার দরকার নাই। হৃষীকেশে একটি সাধু ভোরবেলায় বের হয়ে একটা ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, আর বলে, 'বেশ করেছো, বেশ করেছো'। তাঁর অন্য কথা নাই — অন্য জপতপ নাই। তাই তিনি নিরাকার কি সাকার, সে সব কথা ভাববারই বা কি দরকার! নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বললে হয় — 'হে ঈশ্বর, তুমি আমায় দেখা দাও, তুমি যেমনই হও।'

দ্বিতীয়টি — ঠাকুর ঝাউতলা থেকে আসছেন। মাস্টার ও লাটু পঞ্চবটীতে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুরের পশ্চিমে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করে জাহ্নবীজলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তা'তে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাচ্ছে। সাক্ষাৎ ভগবান দেহধারণ করে জাহ্নবীতীরে বিচরণ করছেন — জগতের কল্যাণের জন্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বই বেশী পড়লে মনে থাকে না। এই রকম দৃশ্য মনে রাখা সহজ। এগুলি ভাবলেই তাঁকে ভাবা হয়।

অমৃত — তা হলে বই পড়া উচিত নয়?

শ্রীম — হাঁ। তবে যারা পড়তে চায় পড়ুক। কিন্তু ঠাকুরের কষ্টিপাথরের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া উচিত। শাস্ত্রে অনেক অসার অংশ আছে, তা ধরতে না পারলে বিপদে পড়তে হয়। চিনি বালিতে মিশান আছে। বালি ফেলে চিনি নেওয়া ভাল। শ্রীকৃষ্ণ গীতা করে দিয়েছেন — ইহা বেদের সার — বেদের ঠিক ঠিক interpretation (ভাষ্য)। (ভক্তদের প্রতি) — তিন steps (ধাপ)। প্রথম — শাস্ত্র, দ্বিতীয় — গুরুবাক্য, আর তৃতীয় — প্রত্যক্ষ অর্থাৎ নিজের অনুভব। গুরুবাক্যে বিশ্বাস হলে অনেক এগিয়ে গেল। গুরু অসার ছেড়ে বালি ঝেড়ে চিনিটুকু কেবল দেন। একজন ভক্তকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'আজকাল অমুক খুব এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয়েছে।' আর তৃতীয় — প্রত্যক্ষ, মানে তাঁকে দর্শন করা। শাস্ত্র, গুরুবাক্য, প্রত্যক্ষ — পর পর ভাল।

২

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — হাঁ, এবার বেদান্ত সোসাইটির লেকচার-নোট পড়ুন।

মোহন — আজ রাজযোগ ছিল — 'আত্মসংযম'। ছাত্র প্রায় একশ'। অভেদানন্দ মহারাজ বলেন — 'আত্মসংযম, মানে মনসংযম — মনকে বশীভূত করা। ধর্মজীবনের এটা corner stone (ভিত্তি)। সারা জগৎ জয় কর কিন্তু মন জয় করতে না পারলে কিছুই হলো না। সুখ-দুঃখ মনের সৃষ্টি। আবার কামক্রোধাদি মহারিপু — এও মনকে অবলম্বন করে ওঠে। আর মানুষকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে। গীতায় ভগবান বলেছেন,

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।' (২:৬২)

যে যা চিন্তা করবে তাতে ক্রমশঃ একটা টান, আকর্ষণ আসে। তারপর সেই জিনিসটা পেতে ইচ্ছা হয়। বাধা পড়লেই ক্রোধ হয়, আর ক্রোধে নাশ হয়। এইজন্য মনসংযম প্রথম দরকার।

এখন, কি করে হয় এই মনসংযম? যাদের মনসংযম হয়েছে

আংশিক কি সম্পূর্ণ — তাঁদের সঙ্গ, তাঁদের সেবা করতে হয়। একজন যদি তাস খেলোয়াড় কোনও ব্যক্তির সঙ্গ করে তবে সে তাস খেলতে চাইবে। তেমনি মাতাল-গুলিখোরের সঙ্গ করলে তাদের মত হতে হবে। আবার সাধু-মহাপুরুষ — এঁদের সঙ্গ কর, তুমিও সাধু হবে। A man is known by the company he keeps (সঙ্গ থেকে লোক চেনা যায়)। অতএব কেমন সঙ্গ করবে তা প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে। তুমি যদি ঈশ্বরকে চাও, তবে যাঁরা তাঁকে পেয়েছেন, কিংবা পাবার জন্য ব্যাকুল, তাঁদের সঙ্গ কর। পরমহংসদেব বলতেন, আগুনের কাছে ভিজা কাঠ থাকলে জল ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়, শেষে তাতেও আগুন লাগে। সেইজন্য ভক্তদের সাধুসঙ্গ করা দরকার। এতে মনের খারাপ ভাব দূর হয়ে যায়। Self control is attained when mastery over desire, anger, greed and past deeds is attained (কাম, ক্রোধ, লোভ ও পূর্বসংস্কার বশীভূত করতে পারলেই মনসংযম হয়)।

বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকালের ছেলেদের কোনও আদর্শ নাই। সেইজন্য চরিত্রও গঠিত হয় না। সত্য কথা জানে না, moralityর (নৈতিক জ্ঞানের) ধার ধারে না। এ অবস্থাটি অত্যন্ত হীন। তোমরা ভাল হতে চেষ্টা কর। বর্তমান শিক্ষায় নৈতিক জ্ঞান প্রবল হতে পারে না। আদর্শহীন শিক্ষা। ভগবানলাভ মনুষ্যজীবনের আদর্শ — সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, এইটি সম্মুখে ধরে অগ্রসর হও। তবে চরিত্র গঠিত হবে, মনে জোর আসবে। আমেরিকায় দেখেছি, কিসে ছেলেরা ভাল হয়, ভবিষ্যৎ সুখকর হয় তার চেষ্টা করছে। চার-পাঁচ বছরের মেয়েরা dance (নৃত্য) করে, acting (অভিনয়) করে। এই বয়স থেকে আরম্ভ করলে তবে পাকা হবে। যা কিছু শিক্ষা দিতে হবে — পাঁচ থেকে বার বছরের মধ্যে। এরপর শিক্ষা ভাল হয় না। আদর্শ ঠিক করে, জীবিকার জন্য একটাতে লেগে যাও। কাজ করতে থাক, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজন কর। অল্প বয়স থেকে ছেলেদের বেদ পড়াতে আরম্ভ করাও, দেখবে এরা সব মহাপণ্ডিত হয়ে উঠবে।

ছোটলোক কেউ নাই। তোমরা যাদের ছোট বল এরা কেউ

ছোট নয়। হাড়ী, ডোম — এরা সব ভাল জাত ছিল বৌদ্ধ ধর্মে। বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ — এই সঙ্ঘের অপলাপ 'ডোম'। বল্লালসেনের সময় এ সব অত্যাচার হয়েছে। একঘরে করে রেখেছে, ছোট বানিয়েছে। কি আর করে বেচারা — বেত, বাঁশ এ সবের কাজ করে জীবিকা অর্জন করছে। কনখলে দেখেছি, কূয়া থেকে চামারদের জল তুলতে দেয় না — মুসলমান তুলতে পারে। শাস্ত্র বলছেন, জল নারায়ণ, মানুষ নারায়ণ — কিন্তু, এদের পশুরও অধম করে রেখেছ তোমরা। মাদ্রাজের পেরিয়া আর বাংলার নমঃশূদ্র, এ সব তোমাদের সৃষ্টি। ভগবানের ইচ্ছায় সেই জন্য হাজার বছর ম্লেচ্ছের জুতা খাচ্ছ। এই ব্যবস্থা তাঁরই। পরমহংসদেব এই যুগে শিখিয়ে গেছেন, 'মা, আমি হাড়ীর চেয়েও অধম।' তাই হাড়ীর দোরে গিয়ে চুল দিয়ে নর্দমা সাফ করেছেন। বলেছিলেন — 'মা, আমি ব্রাহ্মণ, এ অভিমান নাও, এ থাকলে তোমায় পাব না।'

দেশের লোকের এই হীন মনোভাবের জন্য কিছু হচ্ছে না — কংগ্রেসও কিছু করে উঠতে পারছে না। তোমরা উপর থেকে করতে চাও, তা করতে গিয়ে — নিচের গলদ সব রয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় হবে না। নিজের ভিতরে দৃষ্টি কর — নিজের মন উঁচু কর, দেখবে উঁচুতে উঠে যাবে। অপরকে হীন মনে করলে নিজেই হীন হয়ে যায়। এদের মুক্ত কর আর নিজেরাও মুক্ত হতে চেষ্টা কর। ফাঁকি দিয়ে করতে গেলে কিছুই হবে না। ঈশ্বরলাভও হবে না। এ অতি দূর। নিজের অন্যায়ের সময় ঈশ্বরের উপর ভার দিলে কিছু হবে না। কপটতা ছাড় — মন-মুখ এক কর। সকলকে মানুষ বলে আলিঙ্গন কর। সকলেই তাঁর সন্তান। দেখ না, আত্মকলহে দেশ কোথায় নেমেছে। হাজার হাজার লোক উকীল হচ্ছে। এদের উচিত ঝগড়া কমানো। তা না করে আরো বাধাচ্ছে। আত্ম-সম্মান বিহীন জাতির এই অবস্থা হয়। এখন দেশে character (চরিত্র) নাই। এ তৈরী কর, দেখবে নিমেষে সব হয়ে যাবে।

ভগবানে বিশ্বাস রাখ। তবেই আত্মসংযম হবে। তবেই যাতে হাত দেবে তা করতে পারবে। নিজের স্বার্থ-বুদ্ধি কম হওয়া চাই।

দশের কিসে ভাল হয় সেই চিন্তা করবে। মানুষের ওপর তোমরা যেমন পশুবৎ ব্যবহার করছো, তেমনি পশুবৎ ব্যবহার পাচ্ছ বিদেশের নিকট। Retribution of Nature-এর (প্রকৃতির প্রতিশোধের) হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। আত্মসংযম যার হয়েছে সে-ই যোগী। সংসারেই থাক আর সন্ন্যাসীই হও, সাদা কাপড় পর কি গেরুয়া পর, test হলো ঐ — মনকে বশীভূত করেছো কি না। মন জয় হলেই ঈশ্বরলাভ হয়। আবার ঈশ্বরলাভ হলেই ঠিক ঠিক মন জয় হয়। সাধকের অবস্থায় প্রার্থনা করলে তিনি সহায় হন। মন জয় হলে, চরিত্র গঠিত হলে, নিজের স্বাধীনতা লাভ হয়। তখন দেশের স্বাধীনতাও লাভ হয়।

শ্রীম — বেশ কথা। সার কথা ঐ — ঈশ্বরদর্শন মনুষ্যজীবনের আদর্শ। এটি নিশ্চয় করে যা ইচ্ছা কর। তখন বেচালে পা পড়ার সম্ভাবনা কম। সকলে যদি এ করে, তবে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে নিমেষে। আর ঠাকুরকে ধরা। ইনি এ যুগের আদর্শ। ভারতকে উঠাতে এসেছেন। ভারত উঠলে জগৎ উঠবে। ভারতের উত্থান অবশ্যম্ভাবী।

৩

এবার শ্রীম স্বামী অভেদানন্দজীর ‘বেদান্ত সোসাইটি’র প্রশ্নোত্তর শুনিতেছেন।

প্রশ্ন — conscious state (চেতন অবস্থা) কিরূপ?

স্বামী অভেদানন্দ — Concsious state and sub-concsious state are like the top of the wave and the below of the water (তরঙ্গের ন্যায় মনের উপরিভাগ জাগ্রত অবস্থা, নিম্নভাগ অল্প চেতন অবস্থা)।

প্রশ্ন — বাসনার কারণ কি?

উত্তর — যোগীরা বলেন, সংস্কার — অতীত কর্মের ছাপ। বাহ্য বিষয়ের ছাপ বীজরূপে মনে গ্রথিত থাকে। তুমি আম খেলে, খেতে ভাল এই idea (অভিজ্ঞতা) মনে ছাপ লেগে গেল। এইরূপে মন্দের।

পূর্ব ভোগের remnant (লেশ) হলো সংস্কার। তোমাদের জীবন পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারে চালিত হচ্ছে। তোমাদের জীবন-স্রোত অবিশ্রান্ত চলছে। Individuality জীবভাব। এ তো একটি wave (তরঙ্গ)। এই স্রোতের গতি অনন্ত সমুদ্রে গিয়ে মিশবে। মন খারাপ হলো, আর অমনি suicide (আত্মহত্যা) করলে। মনে করছো সব শেষ হয়ে গেল। তা নয়। অবশ্য এ অধ্যায় এখানে শেষ হলো। কিন্তু পরজন্ম — ওখান থেকে আবার আরম্ভ হবে। বরং ভাল করতে পারতে পরজন্ম — বেঁচে থেকে বীরের মত দুঃখ গ্রহণ করলে। সকলকেই একদিন ঈশ্বরলাভ করতে হবে। জেনে-শুনে কাজ করলে আঁধারে ঢিল মারা হয় না — আমরা জেনে-শুনে করছি সব কাজ। মনে যত সংস্কার উঠবে অমনি দমন করতে চেষ্টা করবে। মনকে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। ওটা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের (Naigra Falls) মত উপরে স্থির, ভিতরে ভীষণ চঞ্চল, অতি প্রবল! দেশজয়ীকে লোক বীর বলে। কিন্তু প্রকৃত বীর মনোজয়ী — বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ — এঁরা সব। নেপোলিয়ান আর আলেকজাণ্ডার — এরা slaves to ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষার দাস)। মন জয় করে সংসারে থাকলে দোষ নাই। জুতা পরে চললে পায়ে কাঁটা বেঁধে না।

প্রশ্ন — সংস্কার কি করে এড়ান যায়?

উত্তর — তা হয় না। তবে সাধুসঙ্গ, সৎবিচার, এ সব করলে সহজ হয়। রোজ ঈশ্বরের চিন্তা করবে বসে — জপধ্যান করবে। জপধ্যান মানে repetition of the same idea (নিরবচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ)। তোমাদের বর্তমান অবস্থা একটা habit-এ (অভ্যাসে) পরিণত হয়ে পড়েছে। এটাকে দমন করতে হলে আর একটা counter habit (বিপরীত অভ্যাস) সৃষ্টি করতে হবে। জপধ্যানে এটি তৈরি হয়। জপধ্যান মানে, মন স্থির করবার চেষ্টা। গীতায় একেই অভ্যাসযোগ বলেছেন। আর প্রার্থনা করতে হয় ঈশ্বরের কাছে।

প্রশ্ন — সংস্কারের যদি অত প্রবল ভাব হয়, তবে ‘অদৃষ্ট’ ‘পুরুষকার’ এ সবের স্থান কোথায়?

উত্তর — অদৃষ্ট মানে unknown cause (অজ্ঞাত কারণ)।

এটাকেই কর্মফল বলেন জ্ঞানীরা। অজ্ঞানীরা বলে অদৃষ্ট। ভক্তরা বলেন ঈশ্বরেচ্ছা। একই কথা। পুরুষকারের স্থান আছে। তোমার free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা) আছে, অবশ্য limited (সীমাবদ্ধ)। এ দিয়ে তুমি সংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে দিতে পার। অসুর ও দেবতা দুই-ই আছে তোমার ভিতর। দেবতাকে জাগ্রত কর, অসুর আপনি নাশ হয়ে যাবে। দেবতার অনন্ত শক্তি, কিন্তু সব potential (সুপ্ত)। জাগ্রত কর সেই শক্তি।

রোজ সকালে বা রাত্রে স্থির হয়ে বসবে। তখন মনকে study (পরীক্ষা) করবে। সমস্ত দিনে আজ আমি কি কি কাজ করলুম — ক'বার রেগেছি, ক'বার ইন্দ্রিয়ের দাস হয়েছি — এ সব analysis (মনের বিশ্লেষণ) করবে। কু-অভ্যাস থাকলে দমন কর। নিজে না পারলে তাঁর নিকট প্রার্থনা কর শক্তির জন্য। বল — 'হে প্রভো, আমি তোমার সন্তান, আমায় শক্তি দাও। যাতে আমি কুপথে, কু-অভ্যাসে রত না থাকি।' তিনি নিশ্চয় শক্তি দেবেন। Self-confidence (আত্মবিশ্বাস আর সাহস) নিয়ে নিজের মনকে study (বিশ্লেষণ) কর, আর concentrate (একাগ্র) কর ঈশ্বরে। ডায়েরী রাখ। এইরূপে চেষ্টা কর, তিন মাস পরে দেখবে কত বদলিয়েছ। নিজেকে এত দুর্বল ভাববে কেন? অনন্ত শক্তি রয়েছে তোমার ভিতরে। আমাদেরও তোমাদের মত হতো — নিরাশ ভাব আসতো। তখন যদি সাহস না করতাম, আত্মবিশ্বাস না থাকতো — গুরুবাক্যে বিশ্বাস না করতাম, তা হলে আর এ হতো? দেখ, এর বলে দুনিয়া জয় করে এয়েছি। মরণ-ভয় নাই। Courage (সাহস) চাই। ভয় পেও না। সংসারীরা সংসারে থেকে কর। মনকে গেরুয়া পরাও। বাইরে খালি গেরুয়া পরলে কি হবে? fire of wisdom (জ্ঞানাগ্নি) — এ দিয়ে 'নিজ'কে ঢেকে রাখ। আমরা সংসারী, আমাদের হবে না, আমরা পারবো না — এ ভয় পেও না। 'আমার আমার' করে গোলমাল করছ। মাগ-ছেলে, টাকা-পয়সা সঙ্গে করে এনেছিলে কি? যেমনটি এয়েছো তেমনি যাও। কোটিপতি — সেও একটি ছুঁচও নিতে পারবে না। Character (চরিত্র) সঙ্গে যাবে। এটি ভাল হলে দুনিয়া তোমার পায়েতে — এই জন্মেই দেবতা হয়ে গেলে।

প্রশ্ন — মন স্থির করলে ঈশ্বরদর্শন হবে?

উত্তর — কেন হবে না। অনেক process (প্রক্রিয়া) আছে। তুমি আরম্ভ কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি — তা হলে হয় না। এরপর অন্য উপদেশ দেওয়া যাবে। সবের পক্ষে এক মত খাটে না, চেষ্টা কর।

প্রশ্ন — Temptation (লোভ) আমি জয় করতে পারছি কই? আমরা যখন তাঁর প্রিয় সন্তান, তিনি কেন করে দেন না?

উত্তর — হাঁ, তুমি আন্তরিক এ কথা বললে তিনি নিশ্চয় করে দেবেন। আমি রিপুর সঙ্গে পেরে উঠছি না — হে ভগবান, তুমি আমার সহায় হও — এই প্রার্থনা কর। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না বাবা! ঠাকুর বলতেন, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যথা ইচ্ছা তথা যাও।' অদ্বৈত জ্ঞান নিয়ে সংসার কর। আমি ঈশ্বরের — এই জ্ঞান থাকলেই হয়ে গেল, একেই বলা হচ্ছে 'অদ্বৈত জ্ঞান'। ঠাকুর নূতন বেদান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। শঙ্কর বারশ' বছর পূর্বে সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শিক্ষিত সাধু ছাড়া তা প্রায় কেউই পড়তে পারতো না। আমাদের নূতন বেদান্তের ব্যাখ্যা সকলে পড়তে পারছে। বিদেশীরাও পড়ছে। ঠাকুর বাংলায় বলেছিলেন। বিদেশে আমরা ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করেছি। সাদা কথায়, সহজ ভাষায় আমরা প্রচার করছি। এইভাবে পরমহংসদেব আমাদের শিখিয়েছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য! এতে অত শাস্ত্র পড়তে হয় না। তোমার নিজের ভিতর শাস্ত্র। এই আসলটি ঠিক হলে — ভিতর থেকে সব উপদেশ আসবে। মন বলবে, কি করতে হবে, কি ছাড়তে হবে। এটিই করতে বলছি — নিজের ভিতরের শাস্ত্র উদ্ধার কর। 'আমি তাঁর' এ বিশ্বাস কতক দৃঢ় হলেই ঐ শাস্ত্র দেখতে পাবে — বুঝতে পারবে। বাইরের সহায়ের দরকার হবে না তখন।

শুধু মুখে শাস্ত্রের দোহাই দিও না। পাঁচ হাজার বছর আগে ঋষিরা এই বলেছেন, বিবেকানন্দ স্বামী এই বলেছেন — এসব দোহাই দিও না শুধু। তুমি কি বলছো, এটা স্থির কর আগে। আমেরিকায় দোহাই দিলে ওরা বলে — 'old thing, throw it away' (পুরানো জিনিস, ছুঁড়ে ফেলে দাও)। তোমরা খালি দোহাই

দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছ। ঋষিদের কথা মুখে এনো না, তাঁদের মত ব্যবহার না করতে পারলে। শুধু মুখে বলছো — আমরা ঋষির বংশধর। শুধু-কথায় চিঁড়া ভিজবে না। গুণ ও কর্মেতে দেখাতে হবে আমরা ঋষির বংশধর। ও দেশের বড় বড় ডক্টররা জোড়হাত করে থাকে আমাদের কাছে — ভারতের সংস্কৃতির কাছে। পার্লামেণ্টের বহু সভ্যগণ, 'লর্ডস্' 'নাইটস্' আমাদের ছাত্র ছিলেন। ওঁরা গুণগ্রাহী। গুণ দেখলে মাথা নোয়ায় সকলে, শুধু কথায় রাজী নয়। ঋষি হও — জগৎ পায়ে পড়বে।

রোখ চাই — মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। চাই আত্মবিশ্বাস, সাহস আর ভগবানে বিশ্বাস। কেবলমাত্র ভাড়া রেখে স্বামীজী (বিবেকানন্দ) ভারতে চলে এলেন। ঐ দিয়ে ইংলণ্ড থেকে নিউইয়র্ক গেলুম। ওখানে মাত্র তিন জন বন্ধু ছিলেন স্বামীজীর — Vedantists (বৈদান্তিক)। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে, সাহস করে কাজ আরম্ভ করা গেল। খাওয়া-পরা সব আসতে লাগলো। প্রথম সাত মাসে নব্বুইটা লেকচার দি। 'বাসকেট কালেকসানে' খরচ চলতো। ওরা ভারি কৃতজ্ঞ। ছেলে বয়সে সাধু হয়ে হেঁটে কাশী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, হিমালয়ে যাই। বিশ্বাস ছিল — পূর্ব থেকেই আমার খাওয়া-পরার জোগাড় হয়ে রয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনও বিষয়ে আটকায় নি। তিনি সব দেখছেন। তাঁর উপর বিশ্বাস ক'রে কাজে লেগে যাও। গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

শ্রীম — চমৎকার সব কথা। পুরুষকার ও ঈশ্বরে নির্ভরতা দুই-ই চাই। অভ্যাস আর বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মানে, ঈশ্বরে অনুরাগ। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে চরিত্র গঠিত হয় না। আর ঐ বেশ বলেছেন, কাজে লেগে যাও। বসে বসে বিচার করলে হয় না। লেগে যেতে হয়। পুরুষকার চাই, তবে কৃপা আসবে। বর্তমান সময়ে ঠাকুরের কথা শুনে যারা কাজ করবে, তারাই সুফল পাবে। তিনি বলেছিলেন, কেঁদে কেঁদে তাঁকে প্রার্থনা কর, 'প্রভো, সুমতি দাও।' সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা আর চেষ্টা, এই চাই।

কলিকাতা, ২৯শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ, ১২ই ভাদ্র, ১৩৩০। বুধবার, কৃষ্ণা চতুর্থী।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নিজ দেহ, পরিবার, সমাজ — তিনেতে ঈশ্বরদৃষ্টি চাই

১

মর্টনের দ্বিতলের বসিবার ঘর। নিত্যকার ভক্ত ছাড়াও অনেকে আসিয়াছেন। রমণী গান করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করিতেছেন। এখন সন্ধ্যা সাতটা।

গান। তুমি অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।
প্রভু, বিনে অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞযাগ,
তোমারে কি যায় জানা।

শ্রীম উপর হইতে এই সময় আসিয়া বসিলেন। গান শেষ হইলে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর ভক্তগণের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, মাকে দর্শন হয়। আবার কথা কওয়া যায় তাঁর সঙ্গে, যেমন তুমি আমি কইছি। যেমন কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, আর কেউ খেয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া — এ যেন দুধ খাওয়া। সেই মা-ই ঠাকুর হয়ে এসেছেন। তিনি নিজে বলেছেন। তাঁকে কি সকলে চিনতে পারতো? যারা চিনতে পারতো তারা একেবারে পরব্রহ্ম বলে স্তব করতো — যেমন গিরিশবাবু। এই জন্য তপস্যা করতে বলতেন। তপস্যা করলে কিছু বোঝা যায়। যাদের পূর্বজন্মের তপস্যা ছিল তারা ফস্ করে চিনতে পারতো। তপস্যা মানে ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা! নিজের স্বরূপলাভের চেষ্টা। নিজের বাড়ি, নিজের ঘরে যাওয়ার চেষ্টা। এই চেষ্টা যারা পূর্ব থেকে করে এসেছে তারাই শীঘ্র বিশ্বাস করে, চিনে ফেলে। খানিকটা সংশয় থাকে, তবুও তাদের মনে তিনি নিজে সেই সংশয় দূর করে দেন। তিনি বলেছিলেন তাদের কাছে, 'আমি সেই

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্যমনের অতীত।’ কেন বললেন, না তিনি জানেন এঁরা কথা নেবেন। এঁরা জহুরী — বললে বুঝতে পারবে। পূর্বের চেষ্টা ছিল। তাই একটু ইঙ্গিত করতেই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল। কিন্তু যাদের সবে আরম্ভ, ভোগ শেষ হয়নি, তারা নিতে পারে না। বহু জন্ম বিষয়ভোগ ক’রে তবে যদি তাঁকে লাভের ইচ্ছা হয়। তাই বলতেন, হাবাতেগুলো ধরতে পারে না। বলতেন, মলয়ের হাওয়ায় সব চন্দন হয়, কিন্তু বাঁশ বাঁশই থাকে।

যীশুর সময় মেরী নামে একটি ভক্ত স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি খালি যীশুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। তিনি তাঁকে ঈশ্বর বলে চিনেছিলেন। তাই অন্য দিকে মন নাই। প্রেমিক ভক্ত। চৈতন্যদেবের সময় এরূপ ভক্ত ছিল। ঠাকুরের সময়ও এরূপ ভক্ত ছিল। তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। অন্য দিকে মন নাই। তাই ঠাকুর বললেন, ‘সবটা মন যদি কুড়িয়ে আমার দিকে এলো তবে তার বাকী রইলো কি?’ সকলের এই বিশ্বাস হয় না। তাই তাদের জন্য অন্য উপায় নিতেন। একদিন ঘরে গান হয়েছে। অনেক লোক আছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘মা এসেছেন, মা এসেছেন। এসো গো মা, বসো।’ সত্যি যেন কেউ এসেছে, এই ভাব — এইরূপে আদর আপ্যায়ন করলেন। আর একদিন খুব গান হয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের লোক রয়েছেন। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন, ‘মা এসেছেন, মা এসেছেন,’ বলে। বিশ্বাস হয় না লোকের, তাই আবার বললেন, ‘মাই্রি বলছি, মা এসেছেন।’ বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, ‘না, তোর কথায় বিশ্বাস হলো না। মা বলেছেন — তা (মিথ্যা) কেমন করে হয়, সব মিলে যাচ্ছে যে!’ উনি প্রথম প্রথম বলতেন কি না, ঠাকুরের ঈশ্বরীয় দর্শন, hallucination (মনের ভ্রম)। তাই মাকে জিজ্ঞেস করলেন একদিন। মা তখন বললেন, ‘তা কেমন করে হয় বাবা, সব মিলে যাচ্ছে যে।’ অর্থাৎ মা ঠাকুরের মুখ দিয়ে যা বলতেন দর্শন দিয়ে, সব কথা মিলে যেতো। যেমন বলেছিলেন মা দর্শন দিয়ে — ‘অমুক অমুক আসবে।’ ঠিক এলো! তারপরই বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, ‘বেদে

যাঁকে পরব্রহ্ম বলে আমি তাঁকেই মা বলি।'

শ্রীম (নবাগত খুলনার ভক্তের প্রতি) — সাধনের দরকার। কাজকর্মের ভিতরে থেকে মন স্থির হয় না। সেই জন্য মাঝে মাঝে নির্জনে চলে যেতে হয়। গীতায় তাই নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন। ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম করতে হলে মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়। নয় তো মনের উপর মরচে পড়ে যায়। মরচে জানেন? — জংকার, ময়লা, আসক্তি। মনে হচ্ছে, নিষ্কাম করছি, কিন্তু ভিতরে হয়তো সূক্ষ্ম লোকমান্যের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাই নির্জনে গেলে ধরা পড়ে। গৃহে যারা আছে তাদের তো অবশ্য দরকার। সাধুদেরও দরকার। এই জন্য মাঝে মাঝে নির্জনবাসের উপর এত জোর দিতেন ঠাকুর। জানেন তো তাঁর ব্যবস্থা কি? — নিত্য সৎসঙ্গ, ব্যাকুল প্রার্থনা, আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস। ভক্তদের এ করা দরকার। তবে ধাত ঠিক থাকে। নয়তো self-delusion (আত্মপ্রবঞ্চনা) এসে পড়ে। মনে হয়, আমার সব হয়ে গেছে। জনক রাজার মত সংসার করছি। এই বলিয়া শ্রীম মগ্ন হইয়া গাহিতে লাগিলেন। গান —

ডুব ডুব ডুব রূপ সায়রে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥
খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে, চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ, ৩য় খন্ড ৭ম পরিচ্ছেদ)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ব্রাহ্ম ভক্তরা গেলে এ গানটি শুনাতেন। মানে, কিছু সাধন-ভজন করতে বলতেন। শুধু লেকচারে কিছু হয় না। নির্জনে গিয়ে দিন কতক সাধন করলে আস্বাদ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে গেলে সে ভাবটি দৃঢ় হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, দু'দিনের — এ বোধ পাকা হয়। তখন লেকচার বন্ধ হয়ে যায় — কাজ হয় ঠিক ঠিক। (বড় জিতেনের প্রতি) একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে একটা বাড়িতে রয়েছেন। সর্বদা

ঈশ্বরের ভাবে তন্ময়। আমি যেতেই খুব আহ্লাদ প্রকাশ করলেন। আর বললেন, 'গান না, তাঁর সেই গানটি।' আমরা গেয়ে শুনালাম। এঁরা গেলে ঠাকুর গাইতেন কিনা এই গানটি — যাতে কিছুদিন তপস্যা করে। সেই জন্য এইটি অত প্রিয়। তিনি সব ত্যাগ ক'রে এখন তাঁর নাম করছেন। এত দিনে বুঝতে পারছেন, ঠাকুর কি উদ্দেশ্যে এইটি গেয়ে শুনাতেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — রূপ সনাতনের কি তীব্র বৈরাগ্য! মন্ত্রী ছিলেন বাংলার নবাবের। অনেক দিন ধরে মহাপ্রভুর সঙ্গে লেখালেখি করছেন চিঠিপত্র। শেষে লিখলেন, 'প্রভু, আর পারছি না ঘরে থাকতে।' মহাপ্রভু উত্তরে লিখলেন, একটি শ্লোকে — 'নষ্টা স্ত্রী যেমন গৃহকর্মে রত থাকে, কিন্তু মন পড়ে থাকে উপপতির উপর, কেউ জানতে পারে না — সেইরূপ সংসার কর।' কিন্তু বেশী দিন পারলেন না। ছেড়ে চলে এলেন। অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি পরিবারের provision (ব্যবস্থা) করে এলেন। কাশীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা। মহাপ্রভু দেখে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন। সনাতন পিছিয়ে যাচ্ছেন। বললেন, 'না প্রভু, আমায় ছোঁবেন না। আমি কীট, অপবিত্র।' সব ছেড়ে এসেও এ কথা বললেন! তীব্র বৈরাগ্য কিনা। মহাপ্রভু এঁদের বৃন্দাবনে গিয়ে থাকতে বললেন। তাঁ'তে ঠিক ভালবাসা এলে আর কিছু ভাল লাগে না।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — আমরা এখন থেকে মনে করেছি, রোজ তাঁর একটি scene (দৃশ্য) ধ্যান করবো। তিনটি হয়ে গেছে। প্রথমটি — দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যার সময় ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট। ধ্যানান্তে ভক্তদের বললেন, 'যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করে তার সন্ধ্যার দরকার হয় না।' হৃষীকেশে একটি সাধু সারা দিন একটি ঝরণার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো আর বলতো, 'বা, বেশ করেছো — বা, বেশ করেছো — কি আশ্চর্য!' (একটি ভক্তের প্রতি) আর দু'টি কি?

ভক্ত — আকাশে নবীন মেঘ উঠেছে। তার প্রতিবিম্ব গঙ্গার জলে পড়েছে। ঠাকুরের পিছনে এই কাল চালচিত্রি। তিনি পঞ্চবটী থেকে ঘরে আসছেন। তৃতীয়টি, বলরাম-মন্দিরে। বলরামের বাপকে

বলছেন, অনেকেই একঘেয়ে, কিন্তু আমি দেখি সব এক। ... যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার।

শ্রীম — আর একটি scene (দৃশ্য), ঐ দিনে অনেক গান গাইলেন ঠাকুর। প্রথম গৌরলীলার গান, পরে মায়ের নাম। শিবপুরের ভক্তরা সব এয়েছেন। গান গাইছেন আর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ। বেলা তিনটা।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের এইটি একটি favourite (প্রিয়) গান।

গান। সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘু রাই।
ভজ লে অযোধ্যানাথ দুসরা ন কোই॥ ইত্যাদি

আর এইটিতে খুব ভাব হতো ঃ—

গান। আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি॥
আমি মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হয়ে॥

শ্রীম — শ্রীকৃষ্ণের জন্য এত ভালবাসা। স্ত্রীলোক সব। কুলমানের হিসাব নাই। ঘৃণা, লজ্জা সব ছেড়েছে। পুত্র, কন্যা, পতি, পিতা, সব ছেড়েছে। গৃহত্যাগিনী যোগিনী। কেন? তাঁর জন্য — ঈশ্বরের জন্য। অন্য লক্ষ্য নাই। ক'জন পারে এ করতে? কার মনে এ সাহস আছে? যাঁরা তাঁর জন্য এত করেছেন, তিনি তাঁদের জন্য ভাববেন না! তিনিও ভক্তের নিকট চিরবিক্রীত হয়ে যান। তাই ঠাকুর বলতেন, গোপীদের ভালবাসার এক কণা পেলে হেউঢেউ হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের ঐ অবস্থা হয়েছিল — গোপীদের অবস্থা! নিজের কথা চৈতন্যের নাম করে বলতেন। গোপীদের ভালবাসা ব্রহ্মজ্ঞানের পর হয়েছিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, কথাটা হচ্ছে, সচ্চিদানন্দে প্রেম। অমৃত-সাগরে পড়া। স্তব করেই হোক, কিংবা ধাক্কা মেরেই ফেলে দিক, ফল এক। অমর হবে। বেদান্তমার্গী হোক, শাক্ত-বৈষ্ণব হোক, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান হোক, যে পথেই যাক,

আন্তরিক তাঁকে ভালবাসা চাই। বলতেন, মিছরির রুটি সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্টি লাগবেই।

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীম-র বুঝি ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি মত্ত হইয়া গানের পর গান গাহিতে লাগিলেন —

গান। গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

গান। বেলা যায় অবিরত ভাবব কত গৌরগত প্রাণ হয়েছে।

গান। পাড়ার লোকে গোল করে মা আমায় বলে গৌর কলঙ্কিনী।
এ কি 'কয়বার' কথা, কইবো কোথা
লাজে মলাম ওগো প্রাণ সজনী॥
একদিন শ্রীবাসের বাড়ি, কীর্তনের ধুম হুড়াহুড়ি;
গৌরচাঁদ দেন গড়াগড়ি শ্রীবাস আঙ্গিনায়;
আমি একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, (একপাশে নুকায়ে)
আমি পড়লাম অচেতন হয়ে, চেতন করায় শ্রীবাসের রমণী।।
একদিন কাজির দলন, গৌর করেন নগর কীর্তন।
চন্ডালাদি যতেক যবন, গৌর সঙ্গেতে;
হরিবোল হরিবোল ব'লে, চলে যান নদের বাজার দিয়ে।।
আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখেছিলাম রাঙ্গাচরণ দু'খানি॥
একদিন জাহ্নবীর তটে গৌরচাঁদ দাঁড়ায়ে ঘাটে,
চন্দ্র সূর্য উভয়েতে গৌর অঙ্গেতে।
দেখে গৌররূপের ছবি ভুলে গেল শাক্ত শৈবী।
আমার কলসী পড়ে গেল দৈবী, দেখেছিল কাল্ ননদিনী।

(কথামৃত ৫ম ভাগ, ১০ম খন্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

৩০শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

শ্রীম দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে বসা। ভক্তগণে গৃহ পূর্ণ। শরীর অসুস্থ। সন্ধ্যা হইয়াছে। মিনিট পনের ধ্যান করিয়া নিজে গান গাহিতেছেন।

গান। ধন দিবি তোর কি ধন আছে।

গান। কিঙ্করে করুণাময়ী।

গান। মন চল নিজ নিকেতনে।

গান। জীবন বল্লভ তুমি দীন শরণ হে,
প্রাণের প্রাণ তুমি ও প্রাণরমণ হে,
সদানন্দ শিব তুমি সুন্দর শোভন,
সুন্দর যোগিজন চিত বিমোহন॥

শ্রীম অনেকগুলি ভজন গাহিলেন। তৎপর কথামৃত পড়িতেছেন — ঠাকুর নিজের ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ভাদ্র মাস। বেলা এগারটা হইবে। এখনও আহার হয় নাই। মাস্টার, তারক, অধর, লাটু, হরিশ প্রভৃতি রহিয়াছেন। সিদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সিদ্ধ লোকের লক্ষণ আছে। দশ জনের সঙ্গে মিশছে, কথা কইছে। ভিতরে মন চড়েই রয়েছে। তিলকটিলক কোন বাহ্য চিহ্ন নাই। আর জোঁকের মুখে চুন পড়লে যেমন খসে পড়ে যায়, কামিনীকাঞ্চন তেমন তাঁর নিকট — আবদ্ধ করতে পারে না। যুবতী স্ত্রী কাছে থাকলেও জোঁকের মত — মন উঠে না। এ অবস্থা অবতারাদির হয়। আর ভগবানদর্শন করলে হয়।

শ্রীম (সালিখার ভক্তের প্রতি) — তাই, যারা বিয়ে করে ফেলেছে তাদের ঠাকুর বলতেন, স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে থাকবে কিন্তু আলাদা বিছানায়। গায়ে গা বেশী না লাগে। আর সর্বদা ঈশ্বরীয় কথা হবে। ভাইবোনের মত থাকবে। এ সবই তাঁর নিজ জীবনে ঘটেছে। যা বলেছেন তা' নিজে করে দেখিয়ে গেছেন। নিজে বিয়ে করলেন কেন? কেন মা-ঠাকুরুনকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন? দেখাতে সংসারকে — 'রমণীর সঙ্গে থেকে না করে রমণ'। এক বিছানায় রাখলেন আট মাস কিন্তু দেহসম্পর্ক নাই। নজীরের জন্য এ সব করেছেন। তবে ভক্তেরা জোর পাবে। চেষ্টা করবে ভাই-বোনের মত পবিত্র ভাবে থাকতে। তাঁর এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা। হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ধর্ম উপাসনা করা। ধর্মলাভের চরম অবস্থা ঈশ্বরদর্শন। অপরে তা পারবে না। তাই একটু নামিয়ে বলেছেন। নেহাৎ অতটা না পার, দু' একটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে,

তারপর ওরূপ থাক, ভাইবোনের মত। তাঁর সব লোকশিক্ষার জন্য।

সংসারে থাকতে গেলে টাকার দরকার। কিন্তু সৎপথে থেকে, সৎ উপায় অবলম্বন ক'রে অর্থ উপার্জন করতে বলতেন। যাতে ডাল-ভাতের জোগাড় হয় ততটা। পরিবারের provision (ব্যবস্থা) হয়ে গেলে আর না। তখন বসে বসে ঈশ্বরচিন্তা কর। সংসারে এমন সব অভাব আসে, তখন মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। অর্থ থাকলে তা দিয়ে ঐ অভাব দূর হয়। তাই বলতেন, 'ভক্তদের অর্থ থাকলে অর্ধজীবন্মুক্ত'। কিন্তু যাদের যথেষ্ট হয়ে গেছে, তারা না যায় আর বাড়াতে! তা করতে গেলে সময় কোথায়? Money earning machine (অর্থ উপার্জনের কল) বানিয়ে না ফেলে নিজেকে। কত দিক দেখতেন। না হলেও নয়, হলেও বিপদ। লেজা-মুড়ো বাদ দিয়ে মধ্যপন্থা নিতে বলতেন। ডালভাত চলতে পারে, এমনতর হলেই ভক্তদের হয়ে গেল। তারপর ঈশ্বরচিন্তা কর।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — যারা আদপেই বিয়ে করে নাই, আর যাদের ঈশ্বরে মন আছে, তারা কেন যাবে বিয়ে করতে — জড়িত হতে? দায় পড়েছে! যারা বিয়ে করেছে তারা মনে ত্যাগ করবে। স্ত্রী থেকে পৃথক থেকে সংসার করবে। ঠাকুর বলেছিলেন, বেলতলায় দেখলাম ধ্যানে — সুন্দরী যুবতী, ভাল খাবার, টাকা কড়ি। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'মন, এ সব চাও?' মন বললে, 'না, এ সব চাই না।' সেই জন্য, যারা বিয়ে করে নাই তারা যেন — 'রমণীর সঙ্গে থেকে না করে রমণ' — এটা পরীক্ষার জন্য আবার বিয়ে না করে বসে (হাস্য)!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাঁর ধ্যান করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। একবার তাঁ'তে মন গেলে, ভিতরের দরজা খুলে গেলে, আপনা থেকে সব ঠিক হয়ে যায়। মনই তখন গুরু হয়। সব বলে দেয়, কখন কি করতে হবে। তখন রম্ভা, তিলোত্তমা চিতাভস্ম বলে মনে হয়। যে মনকে তিনি আশ্রয় দেন, ধরেন, কামটাম ওখান থেকে পলায়ন করে।

'পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল'। তাই গুরুর মূর্তি

— ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান করতে হয়।

মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং ধ্যানমূলং গুরুমূর্তিং পূজামূলং গুরোর্পদং। গুরুপদ রোজ ফুল দিয়ে পূজা করা উচিত।

শ্রীম অকস্মাৎ জনৈক অবিবাহিত ভক্তের চক্ষুর উপর স্বীয় ভাবগম্ভীর প্রশান্তোজ্জ্বল, সুবৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় স্থাপন করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, ঠাকুর বলতেন —

'আমার ধ্যান করলেই হবে।' তাই রোজ একটি করে তাঁর scene (দৃশ্য) ধ্যান করা ভাল।

জনবহুল প্রকোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত ভক্তটিকে জনান্তিকে, এই কথা বলিয়াই কথার পূর্ব-প্রবাহ অবলম্বন করিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — অধর সেনের বাড়িতে এসে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়েছিল। মাথাটি বুকে ঝুঁকে পড়েছিল এক পাশে। একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল। কেউ সোজা করে দেয় নাই। তাই গানে বলেছিলেন —

'দরদী নইলে, প্রাণ বাঁচে না।
মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা।'

বাবুরামরা থাকলে সোজা করে দিতো। মনের কথা কইলে শুনবে কে?

'মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।'

সংসারের লোক চায় বিষয়ানন্দ, ভক্ত চায় পরমানন্দ — ঈশ্বরকে। তাই মনের কথা — অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা বললেও বোঝে না সাংসারিক লোক। একজন যদি পাঁচ বছরের শিশুর কাছে ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ বোঝাতে চেষ্টা করে, শিশু কিছুই বুঝবে না। চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। তেমনি বিষয়ীর কাছে পরমার্থতত্ত্ব বলা! বুঝবে না, ভাল লাগবে না।

শ্রীম — (ডাক্তারের প্রতি) চৈতন্যদেব চার শ' বছর পূর্বে এয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে পুরানো গান কিছু কিছু আছে। কিন্তু scenes (দৃশ্যাবলী) তেমন নাই। এ যুগের চৈতন্যের সঙ্গে আমরা ছিলাম। তাঁর কত scene (দৃশ্যাবলী) রয়েছে। আবার পুরানো লোক সব

রয়েছে। খুব সুবিধা এখন। একটি করে চব্বিশ ঘন্টা ধ্যান করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চৈতন্যদেবের একটি scene (ঘটনা) — চাপালগোপাল উদ্ধার। এর কুষ্ঠ হয়েছিল। কাশীতে এসে আদেশ পেল, 'আমি নবদ্বীপে এসেছি, তুমি সেখানে যেও।'

গানে আছে ঃ—

গান। গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু।
আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিল কাশী বিশ্বেশ্বরে,—
আমি এসেছি নদীয়ার শচীর ঘরে, আমি তোমায় চিনেছি হে।।

শ্রীম (সালিখার ভক্তের প্রতি) — কি বলেন আপনি? কাশী থেকে কলকাতার দিকে যত এগুচ্ছেন — কাশী থেকে তত পিছিয়ে যাচ্ছেন কিনা বলুন? তাঁর দিকে মন গেলে সংসারটা পড়ে যায়।

পুরীতে সার্বভৌম মহাপণ্ডিত। ইনি চৈতন্যদেবকে বললেন, 'তুমি চব্বিশ বছরের ছোকরা মাত্র। গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাস করছো কেন? তোমার মন কি বশীভূত হয়েছে? তুমি বেদান্ত পড়।' চৈতন্যদেব করজোড়ে বললেন, 'আমি কি করবো, কৃষ্ণ আমায় টেনে নিয়ে এয়েছে।' সার্বভৌম বললেন, 'আচ্ছা তোমার জিভ্ বের কর দেখি।' জিভ্ বের করলে জিভের উপর চিনি রেখে দিলেন। চিনিতে জল না উঠে, হাওয়ায় চিনি উড়িয়ে নিয়ে গেল। শুকনো পাতার উপর চিনি রাখলে যা হয়। মন চড়ে রয়েছে — দেহজ্ঞান নাই। তখন সার্বভৌম বুঝলেন, ইনি অবতার। টোলে পড়াতে পারতেন না। একদিন 'ধাতু' পড়াতে গিয়ে এমন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করলেন — ছেলেরা গালে হাত দিয়ে বসে রইলো। কিছুই বুঝতে পারলে না — ভাবস্থ হয়ে বলেছিলেন, তাই!

অন্য লোকদের সঙ্গে এঁদের মিলবে কেমন করে? স্ত্রী ভক্ত তাই মাকে বলেছিলেন, 'সাধুরা এসেছে উদ্ধার হতে আর ইনি (ঠাকুর) এসেছেন উদ্ধার করতে। তা হলে কেমন করে মিলবে মা, অন্য

সাধুদের সঙ্গে।' চৈতন্যদেব, ঠাকুর এঁদের সঙ্গে অপরের মিল হয় না।

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। রাত্রি দশটা। শ্রীম চারতলার ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। একটি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের ছবি ও কথামৃত লইয়া উপরে উঠিলেন। ইনি শ্রীমকে বলিতেছেন, 'আজ্ঞে বেদান্ত সোসাইটিতে মেম্বর হওয়ার কথা কি হবে?' শ্রীম বলিলেন, বেশ তো, এতো খুব ভাল। পড়া কি শুধু কলেজে হয়? ওখানে কত advantage (সুবিধা)। পঁচিশ বছর আমেরিকায় ছিলেন কত অভিজ্ঞতা রয়েছে, আবার খুব পণ্ডিত। তার উপর ঠাকুরের লোক — এক বছর সেবা করেছেন। মস্ত সুবিধা এটা। এমন সুযোগ ছাড়তে আছে? আমার বয়স থাকলে আমি যেতাম। কলেজ কি শুধু ঐ — এই সব নিয়ে কলেজ। বিবেকানন্দ সোসাইটি, থিওজফিকল সোসাইটি, বেদান্ত সোসাইটি প্রভৃতি সবখানে যাওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ, গির্জা সবেতে attend (যোগদান) করা ভাল। এইসব নিয়ে একটা কলেজ। তারপর সকলের উপর মঠ।

যতদিন তিনি রেখেছেন এখানে, ততদিন ও সবে যাবে না তো কি করবে? খুব ভাল যাওয়া। তিনি যদি তেমন বৈরাগ্য দেন নির্জনে বসে শুধু তাঁর চিন্তা করবার — তখন অন্য কথা। কিন্তু যতদিন তা না হয়, ততদিন এ সবে যাওয়া ভাল। তাঁর কি শুধু এক পথ? নানা পথ। কোন্ পথে কাকে নিয়ে যান! বিবেকানন্দকে দিয়ে কত লেখাপড়া করালেন।

৩১শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

শ্রীম মর্টনের দোতলার বারান্দায় বেড়াইতেছেন। গোপেনের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শুকলাল, ডাক্তার, অমৃত, বিনয় প্রভৃতি পশ্চিমের ঘরে বসা। ছোট জিতেন, মাখন ও মুকুন্দ আসিয়াছেন। শ্রীম গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জগবন্ধুও প্রবেশ করিলেন। ইনি বেদান্ত

সোসাইটি হইতে ফিরিয়াছেন। শ্রীম তাঁকে লেকচার নোট পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন।

আজ প্রশ্নোত্তর ক্লাস ছিল। ষাট জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন, 'চিন্তার শক্তি আছে কি?'

স্বামী অভেদানন্দজী — হাঁ, খুব শক্তি আছে। যেমন তোমার চিন্তা, তেমনি তোমার surrounding (আবেষ্টনী)। ডাক্তাররা রোগের চিন্তা করে, উকীলরা মোকদ্দমার চিন্তা করে, তার জন্য এরা রোগী আর মক্কেল নিয়ে থাকে। মনের ভাবটা বদলে গেলে তোমরা সব হতে পার, শরীর পর্যন্ত বদলাতে পার। ইচ্ছা করলে রাজা হতে পার। তোমরা মোহে আছ। মোহ মানে চিন্তার উপর একটা আবরণ। যেন দোকানদার, originality (নূতনত্ব) বিহীন — কেনে আর বেচে মাত্র। কোনও নূতন ভাব নাই। Genius-রা (প্রতিভাশালীগণ) নূতন ভাব দিয়ে যায় জগতে। মনের vibrations-এর (চিন্তার তরঙ্গের) অনেক স্তর আছে — সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ; আবার সত্ত্বের সত্ত্ব, সত্ত্বের রজ ও সত্ত্বের তমঃ ইত্যাদি। যোগীরা ইচ্ছা দ্বারা বাঞ্ছিত দ্রব্য materialise (লাভ) করতে পারেন। তাঁরা ইচ্ছামৃত্যু লাভ করতে পারেন। মনের জোরে যক্ষ্মারোগ সেরে যায়, ঔষধে সারাতে পারে না। বিশ্বাস থাকা চাই, প্রবল বিশ্বাস; তবে চেষ্টা effective (কার্যকরী) হবে।

আমার পা ভেঙ্গে গেল নিউইয়র্কে। ডক্টর কুল 'এক্স-রে' ফটো নিলেন। দেখতে পেলেন হাড় আলগা হয়ে গেছে। বললেন, হাসপাতালে যেতে হবে। আমি যাই নি। তারপর সেই ভাঙ্গা পায়ে চার মাইল বেগে হেঁটে গিয়ে ছ' ঘন্টা লেকচার দি। আগে থেকে appointment (সময় ঠিক করা) ছিল। ডক্টর কুল দেখে অবাক্! আবার 'এক্সরে' নিয়ে দেখেন জোড়া লেগে গেছে। তখন বললেন, 'তুমি ক্রীশ্চান সাইনটিস্ট হলে immortal (অমর) হতে।' একবার ইচ্ছা করে জ্বরগ্রস্ত হই। তারপর bronchitis, dysentery (কাশি, আমাশয়) এ সবও হলো। কিন্তু এই রোগ আমার মনের উপর effect (প্রভাব) করতে পারে নি। হৃষীকেশে ছিলাম, খড় কেটে

এনে নিজে কুটীর বেঁধে থাকতাম। আহা, কি নির্মল গঙ্গাজল, আর কত মাছ! তখন সর্বদা বিচার করতাম — আমি আত্মা, আমি দেহ নই, আমার রোগ নাই, জন্ম-মৃত্যু নাই। একবার ইচ্ছা করলাম, 'জ্বর হোক' — তাই হলো। একবার সুইজারল্যাণ্ডে ছিলাম। পাহাড়ে বেড়াতাম, একদিন ইচ্ছা করলাম, 'উপর থেকে একটা পাথর পড়ুক'— অমনি পড়ে গেল। আর তা'তে পায়ে চোট লাগে। তারপর সাবধান হলাম — আর ইচ্ছা করবো না এরূপ।

শুদ্ধ মন হলে যা ইচ্ছা করবে তাই হবে। মানে ঈশ্বরের মনের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া চাই। Universal consciousness-এর (বিশ্ব চৈতন্যের) সঙ্গে এক হয়ে যাও। এ হলো সহজ বেদান্ত। খুব মস্ত কিছু নয়, আবার সোজা কথাও নয়। নানা শাস্ত্র পড়ে কি হবে? শঙ্করাচার্য বলেছেন,

'বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥'

বহু শাস্ত্রজানা আর ফড়র ফড়র করে ঝাড়া, এতে ভোগ বৃদ্ধি করে, মুক্তি হয় না। আত্মজ্ঞানে কেবল মুক্তি হয়। বল, আমি আত্মা — শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত — এ চিন্তা করলে মুক্ত হয়ে যাবে। পরমহংসদেব বলতেন, যে বলে 'আমি পাপী' সে তাই হয়ে যায়। পরমহংসদেব কি লেখাপড়া, শাস্ত্রপাঠ করেছিলেন? কিন্তু কি অগাধ জ্ঞান! বড় বড় পণ্ডিতরা দেখতুম, হাতজোড় করে তার পায়ের নিচে বসে আছে। তুমি যা ভাববে তাই হবে। পরমহংসদেব নিজেকে জগন্মাতার ছেলে ভাবতে ভাবতে তাই হয়ে গেলেন। তবে তো পণ্ডিতরা কেঁচো হয়ে থাকতো তাঁর কাছে! জ্ঞানের খনি যে ভগবান। জগন্মাতা, তিনি তাঁর কণ্ঠে বসে কথা কইতেন। বলতেন, মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দিচ্ছেন। সেণ্ট ফ্রানসিস্ অব এসিসি Crucified Christ-এর (ক্রুশবিদ্ধ যীশুর) ছবি ভাবতে ভাবতে হাতে পায়ে সব nails-এর (পেরেকের) দাগ হয়ে গেল। হাত পা ছিদ্র হয়ে গেল।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

এমারসন বলতেন, Thoughts are reality (তোমার ভাবনাই

তোমার রূপ)। বাস্তবিক তাই। যেমন thoughts (চিন্তা) তোমার ভিতরে, তেমনি language (ভাষা) দিয়ে বের হবে। Thoughts আর language-এর (ভাব ও ভাষার) সম্বন্ধ অতি নিকট। ঠাকুর বলতেন, ‘মূলো খেলে মূলোরই ঢেকুর দেবে।’ সেণ্ট জন তাঁর Gospel-এ (বাইবেলে) প্রথম উপদেশে বলেছেন — 'The word was God' (শব্দ ছিল ঈশ্বরের রূপ)। অর্থাৎ thought-এর (চিন্তার) component parts (পৃথক পৃথক অংশ) word (শব্দ)। জগৎটা প্রথম ঈশ্বরের চিন্তাকারে ছিল শব্দ সমষ্টিরূপে, তারপর অভিব্যক্ত হলো। তাই 'The word was God' (শব্দই ব্রহ্ম)। তোমার চিন্তাই তোমার নিজ রূপ। সংস্কৃত ‘বাক্’ শব্দের অপভ্রংশ ‘ভকস্’ (Vox), তা থেকে Voice (স্বর) হয়েছে। Thoughts থেকে — language-এর, ভাব থেকে ভাষার সৃষ্টি।

Thoughts-এর (চিন্তার) প্রভাব দেখ। একজন সাধুসঙ্গ — সাধুসেবা করছে। ঐ করতে করতে কালে সাধুর সমস্ত influence (প্রভাব), মনের ভাব তা'তে এসে উপস্থিত হবে। এই জন্য পরমহংসদেব বলতেন, ‘তোদের কিছু করতে হবে না; এখানে (তাঁর কাছে) এলে-গেলেই হবে।’ যারা তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করেছিল — তারাই তাঁর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই যেমন আমরা — তাঁর ভাবেরই প্রতিচ্ছবি। যার যতটুকু আধার, যেরূপ আধার, সে তাই ধারণ করেছে। তিনি ছিলেন অনন্ত ভাবময়। পরমহংসদেবের কাছে বসে থাকতাম। তখন মনে নানা প্রশ্ন উঠতো, মনেই মীমাংসা হয়ে যেতো — জিজ্ঞাসার দরকার হতো না। আমেরিকায় আমারও তেমনি হয়েছিল। যারা কাছে থাকতো তাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যেতো।

‘মনো হি জগতাং কর্তাপুরুষঃ’ — মনই কর্তা। মনে যা কর তাই হয়। শরীরটা — তোমরা ত মৃতদেহ মাত্র। মনই তোমাদের চালিত করছে। মনকে বশীভূত করে — বিষয় থেকে টেনে এনে, তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দেওয়া। অভ্যাস করলে হয়ে যায়, শক্ত বটে। মনশুদ্ধির বড় দরকার তাই। মন সঙ্গে যাবে, শরীর পড়ে থাকবে।

মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হলে তাতে ভগবানদর্শন হয়। এখানেই যদি এবারে শুদ্ধ করতে পার, তা হলে আর আসতে হবে না। নচেৎ আসাযাওয়া করতে হবে। তোমরা আত্মপূজা কর। পরমহংসদেব আত্মপূজা করতেন — নিজেকে নিজে পূজা করা। দেখেছি, নিজের মাথায় নিজেই ফুল দিয়েছেন, আর অমনি সমাধি। ঘন্টা নাড়া নাই ওখানে। আমি আত্মা, শুদ্ধ, মুক্ত — এই ভাবনা করতে করতে মন শুদ্ধ হয়ে যায়। শেষে দেখে, এই শুদ্ধ মনই শুদ্ধ আত্মা।

তোমরা যে বই পড় — এটা কি, ভাব তো? পড়া মানে — to be in the same level of thought with the writer (লেখকের সঙ্গে সমবুদ্ধি হওয়া), like wireless telegraphy (যেন বেতারবার্তা)। বই পড়তে পড়তে একটা শব্দ এলে — বুঝতে পারছো না। সে অবস্থায় ভাবটা চিন্তা করলে শব্দের অর্থ বুঝতে পারা যায়। পূর্বে গুরুমুখে, expert-এর (বিশেষজ্ঞের) মুখে শুনতো; এখন সেটাই পুস্তকে পড়ে। Books give you suggestions. But you are to make them your own by practice. (পুস্তক মাত্র তোমায় ইঙ্গিত বলে দেয়। অভ্যাসের দ্বারা সেটা নিজস্ব করে নেবে)। এরই নাম তপস্যা — এই চেষ্টার নাম। পড়া-শোনা করে আগে একটি ছাঁচ কর, একটি আদর্শ গঠন কর। তারপর যা-ই পড়বে সেটি সেই আদর্শের সঙ্গে test করে (মিলিয়ে) নিবে। নয় তো পড়ার ফল হয় উল্টো। আদর্শ ঠিক করে পড়, কাজ কর, সবই কাজে লাগবে। নচেৎ উল্টো ফল হবে। পরমহংসদেব বলতেন, 'যদি ছিল রোগী বসে, বদ্যিতে শোয়ালে এসে'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বা, বেশ সুন্দর কথা সব। ইনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, মেম্বর হবেন কি না। আমি বললাম, এ যে মহা সুবিধা। সস্তায় হয়ে গেল। আমেরিকায় যেতে হলে কত টাকা খরচ লাগতো। ওখানে আর যেতে হলো না। এখানে বসেই সব শুনতে পারা যাচ্ছে। আমি বলছি কি, এই সব নিয়ে কলেজ — শুধু কি ঐ একটি ঘর কলেজ। যতক্ষণ না তিনি তেমন বৈরাগ্য দিচ্ছেন, ততক্ষণ কি করা যায়? ততক্ষণ এইরূপ ঈশ্বরীয় আলোচনা,

humanitarian work (লোকহিতকর কার্য) শতগুণে ভাল।

ছিঃ, গৃহস্থরা কি নিয়ে আছে? এই তিন চার জন লোক আমার ছেলেমেয়ে, আমার পরিবার, আমার আপনার — এই ভেবে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বদ্ধ হয়ে যায়। তার চাইতে সকলকে আপনার ভাবা কত মহৎ! যাঁরা এরূপ ভাবেন, তাঁদের চিত্ত উদার — তাই মহাত্মা বলে। তাই লোকহিতকর কাজ ভাল। আদর্শ হলো ঈশ্বরদর্শন, উপায়, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকা — 'দর্শন দাও প্রভু' বলে। কিন্তু, ব্যাকুলতা কি সব সময় হয়? ভিতরে যে কাজ রয়েছে। আদর্শ ও উপায় জানা রইলো। এখন উপরে তুলে রেখে, সামনে রেখে — কাজ করা। কাজ না করে থাকতে পারে না লোক। লোকহিতকর কাজ ভাল — সহায় হয়। 'সব তাঁর কাজ' — এই ভেবে করলে, এতে বদ্ধ করতে পারে না। নিজের জন্য শুধু কাজ করার চাইতে, পরিবারের দশজনের জন্য করা ভাল। তার চাইতে বহুজনের কল্যাণের জন্য আরো ভাল। এর চাইতেও ঈশ্বরের জন্য করা শ্রেষ্ঠ। নিজের দেহ, পরিবার ও সমাজ এই তিনেতেই ঈশ্বরদৃষ্টি হতে পারে। নিজের দেহটি তাঁর মন্দির, পরিবার, সমাজ — এও তাঁর মন্দির—তিনি সব হয়ে রয়েছেন, সকলের ভিতর তাঁকে চিন্তা করে কাজ করা। এর নাম ঈশ্বরবুদ্ধিতে কাজ করা। আমাদের মিশনের কাজ এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর জন্য করলে তিনটাতেই মুক্তি, নচেৎ সবই বন্ধনের কারণ। ঠাকুর বলতেন, অকাজ থেকে কাজ ভাল।

It is a great privilege to sit at his feet (ওঁর পদতলে বসতে পারা মহাসৌভাগ্যের কাজ)। কত বড় বড় তত্ত্ব আলোচনা হচ্ছে। কত experience (অভিজ্ঞতা)। পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় বাস, আবার ঠাকুরের অন্তরঙ্গ। তিনি শত অন্য কথা বললেও, ঘুরে ফিরে ঠাকুরের কাছে আসতে হবে। দেখুন না, লেকচারে এত সব কথা বলেন, শেষে ঠাকুরের কথা দিয়ে conclude (সমাপ্ত) করেন। ঠাকুরের কথা যেন সূত্র, আর উনি যেন তার ভাষ্য করছেন। ভাষ্যকাররা vary করে (মতদ্বৈধ হয়), সকলে একমত নাও হতে

পারে। কিন্তু সূত্র এক। (জগবন্ধুর প্রতি) আপনি দু'টি জিনিসের উপর বিশেষ লক্ষ্য রেখে নোট করবেন। প্রথম — তাঁর personal experience-এর (নিজ অভিজ্ঞতার) কথা, আর দ্বিতীয় — ঠাকুরের কথা। দেখুন না, আজ কয়টি scenes (দৃশ্য) পাওয়া গেল। আমেরিকায় পা ভাঙ্গা, হৃষীকেশে জ্বর, আর সুইজারল্যাণ্ডে পাথরের আঘাত। এগুলি একত্র করে শেষে একটা life (জীবনী) লেখা যেতে পারে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — অতবড় পণ্ডিত, দেখুন কি বলছেন। বললেন, নানা শাস্ত্র জেনে কি লাভ! কত শাস্ত্র পড়েছেন উনি। তাঁর মুখে এ কথার value (মূল্য) অনেক। বললেন, শাস্ত্রে ঈশ্বর নাই। অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস মানে তপস্যা। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকার চেষ্টা। ঠাকুরের কথা — বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। যাদের পণ্ডিত হওয়ার ইচ্ছা আছে, তাদের এঁর এই কথায় চৈতন্য হয়ে যাবে।

কলিকাতা ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ।
১৫ই ভাদ্র, ১৩৩০ সাল। শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমী।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে যেন সৈনিক — এমনি ঈশ্বরভক্তি

১

শ্রীম মর্টনের দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে বসিয়া আছেন। ধ্যান শেষ হইয়াছে। ভক্তগণে গৃহ পূর্ণ। বারান্দা হইতে হ্যারিকেন আনাইলেন। কথামৃত পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তখন মোহন গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'আজ কি হলো বেদান্ত সোসাইটিতে, শোনান'। মোহন পড়িয়া শুনাইতেছেন ঃ বিষয় দ্বৈতবাদ (Dualism)।

ক্রিশ্চিয়ান দ্বৈতবাদের মতে ঈশ্বর আর মানুষের সম্বন্ধ যেমন — রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, অথবা প্রভু ও দাসের সম্বন্ধ। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য করলে অনন্ত সুখ (Eternal Heaven), অপ্রিয় করলে অনন্ত দুঃখ (Eternal Hell). Ten Commandments (দশ নীতি) পালন করলে ঈশ্বর সুখী হন। ইহা উপায়।

ঈশ্বর শূন্য থেকে (out of nothing) জগৎ সৃষ্টি করেন, আর হঠাৎ সৃষ্টি করেন (chance creation)। তিনিই জগতের শাসনকর্তা (Governor)। যেমন কুম্ভকার ও কুম্ভ, কিম্বা সূত্রধর ও টেবিল-চেয়ার। নির্মাতা ও নির্মিত বস্তু যেমন পরস্পর পৃথক, সেরূপ ঈশ্বর হতে জগৎ পৃথক। তিনি দূরে বসে শাসন করেন। তাঁর শরীর আছে — আদম (Adam) জোহোবার (ঈশ্বরের) সহিত বেড়িয়েছিলেন। সত্তর জন বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত তাঁকে দর্শন করেন, তাঁর সহিত ভোজন করেছিলেন। নোয়ার কুরবানে (sacrifice) ঈশ্বর তুষ্ট হয়েছিলেন। মুসা তাঁর পৃষ্ঠদেশ দর্শন করেছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাড়া, জগতের প্রায় সকল ধর্মই ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের মত স্বীকার করে থাকেন — ঈশ্বরের প্রিয়াপ্রিয় কর্মই যথাক্রমে মুক্তি ও বন্ধনের কারণ।

হিন্দু দ্বৈতবাদের মতে — ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ বহুবিধ। ভক্তের ভাব অনুযায়ী এই সম্বন্ধ। কখনও ভক্ত ভগবানকে মনে করে শান্তির আধার। কখন বলে, তিনি প্রভু আমি দাস। কখনও তিনি ভক্তের সখা, পুত্র ও পতি। কখনও বা ঈশ্বর মাতা, ভক্ত সন্তান। বিবিধ সম্বন্ধ। মানুষের নানা ভাব। যার যে ভাবটি প্রবল, সেটা দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। যতক্ষণ দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ এই সম্বন্ধ স্বীকার অবশ্য করতে হবে।

হিন্দুরা বলেন, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন — প্রকৃতি (eternal matter) থেকে। ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ, প্রকৃতি উপাদান কারণ — যেমন কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, মৃত্তিকা উপাদান কারণ কুম্ভের। জগৎ হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই — ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। জীবের আত্মা অনাদি, অনন্ত, জন্ম-মৃত্যুরহিত। হিন্দুরা বলেন, প্রবাহ আকারে জগৎ অনাদি, অনন্ত, কিন্তু জীবের নিকট অনাদি, সান্ত। মুক্তি হয়ে গেলেই জীবের নিকট জগৎ নাই; ক্রিশ্চিয়ানরা কিন্তু জগতের আদি মানেন। ভক্তের ভাব অনুযায়ী ভগবান রূপ ধারণ করেন — নানা রূপ। সগুণ সাকার — সগুণ নিরাকার। কালী, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি। জগতের বাহিরে ঈশ্বরের ধাম আছে। সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকা অনন্তকাল — ইহাই দ্বৈত মুক্তি। সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য, সাষ্টি — হিন্দু দ্বৈতবাদে এই রকম মুক্তি মানে। আবার তিনি জীব ও জগতের অন্তর্যামী, আবার সর্বব্যাপী।

হিন্দুরা কল্পান্তে সৃষ্টি স্বীকার করেন। এইভাবে সৃষ্টির আদি স্বীকার করেন — কিন্তু প্রবাহ আকারে অস্বীকার করেন। ক্রিশ্চিয়ানরা তা মানেন না। হিন্দুরা স্বীকার করেন, যেমন বটবৃক্ষের নাশ হলেও বীজ আকারে অবিনশ্বর অর্থাৎ বীজের ভিতর থেকে যায় — বৃক্ষরূপ নাশ হলেও; সেইরূপ মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে জীবের আত্মাসমূহ বিলীন হয়ে থাকে — বিনাশ নাই। নূতন সৃষ্টিতে পুনরায় পূর্ব-বাসনা এসে সংযুক্ত হয়। এইরূপ জন্ম-মরণ, সৃষ্টি-প্রলয় চলতে থাকে, যাবৎ না মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে যায়।

হিন্দুরা বলেন, মুক্তি প্রতীচীর মত স্বর্গে (Heaven) গমন নহে।

মুক্তি মানে জন্ম-মরণ-রূপ চক্র থেকে রেহাই পাওয়া। ঈশ্বরদর্শন হলে এই চক্রে পড়তে হয় না। এই মুক্তিলাভ প্রত্যেক জীবই করবে — বিলম্বে অথবা অবিলম্বে। উহা তাঁর স্বরূপ। শয়তান বা অনন্ত নরক নাই হিন্দুমতে। ঈশ্বর পাপপুণ্যের জন্য পুরস্কার বা তিরস্কার করেন না; জীবের পাপপুণ্য, ভালমন্দর জন্য তিনি দায়ী নহেন; ক্রিশ্চিয়ান ও মুসলমানগণ এই সব স্বীকার করেন। হিন্দুরা বলেন, জীবের আপন কর্ম পাপপুণ্যের জনক। তাঁরা পূর্ব জন্ম স্বীকার করে বলেন, শুভ কার্য পূর্ব জন্মে করে থাকলে এ জন্মে ভাল ফল হবে, অশুভ করলে দুঃখ হবে। কর্মানুগামী জন্ম ও ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের সৃষ্টি করি আমরা নিজে। মানুষের কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা আছে। কর্ম শুভ-অশুভ ফল দেয় — ঈশ্বর নহে। ঈশ্বর প্রেমময় — মঙ্গলময়।

হিন্দুরা বলেন, ঈশ্বর যেন চুম্বকের পাহাড়। সাধু ও মহাপুরুষগণ যেন সেই পর্বতের বড় বড় টুকরা। এঁদের সেবা করলে মুক্তিলাভে সহায় হয়। শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাইকে মুক্ত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বহু জনের পাপ নিজে গ্রহণ করে তাদের মুক্তি দিয়েছেন। এই মহাপবিত্র ও শক্তিমান পুরুষগণ যেন স্পর্শমণি — তাঁদের স্পর্শে পাপীগণ মুক্ত হয়ে পবিত্র সোনা হয়ে গেছে। তাঁদের সংস্পর্শে আবার কত লোকের কল্যাণ হচ্ছে।

হিন্দুরা প্রাণীমাত্রকেই জীব বলে। এই জীব রচিত হয় চতুর্বিংশতি তত্ত্বে — পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, আর মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার। যাবৎ মুক্তি না হয় তাবৎ এইগুলি সঙ্গে থাকে। জীবের উন্নতির শক্তি অফুরন্ত। একবার পাপ করলেই অনন্ত নরক হয় না। আবার চেষ্টা করে পুণ্য করলে পরজন্ম ভাল হয়। হিন্দুমতে জীবের এইটি বিশেষ অধিকার ও সুযোগ।

ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা প্রয়োজন। অন্য ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি জানা দরকার; তবে নিজের ধর্মে কি আছে — ভালমন্দ সব বোঝা যায়। জ্ঞান মহাশক্তি। ধর্মের মূল তত্ত্ব — ঈশ্বর আছেন, এই বিশ্বাস। উহা না থাকলে চরিত্রই গঠিত হয় না। চরিত্র না থাকলে সুখ-শান্তি কোথায়? এলোমেলো চললে চরিত্র গঠিত হয় না। একটি আদর্শ

(মানে ঈশ্বর) স্থির করে অগ্রসর হতে থাক। তা'তে চরিত্র গঠিত হবে। আজকাল স্কুল-কলেজের পড়ায় চরিত্রগঠন হওয়া কঠিন। তোমরা নিজেরা চেষ্টা কর, পারবে। আমেরিকার প্রত্যেক স্কুল-কলেজের সঙ্গে একটি গির্জা আছে। বাইবেল নিয়মিতরূপে পড়ান হয়। এতে বিশেষ কিছু না হলেও, ছেলেদের মনের ওপর উচ্চ আদর্শের একটা ছাপ লেগে যায়।

কাজ না করলে কিছু হয় না। অল্প পড়, অভ্যাস কর বেশী। যা পড়লে বা জানলে ধর্ম সম্বন্ধে, সেইটা জীবনে পালন করতে চেষ্টা কর। সরল জীবনযাত্রা, আর উচ্চ চিন্তা — এই চাই। পুঁথিগত বিদ্যায় কিছু হয় না — কাজে লাগ। তোমরা খুব বড় হতে পারবে। পুঁথিগত বিদ্যা যেন ধোপার কারখানা — নিজের কিছু নাই, সব পরের — পরমহংসদেব এই কথা বলতেন।

যথার্থ ধর্মজিজ্ঞাসু আজকাল কম। আমরা ষোল বছর বয়সে পরমহংসদেবের কাছে গিয়েছিলাম ধর্মের জিজ্ঞাসা নিয়ে। ঈশ্বর, জীব, জগৎ, মুক্তি — এই সব বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা চাই। যেমন লক্ষ্য স্থির না করে গুলি মারা বিফল, তেমনি আগে এইগুলি ঠিক করে কাজে লেগে যাও। দেখবে, হুড়হুড় করে এগিয়ে যাবে। প্রার্থনা কর — হে প্রভো, আমায় সুপথে চালিত কর, জ্ঞান ভক্তি দাও। পরমহংসদেব বলতেন, 'মা আমি অন্য কিছু চাই না। আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও — আর অচল অটল বিশ্বাস।' স্বার্থপরতা, দেহসুখ মহাশত্রু। এ ছেড়ে বল — 'ঈশ্বর, হে প্রেমময়, আমায় তোমার কাছে নিয়ে যাও, মানুষ কর — যথার্থ মানুষ।'

শ্রীম — তাই তো বলি যেতে সবাইকে। কি সুন্দর কথা সব! স্কুল-কলেজে এ সব কোথায় পাবে? কত বড় লোক — এ দিকে পণ্ডিত আবার অন্তরঙ্গ। দেখ, সব কথার শেষে ঘুরে ফিরে ঠাকুরের কাছে আসতে হচ্ছে। কি impression (দাগ) লাগিয়ে দিয়েছেন। তা ভুলতে পারে না কেউ। অবতার না হলে এ দাগ লাগাতে পারে না। ঢোঁড়া সাপের কর্ম নয়। তাঁকে কি আমরা চিনতুম? তিনি নিজেকে নিজেই চিনতেন। কৃপা করে আমাদের টেনে নিয়েছেন।

শ্রীম আহার করিতে উপরে গেলেন। ভক্তগণ ভজন গাহিতেছেন। মণি গাহিলেন —

'চল, মুসাফির বান্ধ গাঠরিয়া, বহুত দূর যানা হোগা।' শ্রীম আসিতেই গান বন্ধ করিয়া দিলেন। পুনরায় তাঁহার কথায় গাহিয়া শেষ করিলেন। এবার শ্রীম নিজে গাহিতেছেন —

গান। মা এ তোর কোন্ দেশী বিচার
পথে পথে বেড়াই কেঁদে দেখা দেস নি একটি বার॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গিরিশবাবুর রচনা। ভিতরে ভাব না থাকলে কি এমন গান হয়? গিরিশবাবু অন্য লোকের কাছে একটা বাঘ — ভক্তরা গেলে — আমরা গেলে দেখতাম কিনা — যেন ছেলেটি। কম গা! 'চৈতন্যচরিত' লিখেছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার পূর্বে। এইটি দিয়ে তাঁকে লাভ করেন, এইটি নৈবেদ্যস্বরূপ।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — কাশীপুরে বাগানে ঠাকুর অসুস্থ। একদিন বললেন, এই রোগ — মৃত্যু-যন্ত্রণা। তবুও দেহ ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না। পাছে তোমরা কেঁদে কেঁদে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও। আহা, কি ভালবাসা ভক্তের জন্য! তখন সর্বদা চিন্তা করছেন, কিসে তারা মানুষ হয়। কি করে অনন্তকালের জন্য সুখ — Eternal Life — লাভ করতে পারে।

যারা তাঁর জন্য সব ছেড়েছে, কত ব্যাকুল তারা। সেদিন শুনলুম, মঠে একজন সারা রাত ডেকেছে — মায়ের মন্দিরে বসে, সামনে গঙ্গা। কনখল থেকে একজন লিখেছে, 'আমরা ঠাকুরকে দর্শন করতে পারি নাই। আমরা কি এখনও তাঁর দর্শন পাব না?' কি ব্যাকুল তাঁর জন্য! কোথায় হিমালয়, সেখানে বসে এ সব কথা ভাবছে। তাঁর জন্য এরা সব ছেড়েছে — মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, সংসারের সকল সুখ। মঠে আরো পাঁচজনের সঙ্গে যখন থাকে সাধুরা, তখন এক রকম চলে যায়। কিন্তু একলা যখন থাকে, তখন কি ভাবে, যাদের imagination (কল্পনা) আছে, তারা বুঝতে পারে। কতখানি ব্যাকুল তাঁর জন্য। সর্বদা তাঁকে ডাকছে। তাদের ডাক কি আর within bracket (সখের ডাক)? তারা বুঝতে পেরেছে, এই শরীর থাকবে

না। থাকতে থাকতে তাঁকে লাভ না করলে সব বিফল — 'ন চেদীহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ'। এটি তারা বুঝেছে, তাই প্রাণপণ করছে। মন, প্রাণ, শরীর সব দিয়ে ডাকছে। তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন তাদের মনোবাসনা। (ডাক্তারের প্রতি) ঠাকুর এত ঐশ্বর্য আমাদের দিয়েছেন, কোনটা ধরি ঠিক করতে পারছি না — যেন বাঁশবনে ডোম কানা। একজন সাধু একটু ভস্ম দিল, তাতে রোগ সারলো, কিংবা টাকা হলো, এইজন্য কত মান তার! আর যিনি Eternal LIfe — 'অমৃতত্বম্' দিয়েছেন তাঁর কত মহত্ত্ব! তিনি অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি দিবার জন্য ব্যস্ত — ভক্তদের। যে চায় সে পায়।

২৮শে আগষ্ট, ১৯২৩ খ্রীঃ।

২

শ্রীম ঐ ঘরে বসিয়া আছেন — দ্বিতলে পশ্চিমের ঘর। তিন পাশে ভক্তগণ। শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, মনোরঞ্জন ও শচী আসিয়াছেন। ছোট জিতেন, ছোট নলিনী, অমৃত ও যোগেন প্রায় একসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বেদান্ত সোসাইটি হইতে মোহন আসিলেন! এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম নোট পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। আজের বিষয় — বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত সভা হয়। সভ্যসংখ্যা প্রায় আশী জন।

স্বামী অভেদানন্দ (সভ্যগণের প্রতি) — বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর বিরাট — সব তাঁর ভিতরে — God is both intra-cosmic and extra-cosmic. এই physical world-এর (বাহ্য জগতের) কারণাবস্থা তাঁর শরীর। অনন্ত ইন্দ্রিয় তাঁর। তিনি আমাদের সকলের চোখ দিয়ে একই সময়ে দেখেন। এটা যখন বুঝতে পারবে, তখন বিরাট ভাবের ধারণা হবে। তুমি মনে করছ — তুমি দেখছ, শুনছ; কিন্তু বাস্তবিক তিনি সব করছেন। His breath is wind : His mind is the sum total of all minds (তাঁর নিশ্বাস পবন, তাঁর মন সকল মনের সমষ্টি)। তাঁর বুদ্ধিও অনন্ত। প্রত্যেক জীব এক

একটি world (জগৎ), এরূপভাবে সকল জীবকে ভাব দেখি; infinite (অনন্ত) হয়ে যায়। মানে, মানুষের ক্ষুদ্র মন তা ভাবতে পারে না ঠিক ঠিক, তাই বলে অনন্ত — পাত্তা করতে পারে না। ঈশ্বর আবার এরও soul (অন্তরাত্মা)। He is both the efficient cause and the material cause (নিমিত্ত, উপাদান দুই কারণই তিনি) শুধু Governor-ই (বিশ্বের শাসনকর্তাই) নহেন। অনন্ত 'আমি' জ্ঞানই ভগবান।

বাহ্যজগতের কারণাবস্থাকে বিরাট বলা হয়েছে। তাঁকে শক্তি বা প্রকৃতিও বলা হয়। Matter and force are inseparable (জড়বস্তু ও শক্তি অভিন্ন)। এদের কারণাবস্থাই প্রকৃতি — Energy. একেই ল্যাটিনে বলে Procreatrix or Creative Energy (ক্রিয়াশক্তি)। শক্তির কারণাবস্থা অনুমেয়। কার্য দেখে কারণের অনুমান হয়। কার্যশক্তি দেখে কারণশক্তি আছে বোঝা যায়। পাখা ঘুরছে, আলো উত্তাপ ও জ্যোতিঃ বিকিরণ করছে, এই কার্যশক্তি দেখে মানতে হয়, মনে হয়, এরও একটা কারণশক্তি আছে। বটগাছে বীজ আছে আবার বীজের ভিতর বটগাছ রয়েছে। বীজটি আমার হাতে যেন একটি সরষের দানা। দেখ, তা থেকে কি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হয়েছে। শিবপুরে গিয়ে দেখো, বোটানিক্যাল গার্ডেনসে — একটা বটগাছের একশ' পঞ্চাশটা trunks (কাণ্ড) এই সবই ঐ ক্ষুদ্র বীজে ছিল — অব্যক্তভাবে। Cause and effect are the different aspects of the same Sakti (এক শক্তিরই ভিন্নরূপ কার্যকারণ)। এ সাংখ্যদর্শনকার কপিল মুনির মত। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত Western scientists (পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ) বুঝতে পারেন নাই, 'নাসতো সদ্ভাবঃ' — এই সাংখ্য সূত্রটি ওঁরা বলতেন, out of nothing comes something (অভাব থেকে সদ্ভাব হয়)। Disappearance of something was meant by them as annihilation (পঞ্চইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যা নয় তার অস্তিত্ব নাই, এ কথা তাঁরা বলতেন)।

ইংরেজরা তোমাদের চাইতেও এগিয়ে যাচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দী

পর্যন্ত তোমরা আগে ছিলে। এখন ওদের নাগাল পাবে না। ও সব দেশে প্রত্যেক ধনীর বাড়িতে private laboratory (নিজেদের গবেষণাগৃহ) আছে। পাঁচটা ছেলে শিখছে। তোমাদের কোনও ambition (উচ্চ আকাঙ্ক্ষা) নাই। গোলামি করা, জুতো খাওয়া কেরাণীগিরি, হদ্দ উকিল হওয়া — এই ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা)। পাশ্চাত্ত্যের জগৎজয়ী ambition (আকাঙ্ক্ষা)। Self-confidence জাগ্রত কর, নিজেকে বিশ্বাস কর, জগৎ জয় করতে পারবে। ভাবতে হবে, আমরা তাঁর অংশ। আমাদের মন তাঁর মনের অংশ। Inertia (জড়তা) ছাড়, বল, আমি তাঁর সন্তান — অনন্ত শক্তিমান। আর পুরানো শাস্ত্রাদির আলোচনা কর। এই বিশ্বাস নিয়ে জগৎ জয় করতে পারবে; Conservation of Energy (জড়শক্তির অক্ষয়তা) আমাদের ঋষিরা বার করেছিলেন। এখন ওরা এ সব বুঝে ফেলেছে, ঋষি হয়ে গেছে — মস্ত মস্ত সব ঋষি হয়েছে। তোমরা কি করছো — অল্প বয়সে বিয়ে করে খালি 'হা পেট, হা পেট' করছো।

এক প্রাণশক্তিই — গাছে মাছে, মশা-মাছিতে, সকলের ভিতর রয়েছে। একে বলে Life (জীবন)। 'Living Being' ('জীবন্ত পুরুষ') মানে ঈশ্বর। তিনিই একমাত্র living (জীবন্ত) — আমরা তাঁর শরীরে রয়েছি, এ তাই মনে হয় living (জীবন্ত)।

মহাপ্রলয়ে সুপ্ত ছিলে, কারণে ছিলে; একে বলে involution (অব্যক্ত স্থিতি)। আবার নূতন কল্পে তোমাদের ছেড়ে দিলেন। তখন যার যেখানে যে কাজ ছিল করতে আরম্ভ করলে। একে বলে evolution (ক্রমবিকাশ-গতি)। তিনি একটা endless bonfire (অনন্ত বহ্নি) আমরা তাঁর sparklings — ফিন্‌কি সব।

তুমি ঈশ্বর ছাড়া কি থাকতে পার? তুমি মনে করছ সব করছ, তা নয়। তাঁকে ছেড়ে কিছু করতে পার না। 'আমি সব করছি' — এই ভাবকে বলে অজ্ঞান। 'তুমি সব করছো' — 'আমি যন্ত্র মাত্র' — একে বলে জ্ঞান। আজ থেকে ছেড়ে দাও এই অজ্ঞান — বল, আমরা তাঁর অংশ। এতে মনে জোর আসবে। তোমরা তাঁর মত শক্তিমান হতে পারবে — এখন অল্প শক্তিমান। Bonfire আর

sparkling (বহ্ন্যুৎসব ও তার ক্ষুদ্র ফিন্‌কি) এই দুইয়ের গুণ কিন্তু একই। এক ফিন্‌কিতে জগৎ পুড়িয়ে দেওয়া যায়।

Infinite (অসীম) বলতে কি বোঝা যায়? না, তিনি Immanent আবার Transcendent - জগতের অন্তর্যামী, আবার জগতের অতীত। তোমার আত্মা তোমার শরীরেও আছে আবার বাইরেও আছে। আত্মজ্ঞান হলে এটা বোঝা যায়, তিনি অন্তরে আবার বাইরে সর্বত্র তিনি। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জীব অংশ ঈশ্বর অংশী, পূর্ণ আর অংশ — অংশাংশীভাব।

The Theory of Physiology (দেহবিজ্ঞান) আগে এরূপ ছিল না। কতক কতক ছিল। এখন খুব এগিয়ে গেছে। এ সব তোমাদের জানা দরকার। আকৃতি (form) means limitation by time and space (স্থান ও কালদ্বারা সীমাবদ্ধ অবস্থা)। গৃহাকাশ সৃষ্টি হলো যখন দেয়াল তুললে। এইজন্য তোমার দেহ তাঁর দেহ হতে পারে না — দেয়াল তোলায়। নূতন দেহাকাশ সৃষ্টি করেছো দেওয়াল দিয়ে — অহংকাররূপী। এর আদি অন্ত আছে। ঈশ্বরের দেহের তা নাই। ভেঙ্গে ফেল ক্ষুদ্র দেহাকাশ — এই গৃহাকাশ। তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাও।

Man's relation to God, says Christ, is like the grapes to the vine. It is like the tree, and its branches. The tree is greater than the branches. So, Christ says : my Father is greater than myself. (যীশুখ্রীষ্ট বলেন, 'দ্রাক্ষালতার সহিত ফলের যে সম্বন্ধ, জীবের সহিত ঈশ্বরের সেই সম্বন্ধ।' অথবা যেন বৃক্ষের সহিত শাখার সম্বন্ধ। তাই যীশু বলেছেন, আমার পিতা অর্থাৎ ঈশ্বর আমার চাইতে বড়)। ইহারই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ — পূর্ণের সহিত অংশের সম্বন্ধ। তিনি আমাদের দেহের দেহ, প্রাণের প্রাণ, মনের মন। আমরা তাঁ'তে অবস্থিত — তাঁর অংশ, সন্তান।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — প্রকৃতিতত্ত্ব ইনি এক রকম ব্যাখ্যা করলেন। অন্যে আবার এ কথা মানবে না। অনেক মত আছে। তাই

ঠাকুর বলতেন, 'মা, অত সব হিসেব-টিসেব আমি জানতেও চাই না, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।' তবে একবার শুনে রাখা ভাল। তিনি বলেছিলেন, 'কে জানে বাপু, তোর গাঁই-গুঁই, বীরভূমের বামুন মুই' (হাস্য)। আমি তাঁর সন্তান — এটি জানলেই হলো। জেনে তপস্যা করি; চেষ্টা করে ওটি হওয়া। এটি খাঁটি কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আপনারা সকলেই যান না — অত কাছে হচ্ছে। পাওয়া যায় কোথায় এমন সুযোগ! যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের অনেক রকম জানা দরকার। ঠাকুর বলেছিলেন, অন্যকে মারতে হলে ঢাল তরোয়ালের দরকার। নিজের প্রাণ নরুনেই নেওয়া যায়। নানা জ্ঞান অস্ত্রবিশেষ।

নিজের প্রাণ মানে false (মিথ্যা) অহংকার, কাঁচা আমি। এই 'আমি' ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। (মোহনের প্রতি) আমার ইচ্ছা হয় এই কলকাতা সহরে কে কি ভাবে ঈশ্বরকে ডাকছে তা দেখতে। আহা, এক সঙ্গে যদি দেখা যেত এই scene-টি (দৃশ্যটি)! তবে agency organise (শাখার সংগঠন) করলে সব খবর পাওয়া যেতে পারে। ভক্ত দেখলে ভগবানের উদ্দীপন হয়! ঈশ্বরকে নিয়ে যতটুকু থাকা যায় — ততটুকুনই real life (সত্যিকার জীবন)। যে চব্বিশ ঘন্টা তাঁকে নিয়ে আছে তিনি কে? পরমহংসদেবকে দেখেছি দিবানিশি, মা, মা; কখনও সমাধিস্থ — অন্তরে মা'র সহিত এক হয়ে গেছেন। কখনও ভিতরেও তাঁকে দেখছেন, বাইরেও তাঁকে দেখছেন। তাই বলছেন, মোমের বাগান, মোমের ঘর, বাড়ি, সব মোমের। অন্তরে বাইরে মোম। ইহা অর্ধবাহ্য দশা। আর বাহ্য অবস্থায় দেখছেন, মা এই জগৎরূপে নানারূপে খেলা করছেন। তখনই মা, মা করতেন। আর প্রার্থনা করতেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না, মা'। আমরা ধন্য তাঁকে দর্শন করেছি। যারা না দেখে বিশ্বাস করছে তারা আরো ধন্য।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ।

৩

আজ নন্দোৎসব। গতরাত্রিতে ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তদের মঠে পাঠাইয়াছিলেন। আজ সন্ধ্যার সময় শ্রীম সমীপে ভক্তগণ একত্রিত হইয়াছেন। শ্রীম দোতলার পশ্চিমের ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট, ভক্তগণ বেঞ্চিতে। একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বি.এন. আর-এর সেই বাবুটি ছিলেন রাত্রে? (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। ইটেলিতে* থাকে। কাল বিকেলে এখানে এসেছিল। আমরা বললাম, আজ রাত্রিতে মঠে জন্মাষ্টমী ব্রত পালন হচ্ছে, যান না এদের সঙ্গে। ভক্তরা তখন যাচ্ছিলেন। প্রথম যেতে নারাজ। তখন বললাম, এই দেখুন, সাধুরা সব যাচ্ছেন — এঁরা সাদা কাপড়-পরা সাধু। ওখানে লাল কাপড়-পরা ভাল ভাল সাধু আছেন। তারপর রাজী হলো। সংস্কার আছে, নইলে কি সাধুসঙ্গে রাত্রিবাস করতে পারে। ধন্য এঁরা, গঙ্গাতীরে সর্বত্যাগীর সঙ্গে রাত্রিবাস, পূজা দর্শন, আবার ভাগবত শ্রবণ — খুব সৌভাগ্যের কথা। দৈববাণী হয়েছিল — অষ্টম গর্ভে ভগবান আসবেন আর কংস বধ করবেন। তিনি কি মানুষের মত ঈর্ষা-দ্বেষ ক'রে মেরেছিলেন কংসকে? তা নয়, কি করা যায়, তাঁর জগৎলীলা রক্ষার জন্য সরিয়ে নিলেন — যেমন মা অশান্ত শিশুকে সরিয়ে নেয়। খুব বাড়াবাড়ি হলে এই করেন। ভালরও extreme (শেষ) আছে, মন্দেরও extreme (শেষ) আছে। কংস, শিশুপাল, রাবণ — এরা মন্দের শেষ সীমায় পৌঁছেছিল — ঈশ্বরদ্বেষী, ভক্তদের অপমান করেছিল, তাই এদের মা নিয়ে গেলেন। আবার ভালরও শেষ আছে। ঠাকুর সবাইকে মুক্ত করে দিচ্ছেন, চির শান্তি সুখ প্রদান করছেন — eternal life (অমৃতত্ব) দিচ্ছেন, তাই তাঁকেও মা নিয়ে গেলেন। কেন না, তাঁর জগৎলীলার হানি হচ্ছে। সবাইকে ব্রহ্মজ্ঞান দিলে সংসার থাকে না। তাই বলেছিলেন, শরীর যাবার আগে, 'আমি মুখ্‌খু, সব বলে দিচ্ছি তাই মা নিয়ে যাচ্ছেন। দিনকতক থাকলে আরো গোটা কয়েক লোকের চৈতন্য হতো।'

---

* ইটেলি — কলিকাতার ইন্টালি বা এন্টালি এলাকা।

ভক্তের ভাবে একথা বলেছিলেন, ভক্তদের শিক্ষার জন্য। এই ব্যাপারে এই বোঝা যাচ্ছে, মানুষের প্ল্যান শেষ অবধি টেঁকে না — ভগবানের প্ল্যানের কাছে subordinate (নতি স্বীকার) করলে চলে। ভক্তের ভাবে এই কথা বললেন, আর ভগবান-ভাবে চলে গেলেন। কাজ শেষ হয়েছে — যে জন্য শরীর নিয়েছিলেন। তাই চলে গেলেন। তিনিই ভক্ত, তিনিই ভগবান, একাধারে দুই-ই। আবার তিনিই কংস ও রাবণ। লীলার জন্য এ সব হয়। Extreme-এ (চরম অবস্থায়) কাজ হয় না — তাই middle path (মধ্যপন্থা)। ভালমন্দ এ দুটোর মাঝামাঝি হলে সংসার চলে! এতে interference (বাধা) হলেই নিয়ে যান বা চলে যান। ভগবানে — অবতারে ঈর্ষা নাই — সব প্রেম — অনন্ত মায়ের প্রেম।

শ্রীম (বিনয়ের প্রতি) — কে পূজা করলেন, ভাগবত পড়লেন কে?

বিনয় — শশধর মহারাজ পূজক আর অনঙ্গ মহারাজ তন্ত্রধারক। ভাগবতও উনি পড়লেন।

শ্রীম — এসব দিনে যেতে হয় মঠে। সাধুরা, তখন তাঁদের mood-এ (ভাবে) থাকেন। ধন্য যাঁরা রাত্রিবাস করেছেন — বহু বৎসরের তপস্যা হয়ে গেছে একরাত্রিতে। যেমন সব সাধুর সঙ্গ — সর্বত্যাগী। ওঁরা কিছু চান না — কেবল ঈশ্বরকে চান। এই কাজকর্ম যা করছেন এ সবই তাঁকে লাভ করবার জন্য, গুরুর আদেশে। এটা তাঁদের নিজ-রূপ নয়, নিজ-রূপ হলো — তাঁর জন্য ব্যাকুল। যে যা বলছেন তাই করছেন। যেমন মা করেন সন্তানের জন্য — তারকনাথে হত্যা দিচ্ছেন, কালীঘাটে পূজা মানত করছেন, যে যা বলছে তাই করছেন। ধ্যান, জপ, পূজা যখন করেন তখন দেখতে হয়। এ সব অমূল্য জিনিস তিনি করে দিয়েছেন — এই মঠ, সাধু। কিন্তু তার advantage (সুবিধা) নিচ্ছে না লোক। আবার কেমন সিদ্ধ পুরুষ রয়েছেন মঠে। ঠাকুরের ছেলেরাও আছেন কিনা কেউ কেউ। একেই বলে চোখ থাকতে কানা আর কান থাকতে কালা।

৪

এতক্ষণে অনেক ভক্ত সমাগম হইয়াছে। শুকলাল, ডাক্তার, বড় জিতেন, ছোট জিতেন ও বিরিঞ্চি আসিয়াছেন। শচী, শান্তি ও যোগেন পূর্ব হইতেই বসা। তারপর মণি, অমৃত, সুধীর, বড় অমূল্য ও মনোরঞ্জন। ভক্তগণ যতই আসিতে লাগিলেন ততই পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলিতে লাগিলেন — ধন্য এঁরা, কাল মঠে সাধুসঙ্গে রাত্রিবাস ও ভাগবত শ্রবণ করেছেন।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — আজ নন্দোৎসবে কি হয়েছিল মঠে?

ছোট জিতেন — হলুদ জল গায়ে ছড়াছড়ি করছিলেন, আর সাধুরা সব কীর্তন করছিলেন।

'সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে যায় রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে রে।'

শ্রীম — ঠাকুর এই গানটি গেয়ে নৃত্য করতেন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — একটি ভক্ত কাঁকুড়গাছি গিছলো। আজ সকালে মঠে যাওয়ার তার কথা ছিল। পা কামড়িয়েছিল বলে আর যাওয়া হল না। অনেক বেলা পর্যন্ত ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাল। গেলে এ সব আনন্দোৎসব দেখতে পেতো। কপালে নাই। পা কামড়িয়েছিল বলে গেল না অমন স্থানে; কি দুঃখের কথা! এ রকম দুর্বল হলে চলবে না। ঈশ্বরকে যারা লাভ করবে তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক — এরূপ হতে হবে। জ্বর হয়েছে, রাত জেগেছে অত হিসেবের কাজ কি? সেনাপতি অর্ডার করছে, 'march' (আগে চল) অমনি চললো। কোথায় জ্বর-টর পালিয়ে গেল। হয়তো বর্ষা হচ্ছে ভ্রূক্ষেপ নাই। এগিয়ে চলেছে। 'বীরগণ, দেশ শত্রুহস্তে, শিশু, স্ত্রী, বৃদ্ধ শত্রুহস্তে, মাতৃভূমি পরাধীন হবে — চল, এগিয়ে চল, বীরগণ' — এই মর্মভেদী বাণী শুনে জ্বর পলায়ন করে।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — তাই ঋষিগণ উচ্চকণ্ঠে বলেছেন —

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' (মুন্ডক উপনিষদ ৩:২:৪)। দুর্বলের কর্ম নয় ভগবান লাভ। স্বামীজী বলতেন, 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ' (গীতা ২:৩)। ও সব গান কি শুধু মুখে গাওয়ার জন্য? — 'ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।' এ সব চিন্তা করে দেখতে হয়, পালনের চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুরের মুখে গান শুনে অতবড় বেদান্তবাদী ন্যাংটা (তোতাপুরী) কেঁদেছিলেন — 'জীব, সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।' শুনছেন, আর চোখে জল, বলছেন, 'আরে এ কেয়া রে?' অতবড় লোক — সুর শুনেই তাঁর চক্ষু জলময় — অর্থবোধ নাই, তবুও।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দু'বৎসর পর মা'র সঙ্গে দেখা করতে দেশে যাচ্ছে, তখন ট্রেন মিস্ হয় কি? কিন্তু সাধুসঙ্গ করতে গেলেও হয়, পা কামড়ায় — যেখানে গেলে Eternal Life (অমৃতত্ব) লাভ হয়। এই মা শুধু শরীরটা দেখে। আর ঐ মা — শরীর, মন, আত্মা কিসে Eternal Life (অমৃতত্ব) লাভ হয় পুত্রের, সেই চেষ্টা। শোনে কে? আলস্য। (উত্তেজিতভাবে) দুর্বল হলে চলবে না। জনৈকের প্রতি — ছেলে মদ খেলে, বেশ্যালয়ে গেলে মা বলে, পুরুষ-মানুষ এ সব করেই; এই মা দেখে, বেঁচে আছে কিনা। যেখানেই থাক, খবর পেলেই হলো, ভাল আছে। এই মা'র জন্যই যদি এই ভালবাসা, এই আকর্ষণ, তবে জগন্মাতার জন্য, অনন্ত কালের মায়ের জন্য কত ভালবাসা হওয়া উচিত!

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বসে আছেন। তখন তিনি (তর্জনী দেখাইয়া) এমন হয়ে গেছেন — শুকিয়ে কাঠ। তিনি চলে যাবেন, শোকে জর্জরিত — মাথা হেঁট হয়ে গেছে ভক্তের। এই দেখে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ও কি, অমন হলে চলবে কেন — দুর্বলতা পরিহার কর।'

যীশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন — যারা লাঙ্গল দেখতে পেছন ফিরে চায়, তারা আমার সঙ্গী হতে পারবে না। যারা আত্মীয়-পরিজনের স্নেহে বদ্ধ, তারাও সঙ্গে যেতে পারবে না। যারা ভগবানের প্রিয় তাদের মাথা গোঁজবার স্থান নাই '...the son of man hath not

where to lay his head'. (St. Matthew 8:20)

Battle field-এ (যুদ্ধক্ষেত্রে) সৈনিকের মত হতে হবে। পা কামড়ানো, মাথাধরা এ সব তো আছেই। দেখ শশধর সারা রাত জেগে পূজো করেছে, মঙ্গল আরতি, আবার দিনে পূজো করেছে — অবিরাম কাজ। অমন না হলে হবে না। শ্রীম মৌন।

ভক্ত — আচ্ছা, ঠাকুর কি কেবল বাহ্য পূজার কথা বলতেন?

শ্রীম — বাহ্য পূজা দরকার। আবার মনেও পূজা করা যায়, বলতেন। বলেছিলেন, 'মনে মনে ফুল চন্দন দিয়ে একে (নিজের ভিতরের ভক্তকে) পূজা করলুম।'

ছোট জিতেন — অনঙ্গ মহারাজ জিজ্ঞেস করেছিলেন কাল, মাস্টার মশায়ের ওখানে কি হয়েছিল? আমি ভাগবত পাঠের কথা বললুম। উনি বললেন, কাল তো যোগমায়ারও জন্ম দিন গেছে, তাই আমরা চণ্ডীপাঠ করলাম। বসন্ত মহারাজ বললেন, বলবেন ওখানে চণ্ডীপাঠ করাতে।

শ্রীম — ওরা তো দেখছে এখানে আর সেখানে। সবই যে এক জায়গা, মাঝে wall-গুলি (দেয়াল) আছে। তুলে ফেল, সবই এক। অনঙ্গ ওখানে পড়ছে আবার এখানেও হচ্ছে। সবই এক জায়গায় হচ্ছে এক উদ্দেশ্যে।

শ্রীম (বিনয়ের প্রতি) — হাঁ বিনয়বাবু, তোমরা একবার সুখেন্দুবাবুর খবরটা নাও না। অনেক দিন আসে না। ঠাকুর বলতেন, 'পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে' (হাস্য)। হাসপাতালে নাম লেখালে কেন?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — উত্তম বৈদ্য জোর করে ঔষধ খাওয়াবে। শুধু ভিজিট নিয়ে চলে যায় না। ভক্তরা না গেলে — ঠাকুর, বাড়িতে খবর পাঠাতেন। কখনও বা নিজে গিয়ে হাজির হতেন। গিয়ে বলতেন, 'তোমরা অনেক দিন আস না, মন কেমন করছে।' যেমন সাধারণ মানুষ করে থাকে। ভক্তরা কি তখন তা বুঝতে পারতো? তারা তাই খেয়াল করতো না, আসতো না। কিন্তু তিনি তাদের জন্য পাগল। কতখানি ভালবাসা হলে এটি হয়! কত আত্মীয়

ভাবলে এরূপ করতে পারেন! তাই বলে অহেতুক কৃপাসিন্ধু। কেন এরূপ করতেন? জানতেন কি না, এদের দিয়ে কাজ করাতে হবে। তাতে ওদেরও কল্যাণ, জগতেরও কল্যাণ। তাঁর অতুল ঐশ্বর্য সব তাঁদের দিয়ে গেছেন। তাঁরা আবার অপরদের দিচ্ছেন। এইরূপে চলে পর পর। তাই বলতে হয়, ভক্তদের জন্য ভগবানের ভাবনা বেশী। ভক্ত তার জন্য আর কতটা ভাবতে পারে? এই প্রেম সম্বন্ধটি হৃদয়ে ধারণা হ'লেই হ'য়ে গেল। ও-টি ধরে পড়ে থাক, আর আনন্দে গাইতে থাক—

বাজে শ্যামের মোহন বেণু। বেণুরব শুনে জুড়ালো তনু॥
যে বনে বাজিছে সে বনে যাই। এ ছার জীবনে আর কাজ নাই॥
পুরাইব আশ মন অভিলাষ। হ'য়ে থাকি শ্যামের চরণরেণু॥
পঞ্চমেতে পাখী ধরিয়াছে গান। পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে তান।
যাঁহার নামেতে যমুনা উজান। হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিছে ধেনু॥

কলিকাতা ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ।
১৮ই ভাদ্র ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

জগতের মিলনমন্ত্র — শ্রীরামকৃষ্ণের উদার বাণী

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের পশ্চিমের ঘর। শরৎকাল। শ্রীম ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন — চেয়ারে, পূর্বাস্য — ভক্তগণ বেঞ্চিতে। এখন রাত্রি সওয়া আটটা। শুকলাল, ছোট জিতেন, মণি ও মণীন্দ্র, যোগেন ও ছেলে খোকা বসা। ডাক্তার, বিনয়, বীরেন, রমণী এবং মনোরঞ্জনও আসিয়াছেন। আরো অনেক ভক্ত আছেন। শচী ও জগবন্ধু বেদান্ত সোসাইটি হইতে ফিরিয়াছেন। মণীন্দ্র দুই একটি ভাঙ্গা পদ গাহিতেছেন। ভাব—কামক্রোধ দমন না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না। আবার ঈশ্বরলাভ না হলে সম্পূর্ণ দমন হয় না! তাঁকে লাভ করতে হলে তাঁর শরণ লও।

বড় জিতেন ও বিরিঞ্চি কবিরাজ প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঠাকুর কিন্তু এই কামের কথা একজন ভক্তকে বলেছিলেন, ‘শরীর ধারণ করলে কাম একটু-আধটু থাকে। তাতে দোষ নাই।’ ভক্তটি তাকে নিবেদন করলেন, ‘না মশায়, একেবারে যাতে না থাকে আমি তাই চাই।’ ঠাকুর উত্তর করলেন, ‘তা কি হয়? তবে ঈশ্বরদর্শন করলে হয়।’ নিজের চেষ্টাও চাই। যা বলেছেন পালন করা চাই। যেমন বলেছেন — বিয়ে করলে দু’-একটি সন্তান হয়ে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোবে না। গায়ে গা লাগাবে না। আর যারা বিয়ে করে নাই তারা আর বিয়ে করবে না। তাঁর দিকে সমস্ত মন দিতে চেষ্টা করবে। একদিনে কিছু হয় না। চেষ্টা করতে থাক — তাঁকে আশ্রয় করে, তখন হয়। তিনি চান চেষ্টা করুক — চেষ্টা করছে দেখলে তাঁর কৃপা হয়। তিনি নিজে এসে হাত ধরে উঠিয়ে নেন — যেমন মা, পড়ে গেছে ছেলে

আর কাঁদছে — তাকে যেমন উঠিয়ে নেন। এইটি তিনি দেখতে ভালবাসেন। ভক্তরা চেষ্টা করছে, তাঁকে বলবে কেঁদে কেঁদে — বাবা, আমি আর পেরে উঠছি না, তুমি হাত ধর। ব্যাকুল হয়ে বললে, তিনি করে দেন। কখন না বললেও করেন। সে খুব exceptional case (বিরল ঘটনা)। সাধারণত চেষ্টা চান। তাই গীতায় বলেছেন, অভ্যাস কর — অভ্যাস আর বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে অনুরাগ — তাঁর শরণ নেওয়া। তাঁকে কেঁদে কেঁদে বলা। বৈরাগ্যের positive (সুস্পষ্ট) মানে এই। তিনি নিশ্চয় করে দেন ব্যাকুল ভাবে বললে, ঐ ভক্তটিকে করে দিয়েছিলেন।

এখন অভেদানন্দজীর লেকচার-নোট পাঠ হইতেছে। জগবন্ধু পড়িতেছেন — কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দজী) আজ বললেন ঃ "পাশ্চাত্ত্যের একজন সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বলেন, প্রত্যেকটি চিন্তা মনের অজ্ঞাত প্রদেশে একটি দাগ রেখে যায়। (Every sensation keeps an impression in the mind in sub-conscious regions)। স্যার ওয়ালটার হ্যামিলটনেরও মত এই। যোগীরা বলেন, আমাদের বাসনাগুলিও ঐ সকল সঞ্চিত রেখাসমূহেরই প্রতিবিম্ব। পাঁচটায় ধাক্কা লেগে একটা action (ক্রিয়া) হয়। প্রত্যেকটি ভোগের আকাঙ্ক্ষা মনে একটি রেখাপাত করে যায়। এগুলিই সংস্কার। একটা বাসনা হলো, তার ভোগও হলো, তাতে একটু শান্তি হলো। আবার বাসনা, আবার ভোগ, আবার শান্তি। এইরূপে অনবরত চলছে জন্ম জন্ম। শান্তির স্বরূপ ঈশ্বরকে দেখলে এই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তখন খালি শান্তি। সংসারের ভোগে যে শান্তি, তার অপর দিকটা অশান্তি। যোগীদের চক্ষে তাই দুটোই অশান্তি। তাঁদের কাছে শান্তির আধার একমাত্র ঈশ্বর। যোগী মানে, যে self-control (আত্মসংযম) করেছে — মন যার দাস। সংসারী মানে, যার তা নাই — যে মনের দাস। সাধন মানে, repeatedly (পুনঃ পুনঃ) একটা জিনিসে মনকে নিবিষ্ট করা। অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ মন বশীভূত হয়।

"ছেলেবেলা থেকেই অনেকের মন ভগবানে আকৃষ্ট হয় —

যেমন পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, আমরা। পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার নিয়ে আমরা জন্মেছি, তাই। তোমরা নিজেরা ও পিতামাতা সকলেই বাল্যকাল থেকে এই ভেবে আসছ — বিয়ে হবে, ছেলেপুলে হবে, ঘর সংসার হবে, নাম যশ হবে। এই ভাবনায় বড় হয়েছ। এখনও তাই ভাবছ, পরজন্মেও তাই ভাববে। ছেড়ে দাও এই ভাবনা। এখন থেকে অন্যরূপ ভাবতে শেখ। আরম্ভ কর অভ্যাস — এই জন্মেই কিংবা পরজন্মে কৃতকার্য হতে পারবে। এই চিন্তাটা সর্বদা কর — Every enjoyment leaves an impression in the mind. The collection of such impressions is called *samskar.* This *samskar* repeats itself again and again, and at last forms our habits. These habits again will go with us after death. প্রত্যেকটি বিষয়-ভোগ থেকে মনে রেখাপাত হয়। এই রেখাসমূহই সংস্কার নামে পরিচিত। সংস্কার মনে পুনঃ পুনঃ উদয় হয়। এইরূপে রেখার চক্রবৃদ্ধি হতে থাকে। তারপর সংস্কারের সমূহদ্বারা অভ্যাস বা চরিত্র গঠিত হয়। এই চরিত্র বা অভ্যাসই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কারণ হতে থাকে। এইরূপে বাড়তেই থাকে, শেষ নাই। যদি এইটি রোজ চিন্তা কর — দেখবে মন হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। তা হলেই বন্ধনের কাজ আর করতে পারবে না।

"পাশ্চাত্ত্যের লোক এইটি গ্রহণ করে না। পূর্বজন্ম মানে না — তাই কর্মফলও মানে না। সুফিরা এটা মানে, থিওজফিস্টরা মানে। 'নিউ সায়েন্স'ও মানতে আরম্ভ করেছে। এক বাপের পাঁচ ছেলে — এদের একজন সাধু — এটা explained (ব্যাখ্যাত) কি করে হবে পুনর্জন্মবাদ না মানলে? যদি বল — ঈশ্বরের ইচ্ছা, তা হলে আর এক জনের কেন হলো না? ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর কৃপা যেন সূর্যের আলো — সাধু ও খুনী উভয়ের উপরই সমানভাবে বর্ষিত হয়। কর্মফল মানলে এর explanation (ব্যাখ্যা) হয় ইংরেজরা বলেন, লুথারও (Luther) বলতেন — Man is a beast of burden. Sometimes God drives it, sometimes, Satan.

(মানুষ একটি ভারবাহী পশু — কখনও ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হয়, কখনও শয়তান চালায়)। এরা শয়তানকে দিয়ে ভ্রম, পাপ, এসব explain (ব্যাখ্যা) করেন। এই মতের চাইতে আমাদের মত more rational and scientific (যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত)। আমাদের মত আজকাল ইংরেজ ও আমেরিকানরা অনেকে নিতে শুরু করেছে। খ্রীস্টধর্মে, এসব তত্ত্ব explain (ব্যাখ্যা) করতে পারে না বলে, অনেকে এই ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে। ওরা বলে, ভালর creator (সৃষ্টিকর্তা) God (ঈশ্বর) আর খারাপের শয়তান। পাপ, ভ্রম, মোহজাল — এ সবই পূর্ব অভ্যাসের বশে হয়। এই দোষটি স্বকৃত — এই কথাটি ভাব। বাপ মা বা ঈশ্বরের উপর চাপিও না। নিজের উপর নিলে শীঘ্র ছাড়বার চেষ্টা হয়। শাস্ত্র এই বলেন, তোমার নিজের জন্য তুমি নিজে দায়ী। পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব নিজে নেবে।

"Some again argues to explain the varieties of nature of men — good and evil, by heredity or environments or both. But the same objection comes again. If it is true, then why do the five sons of the same parents born, brought up, and educated under the same conditions and environments, differ in their character? So, this explanation is unsatisfactory. Therefore the Law of *Karma* is the best instrument to explain it.

"এক মত আছে — বংশ ও আবেষ্টনীর দোহাই দিয়ে মানব চরিত্রের ভালমন্দর বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করে থাকেন। পুনরায় পূর্বকথিত আপত্তি ওঠে, যদি বংশের দোষগুণে অথবা আবেষ্টনীর দোষগুণের এই শক্তি থাকে তা হলে একই পিতামাতার, পাঁচটি সন্তান পাঁচরূপ হয় কেন? এদের সকলেরই জন্ম, লালন-পালন, ও শিক্ষা একই পিতামাতা দ্বারা, একই অবস্থা ও আবেষ্টনীর ভিতরই সম্পন্ন হয়েছে। তাই এদের মত সমীচীন নহে। তাই কর্মবাদ বা পুনর্জন্মবাদ গ্রহণীয়। সংস্কারতত্ত্ব অনায়াসে এই সংশয় দূর করতে সমর্থ।

দুঃখ দূর করতে হলে, জন্মমরণ দূর করতে হবে। তা করতে হলে আত্মসংযম বা চরিত্রগঠনের দরকার। তা হলে বিষয়ভোগ ছেড়ে দিতে হবে। ভোগ থেকে শান্তি পেতে পার — এই বাইরের পদার্থ থেকে, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। একটু পরেই দুঃখ এসে পড়বে। বিষয়ভোগ থেকে যে শান্তি, তাকে তামসিক-শান্তি বলে। ঋষিগণ, যোগীগণ এই সব কারণে বলে থাকেন, ভোগের নিবৃত্তি নাই। আগুনে ঘি যতই ঢালবে ততই জ্বলবে।

শান্তি পেতে চাও — খাট আর তাঁকে ডাক — নিশ্চয় পাবে। নিজে চেষ্টা না করে কেউ শান্তি পায় না। বিচার কর, আর কাজ কর। আমরা সর্বদাই বিচার করছি, ঈশ্বর সৎ — জগৎ অসৎ, ভোগ অসৎ। নির্জনে বনে বনে, আবার সজনে এখানে বসে, এই একই বিচার করছি। ইহাই একমাত্র শান্তির পথ। বিবেকানন্দ, পরমহংসদেব, গৌরাঙ্গ, যীশু, বুদ্ধ সকলেই এই বিচার করেছেন — একই conclusion (সিদ্ধান্ত) সকলের।

"তোমরা যে শিক্ষা পাচ্ছ তা কে দিচ্ছে — যারা শান্তির কাছ দিয়েও যায় নাই? তুমি যদি বিয়ে না করতে চাও, ডাক্তার বলবে বিয়ে কর। বাপ-মাও জোর করবে। তারা এই এক আশ্রমের খবরই জানে। উপরের গুলির সংবাদ নাই। Eunuch-ও (নপুংসক) বলবে বিয়ে কর। বিয়ে, সন্তান উৎপাদন, ধন উপার্জন এতে শান্তি নাই। চোখের সামনেই তো এর পরিণাম দেখছো!

ঈশ্বরের শরণ নিয়ে যা হয় কর বাবা! তা নইলে শান্তি পাবে না। শুধু স্ত্রীপুত্রকন্যা, ধন-জন, নাম-যশ কিছুতেই শান্তি দিতে পারবে না। ধনীর শান্তি নাই। ধনে ভোগ বৃদ্ধি করে। আদর্শ ঈশ্বর — তাঁকে আঁকড়ে ধরে সংসার কর, অর্থ উপার্জন কর, এতে বদ্ধ হবে না! যে বিষ প্রাণ হরণ করত সেই বিষ প্রাণ দান করবে। ক্রমশঃ পরম শান্তি লাভ করতে পারবে।

পরমহংসদেবকে, লোকে বলতো, পাগল। কেন না, তিনি বিয়ে করেছেন কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ করেন নাই। বিবেকানন্দকে ডাক্তার বলেছিল — বিয়ে কর, নইলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমাদেরও পাগল

বলে। ডাক্তাররা বলে, বিয়ে না করলে রোগ হবে। আর জীবনটা নীরবে একা একা কাটবে, বিফলে যাবে। এই সব ডাক্তার! এইসব লোক হচ্ছে তোমাদের উপদেষ্টা! তারা এ শরীরের বাইরে দৃষ্টি দিতে পারে না। এ শরীর যে থাকবে না, এ কথা ভুলে গেছে! যোগীগণ কিন্তু এ শরীরের ভিতরে আরো দু'টি শরীর দেখতে পান — সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর। এই সব উপদেষ্টার পরামর্শে চললে কি দশা হবে জান? — 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ অন্ধকূপে পতন্তি।' — এ দশা হবে! অন্ধ ও অন্ধচালক দু'জনেই প্রাণ হারাবে কূয়াতে পড়ে। ইউনিভার্সিটিও ঠিক শিক্ষা দিতে পারে না। কতকগুলি information (সংবাদ) জানার নাম শিক্ষা নয়। এতে চরিত্র গঠিত হয় না। চরিত্র গঠনের শিক্ষা হবে practical (হাতে কলমে)। মাথা ও হাত একসঙ্গে কাজ করবে। তবেই শিক্ষা হবে জীবনপ্রদ।

"অসংযমী, কামুক, বিষয়তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে এই সব ঈশ্বরীয় কথা বল, সে বলবে তুমি পাগল হয়েছ। তার ধারণা নাই যে, বিষয়-ভোগের উপরও ভাল জিনিস আছে। শাশ্বত সুখ, শাশ্বত শান্তি ব্রহ্মানন্দের সংবাদ সে পায় নাই। তাই বলে পাগল। বিষয়তৃষ্ণা থেকে কাম ক্রোধ লোভ হয়, নাম যশের আকাঙ্ক্ষা হয়; মান অভিমান, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা দ্বেষের উদ্ভব হয়। মনকে বিশ্লেষণ করে দেখ, কোন্ ভাব প্রবল। ঐগুলি নির্জনে বসে দমন করতে চেষ্টা কর, অভ্যাস কর। সংসারী লোকও এইরূপ বিচার ও অভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানলাভ করতে পারে, আর এই সংসারকে 'মজার কুঠী' করে তুলতে পারে। সংসার কি তিনি ছাড়া? তাঁতে মন রেখে সংসার কর।

"আমরা দেখেছি — গুহাতে বসেও যা, বনে জঙ্গলে বসেও তা, আবার রাজপ্রাসাদে বসেও তা — সর্বত্রই শান্তি। তিব্বতে গিয়েও দেখেছি ঐ শান্তি, আমেরিকায় থেকেও ঐ, কানাডা ও ইউরোপেও সেই শান্তি। সর্বত্রই শান্তি। তাই পরমহংসদেব বলতেন, 'যার এখানে আছে তার সেখানেও আছে। যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই।' তিনি বলেছিলেন, 'বৃন্দাবনে গিয়ে দেখলাম সেই তেঁতুল গাছ, সেই

সব, তবে আমার দক্ষিণেশ্বরই ভাল।' তারপর আর কোথাও যান নাই। ভিতরে শান্তি স্থাপিত হলে যেখানে থাক শান্তি। আমি যে এতকাল পরে এসে এ দেশে এখন আছি এতেও শান্তি। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে দেখে এলাম সর্বত্রই ঐ কথা — শান্তি সর্বত্র।

"তোমাদের হবে এই শান্তিলাভ। মনকে জয় করার চেষ্টা কর। কাজে লেগে যাও, ক্রমশঃ special (বিশেষ ধরনের) উপদেশ দেওয়া যাবে। সকালে আধ ঘন্টা আর রাত্রিতে আধ ঘন্টা অভ্যাস কর দেখি। রাত্রে শোবার সময় এসব বিচার করে শোবে। মন বড় চঞ্চল। একে বশ করতে হলে খুব খাটতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলেছিলেন, অভ্যাস আর বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশীভূত কর। একটু একটু করে রোজ করলে, শেষে দেখতে পাবে অনেক হয়ে গেছে! লেগে যাও — কথা কইয়ো না আর, কাজে লাগো — অভ্যাস আর প্রার্থনা। নির্জনে গিয়ে মাঝে মাঝে একলা বসবে। নিত্যও অভ্যাসের সময় একা বসবে। পাঁচজনের সঙ্গে বসলে তাদের রং-এ রঙ্গে যাবে। হিন্দুরা ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যাস শিক্ষা দিত পূর্বে। ছোট ছেলেকে গায়ত্রী দিয়ে দিল — পাঁচ-সাত বছরের শিশু। বসে রোজ তিনবার অভ্যাস করতো। এসব ভুলে গেছে এখন, কে করাবে? বাপ জানে না — অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। স্কুল-কলেজেও তাই সেই শিক্ষা। একা বসে তাই পুনরায় অভ্যাস আরম্ভ কর। সংসর্গ রং। তুমি সাধু, চোর, মাতাল — যে সংসর্গে থাকবে সেই সব বৃত্তি তোমাতে আসবে। পরমহংসদেব বলতেন, মন যেন ধোপা-ঘরের কাপড় — লাল, কাল, সাদা, হলদে যে রঙ্গে রঙ্গাও তাই হবে। একলা শোবে, তখন মন জয়ের চেষ্টা করবে। মন গড়, জুয়াচোর হয়ো না। মন মুখ এক কর। স্বরাজ চাও তাও আসবে। স্বরাজলাভ তো last thing (শেষ কথা)। মন তৈরী কর আগে। চরিত্রই আসল জিনিস। এটা সঙ্গে যাবে জন্মজন্মান্তর। নামযশ, স্ত্রীপুত্র, টাকাকড়ি সব পড়ে থাকবে। 'চরিত্র' — এই অমূল্য বস্তুটি তৈরী কর।"

২

প্রশ্ন — ঈশ্বর কেন পাপ-পুণ্য সৃষ্টি করলেন?

উত্তর — "তিনি করেন নি। আমরা করেছি। আমরা হিন্দুরা পাপ-পূণ্যের সৃষ্টিকর্তা। আমি নিজে এই কথা মানি। নিজের ভালমন্দ সংস্কার থেকে এই পাপ-পুণ্যের সৃষ্টি হয়। অজ্ঞান থেকে যে কাজ হয়, যা ঈশ্বরকে দূরে রাখে তাই পাপ। যা ঈশ্বরকে নিকটে এনে দেয় তা পূণ্য।

Evolution Theory (ক্রমবিকাশবাদ) অনুসারে প্রথম অবস্থা mineral (খনিজ বস্তু), তারপর বৃক্ষ, জন্তু, মানুষ — পর পর হয়। মানুষে অজ্ঞান, তারপর জ্ঞান। সর্বশেষ দেবত্ব, man-God. বুদ্ধদেব কোন্ জন্মে কি হয়েছিলেন, সে সব 'জাতকে' আছে। পশু, পক্ষী কত কি হওয়ার পর বুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমি অনেকবার জন্মগ্রহণ করেছি। এই ভাবে চলতে চলতে, জন্মের পর জন্ম, শেষে পরমহংসদেব হয়। পরমহংস হলে বুড়ি-ছোঁয়া হয়ে গেল। তাঁর আর খেলা চলবে না। কাজ শেষ হয়ে গেল, এখন দেবতা স্বয়ং। বিড়াল, কুকুর, সব জীবকেই একদিন এইরূপ দেবত্বলাভ করতে হবে। এরই নাম মুক্তি — এরই নাম স্বরাজ লাভ।"

শ্রীম — আজের কথায় অভ্যাসের কথা বেশ বলেছেন। অভ্যাস মানে পুনঃ পুনঃ একটা জিনিস চিন্তা করা। এরই নাম তপস্যা। মন যাচ্ছে বিষয়ে, সংসার-ভোগে, অশান্ত ছেলের মত। তাকে এনে ঘরে বসানো। কখনও ভালবেসে, কখনও বুঝিয়ে, কখনও মেরে, যেমন মায়েরা করে ছেলেদের। ঘর মানে তাঁর পাদপদ্ম। এ খুব চমৎকার কথা আর প্রার্থনা। এ'দুটিই উত্তম কথা। পালন করলে বেঁচে যাবে। প্রার্থনা করতে হয়, প্রভু আমার সুমতি দাও — তোমার পাদপদ্মে মন রাখো। ঠাকুর বলতেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'। আর সৎসঙ্গ। অভ্যাস, প্রার্থনা ও সৎসঙ্গ — এ সব অমূল্য কথা! সঙ্গের দোষগুণ ধরে যায়, তাই সৎসঙ্গ। সঙ্গদোষে ভারতবর্ষ কত নেমে গিছলো, আবার উঠছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর আসার পূর্বে কত lower

(নিম্নতর) হয়ে গিছলো আমাদের ideal (আদর্শ)। সকলে ভাবতে আরম্ভ করলো — সাহেবিয়ানা করাই জীবনের উদ্দেশ্য। অতবড় লোক বিদ্যেসাগর মশায় — তিনিও সঙ্গদোষে পড়ে গেলেন। এতে তো আর তাঁর দোষ নেই। সঙ্গের প্রভাব লাগবেই — যে সঙ্গে, যে environment-এ (আবেষ্টনীতে) থাকতেন, তার দোষ। তখন এ দেশে সাহেবরা সব নূতন এসেছে। সকলেই ধরে নিলে, এদের সবই ভাল। আচ্ছা, কত অধঃপাতে গিছলো দেশ। এখন আবার সব ফিরে আসছে। বিদ্যেসাগর মশায়ের 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী' ঐ ভাবের লেখায় পূর্ণ। ইংরেজদের life (জীবনী) বাংলায় অনুবাদ করেছেন ঐ বইতে। ওতে আছে কি? না, অমুক ব্যক্তি খুব গরীব, নানা কাণ্ড করে পড়ে প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন। রোভারের (Rover's) জীবনী আছে। ইনি খুব গরীব। পয়সা নাই পড়বার। বনে গেলেন, আর কাঠবিড়াল মারতে আরম্ভ করলেন। কত রক্তারক্তি। তারপর ঐ সব বিড়ালের ছাল এনে বাজারে বিক্রী করে, ঐ অর্থে পড়ার খরচ চালাতে লাগলেন। আহা, কি আদর্শের গল্প এ সব — মহা নিষ্ঠুর গল্প! আর ঠাকুর কি বললেন? 'ঝাঁটা মারি লোকমান্যে।' ওরা নাম যশ চায়, ঐ আদর্শ। কিন্তু তিনি তা'তে ঝাঁটা মারলেন। হীন বস্তু এ সব, এই কথা বললেন। আদর্শ — ভগবানলাভ।

পাশ্চাত্ত্যের কাছে আদর্শের দিক দিয়ে দেবার কিই বা আছে? ওদের life-এর (জীবনের) ambition (আকাঙ্ক্ষা) socialism (সমাজতন্ত্র বোধ), নয় তো politics (রাজনীতি)। বায়স্কোপ, থিয়েটার, নভেল, ডিনার, ড্রেস, টয়লেট — এই সব নিয়ে আছে। আর মেয়েদের সঙ্গে বসে গানবাজনা — যে মেয়েদের সংস্পর্শে লোক সংসারী হয় তাদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা, গানবাজনা। এই তো এদের ideal (আদর্শ)! আমাদের দেশের ছোকরারাও তাই করতে শুরু করে দিয়েছে। এ সব দেখেশুনে পরে সংসারী হবার ইচ্ছা বাড়িয়ে দিচ্ছে। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা — ঈশ্বরলাভ, এ সব ভুলে যাচ্ছে। ওদের দেশের সায়েন্স — এ ভাল, কিন্তু এর প্রয়োগ না জানায় ওদের ভোগী করে তুলছে — আর ঐ সব দিয়ে অপর

জাতকে, দুর্বলকে অত্যাচার করছে। কিন্তু জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য — ক্রমে ক্রমে, শেষে জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করা। কিন্তু তা হচ্ছে কই, উল্টো দিকে যাচ্ছে। অন্ধ অন্ধকে চালালে 'দুয়েরই ধ্বংস। ঋষিরা জানতেন, ঈশ্বরলাভ জীবনের উদ্দেশ্য। তাই এদেশ ঐ ভাবে তৈরী করে গেছেন। পড়ে গিছলো ভারতবর্ষ, আবার উঠছে। কেউ রুখতে পারবে না। জগতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে। ঠাকুর এসেছেনই এই জন্য, তিনি তাই বলতেন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস। গুরু মানে ঈশ্বর, অবতার, ঋষি — এঁদের বাক্য। গুরুবাক্য শুনলে অধঃপাতও ঘুচবে, ভয়ও যাবে।

শ্রীম মৌন, কিছুকাল পর কথা কহিলেন।

শ্রীম (বীরেনের প্রতি) — সংসারীরা কি নিয়ে আছে? চারদিকে feeder (ভোগ্যবস্তু) সব। মন যদি বা একটু স্থির হলো কষ্ট করে, অমনি চারদিক থেকে stimuli (প্ররোচনা) আসতে লাগলো। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, যেটায় জল রইলো তার পাশ দিয়ে নদী-টদী যাচ্ছে। তা থেকে জল চুঁইয়ে আসছে। মাঠে দুটো গর্তের একটাতে জল আছে, অন্যটাতে নাই দেখে এই কথা বলেছিলেন, সংসারীদের এই অবস্থা। একটু যেই শুকাল অমনি আবার বাসনা এসে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আহারও (ইন্দ্রিয়ের) মিলে গেল। তাই নির্জনে গিয়ে, আগে মাখন তুলে আসতে হয়। তপস্যা করে, উদ্দেশ্য — 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ' — এই কথা বুঝে এসে সংসার কর, তাতে অত ক্ষতি হবে না।

শ্রীম (বিরিঞ্চির প্রতি) — আমাদের কি সহজে চৈতন্য হয়? দেখুন না, জাপানে কি মহাকাণ্ড হয়ে গেল। একেবারে পাঁচ লক্ষ লোকের প্রাণ গেল। এ সব তিনি কেন করাচ্ছেন? আমাদের শিক্ষার জন্য। সংসারী, একটি ছেলের জন্য কত শোক করে, আর এত লোক একসঙ্গে গেল। এতিমখানা থেকেও কত বড় কাণ্ড। সেখানে ৪৩টি শিশুর প্রাণ গেল। জাপানে তার চাইতেও কত বড় কাণ্ড হলো। তিনি সাবধান করে দিচ্ছেন, নিচে volcano (আগ্নেয় পর্বত) আছে। লোক শুনছে না, তাই বিনাশ হচ্ছে। কত বার হয়েছে জাপানে

ঐরূপ, তবুও শোনে কই লোক? চৈতন্য হয় কই লোকের? অধর সেনকে ঘোড়ায় চড়তে বারণ করেছিলেন ঠাকুর — প্রথমবার যখন ঘোড়া থেকে পড়ে যান। কিন্তু শুনলেন না। দ্বিতীয় বার ঘোড়া থেকে পড়ে শরীর গেল। ঠাকুর তখন বলেছিলেন, 'মা বার বার বলে না। মাঝে মাঝে warn (সাবধান) করেন।' চৈতন্য না হলে, মৃত্যু নিশ্চয়।

কলিকাতা ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ। ১৯শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল, বুধবার।

৩

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের পশ্চিমের ঘর। শরৎকাল, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার ধ্যান ও তৎপর গান হইয়া গিয়াছে। এখন শ্রীম 'কথামৃত' হইতে ঠাকুরের একটি লীলার ছবি পড়িয়া ভক্তদের শুনাইতেছেন।

শ্রীম পড়িতেছেন — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন সেবার পর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। ...তখন জ্ঞানবাবু আসিলেন — চারটে পাশ, সরকারী কাজ করেন দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করিবেন কিনা ভাবিতেছেন, প্রথম পক্ষ গত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জ্ঞান দৃষ্টে) — কি গো হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়।... (সহাস্যে) তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? ও বুঝেছি, যেখানে জ্ঞান সেখানেই অজ্ঞান। বশিষ্ঠদেব অত জ্ঞানী, পুত্রশোকে কেঁদেছিলেন। তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও।... (পণ্ডিত শশধরকে) দেখলাম — একঘেয়ে, কেবল শুষ্ক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে।... শুধু শুষ্ক জ্ঞান! ও যেন ভস্-করে-ওঠা তুবড়ী — খানিকটা ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়।...

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এটি চতুর্থ চিত্র। এর পূর্বে তিনটি হয়ে গেছে। ঠাকুর বললেন, জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? মানে, একবার বিয়ে করে দেখেছে সুখ থেকে দুঃখ বেশী। শোক হয়েছে প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ায়। আবার জেনেশুনে ঐতে যাবার চেষ্টা করছে। তাই ঠাকুর

এ কথা বললেন। Indirectly suggest (পরোক্ষভাবে বলছেন) করছেন আর বিয়ে না করে। যে মন ভগবানের পাদপদ্মে দেবে সে মন অন্য বিষয়ে চলে যাবে। সাহসও দিচ্ছেন, আবার দোষের কথাও দেখিয়ে দিচ্ছেন। সাহস— শুভ সংস্কার আছে, নচেৎ ঠাকুরের দর্শনলাভ হতো না। তাই বলেছেন, 'তুমি জ্ঞান।' আর 'অজ্ঞান' — মানে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করছে বিয়ে করে। সংস্কার প্রবল — টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর পড়াশোনার জ্ঞান, বুদ্ধিজ্ঞান এ সব দুর্বল, তাও বলে দিচ্ছেন শশধরের নাম করে। 'ভস্‌-করা তুবড়ী' — মানে ভিতরে প্রবল শক্তি নাই। জ্ঞানের প্রবাহ uniform (এক রকম) নয়। কারণ এ যে বই-পড়া জ্ঞান! ভগবানের কাছ থেকে যে জ্ঞান আসে — তিনি নিজে রাশ ঠেলে দেন সে জ্ঞানের। তাই সরস হয় — আর অফুরন্ত। সে যেন একটানা ফুল-কাটা তুবড়ী — ভস করে না — কথায় বা ব্যবহারে বেতাল হয় না। দম দেওয়া খুব — তাই একটানা জ্ঞান। ওকে বিজ্ঞানীর অবস্থা বলে — ব্রহ্মজ্ঞানের পর হয় — চৈতন্যদেব, ঠাকুর এঁদের এই অবস্থা।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — পূর্বের scenes (দৃশ্য)-তিনটি সংক্ষেপে বলুন না।

ভক্ত — প্রথম চিত্র, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঠাকুরঘরে। সন্ধ্যার পর বলছেন, যে সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করে তার সন্ধ্যার দরকার হয় না। ঋষিকেশে একটি সাধু ঝরনার পাশে দাঁড়িয়ে সারা দিন বলতো — 'বা, বেশ করেছ'। দ্বিতীয় চিত্র — ঠাকুর পঞ্চবটী থেকে ঘরে আসছেন। আকাশে ঠাকুরের পিছনে নবীন মেঘ — তার প্রতিবিম্ব গঙ্গায় পড়েছে — মেঘ যেন চালচিত্র। তৃতীয়, বলরামের বৈঠকখানা — বলরামের পিতাকে বলছেন, 'যে সমন্বয় করেছে সে-ই লোক'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ধ্যান তিন রকমের হয়। রূপ-চিন্তা, লীলা-চিন্তা ও মহাবাক্য-চিন্তা। এই চিত্রগুলি লীলা-চিন্তা — সঙ্গে রূপও আছে বাক্যও আছে। এ ভাবে সহজ হয়। (সহাস্যে) বৈষ্ণবরা নাকি একঘেয়ে — তাই বলরামবাবুর পিতাকে বলছেন, 'অনেকেই একঘেয়ে'। ঠাকুর এটি পছন্দ করতেন না। তিনি এসেছেন জগতের

লোককে একসঙ্গে মেলাতে, কি করে একঘেয়ে ভাল লাগবে? নিরক্ষর লোক, কিন্তু কি উদার! তাঁর কাছে হিন্দু, মসুলমান, খ্রীস্টান, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোকেরা যাচ্ছে। সকলকেই গ্রহণ করছেন। তাঁর নানা ধর্মসাধনই এই জন্য — জানতেন, জগৎ একটা পরিবারের মত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের প্রভাবে যাতায়াতের সুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এখন একঘেয়ের স্থান নেই। কত আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন, জগৎ একসঙ্গে মিলছে। তাঁর এই উদার ভাবই সবাইকে একসঙ্গে মেলাবে। এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, কত দেশের লোক তাঁর ভাব গ্রহণ করছে।

কিছুক্ষণ পর ভাগবত পাঠ হইতেছে। জগবন্ধু পড়িতেছেন।

পাঠক (পড়িতেছেন) — শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন — 'হে পার্থ, যে ব্রাহ্মণাধম রজনীতে নিদ্রিত নিরপরাধ বালকদিগকে বধ করিয়াছে তাহার প্রাণ বধ কর। এরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা বিধেয় নহে। যিনি যুদ্ধধর্ম অবগত আছেন, তিনি কখনও মদ্যাদি পানে মত্ত, অসাবধান, সুরাপানাদি দ্বারা উন্মত্ত, নিদ্রিত, বালক, স্ত্রী, উদ্যমহীন, শরণাগত, রথহীন ও ভীত রিপুকে বধ করেন না। যে নির্দয় খল ব্যক্তি পরের প্রাণহানি দ্বারা আত্মপ্রাণের পুষ্টিসাধন করে, তাহার প্রাণদণ্ড করিলে তাহারই কল্যাণ হয়। কারণ, দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দোষ স্খালন না করিলে অপরাধীর অধোগতি হইয়া থাকে। অতএব এই পাপিষ্ঠ স্বজন-ঘাতককে বধ কর।'

শ্রীম — পূর্বে এই সব 'যুদ্ধধর্ম' মানতো। এখন তা হয় না। হাসপাতালেই হয়তো বোমা ফেলে দিল। এই সব পালন করে সেই সমাজ, যে সমাজের আদর্শ ঈশ্বরলাভ। ভারতবর্ষ এইরূপ দেশ — নেমে গেছে, আবার উঠছে — খুব উঁচুতে উঠবে। ঠাকুরের আসা এইজন্য।

পাঠক — অশ্বত্থামাকে বন্ধন করিয়া দ্রৌপদীর সম্মুখে লইয়া আসিয়াছেন। দ্রৌপদী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ইঁহাকে শীঘ্র মুক্ত কর। যে গুরুকুল সতত বন্দনীয় তাহা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইবে, উহা অনুচিত। আমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিরন্তর অবিরলধারে

ক্রন্দন করিতেছি, সেইরূপ ইঁহার মাতা গৌতমীকে যেন ঐরূপ পুত্রশোকে অশ্রু বিসর্জন করিতে না হয়।

শ্রীম — দেখুন, পাঁচ পুত্র গেছে, অত শোক, কিন্তু তাতেও ধর্মটি ছাড়েন নাই। ভারতেই এ সব সম্ভব। নিজের সর্বনাশ হয়ে গেছে — সেদিকে তত লক্ষ্য নেই — লক্ষ্য হয়েছেন গৌতমী। তাঁর যেন এ শোকানলে পতিত না হতে হয়, সেই ভাবনা। এরই নাম দৈবীভাব। কি heroism (বীরত্ব) মেয়ে হয়ে! যেখানে নিজের interest (স্বার্থ) পরে, অপরের interest (স্বার্থ) আগে দেখে, সেখানেই দৈবীভাব। মানে, ভগবানের অধিষ্ঠান। তার উল্টো হলো পশুভাব, মনুষ্যভাব। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে আছেন কি না, তাই এই উচ্চ আদর্শ। জগতে এ জিনিস দুর্লভ। দ্রৌপদীর এই মহান বাক্য শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হাঁ, গুরুপুত্র অবধ্য।' প্রাণঘাতক বধ্য কিন্তু গুরুপুত্ররূপে অবধ্য। তাই যাতে উভয় দিক রক্ষা হয় — অপরাধীর শাস্তিও হয় আর প্রাণেও না মরে — শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জুন মাথার মণি ছেদন করে, অশ্বত্থামাকে দেশ হতে বিতাড়িত করে দিলেন। শিখায় হয়তো মণি বাঁধা ছিল — তাই কেটে দিলে। উহা মৃত্যুতুল্য অপমান। তাই বুঝি পশ্চিমের লোকেরা শিখা ছুঁতে দেয় না।

শ্রীম (অমৃতের প্রতি) — অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী — এঁদের একাধিক পতি ছিল, তবুও তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া। কেন তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া — একজন সাধুকে আমরা এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, ওঁরা যে ভক্ত!

জগবন্ধু — ভক্ত কি আর ছিল না যে তাঁদের নাম নিতে হবে? তাঁরা একসঙ্গে ভক্ত ও দ্বিচারিণী ছিলেন, না পরে ভক্ত হলেন?

শ্রীম — তাঁদের মত case যে আর নেই — ভক্ত ও দ্বিচারিণী। একপতি যাঁদের তাঁরাই সতী। এঁদের একসঙ্গেই ভক্তি ও একাধিক পুরুষে মন ছিল। বলে, দ্রৌপদী কর্ণকেও মনে মনে চেয়েছিলেন। যীশুর শিষ্যা মেরী বেশ্যা ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে saint (সাধু) হয়ে যান। যীশুর দেহত্যাগের পর এই মেরীকেই প্রথম দর্শন দেন। মেরী

ঈশ্বরের জন্য এক ঘটি কেঁদেছিলেন। ঈশ্বর মন দেখেন। তাঁর জন্য যারা এক ঘটি কাঁদে তাদের তিনি কোলে তুলে নেন। তাঁর জন্য সাচ্চা কাঁদা চাই।

শ্রীম — কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গেছে, ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ও পাণ্ডবগণ বসে আছেন। গান্ধারী শোকাতুরা। শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধ দিয়ে বলছেন, 'দেবী, শোক পরিহার করুন। মৃত্যু সকলকেই নিয়ে যাবে — দু'দিন আগে আর পরে। আপনি আত্মচিন্তায় চিত্ত সমাহিত করুন।'

কুরুক্ষেত্রে বুঝি বিশ লাখ লোকক্ষয় হয়। ওটা অনেকদিন হয়েছে তাই মনে তত লাগে না। কিন্তু জাপানে সবেমাত্র পাঁচ লাখ লোক মরে গেল! এককোপে পাঁচ লাখ! কী ভীষণ অবস্থা ঐ দেশের! এতবড় কাণ্ড আর হয় নাই জগতে। ওরা জানে নিচে volcano (আগ্নেয়গিরি) — তবুও রয়েছে, তবে মর।

আমাদের যদি এখান থেকে দেখার দৃষ্টি থাকতো সব দেখতে পেতাম, তখন কি ভীষণ শোক হতো। তা তিনি দেন নাই। মানুষ সংসারে থেকে শক্তিহীন হয়ে রয়েছে বিষয়ে মন দিয়ে, তার উপর আবার বাইরের এ সব শোক দেখলে উপায় ছিল কি? চাচা আপনা বাঁচা। এই জন্য ঈশ্বর দূরের জিনিস দেখবার শক্তি দেন নাই। তিনি কিন্তু সব করতে পারেন। কি অবস্থাটা হতো, ভাবুন দেখি, পৃথিবীর পুত্রশোক-কাতরাদের দেখে! আরো কতরকম শোক হচ্ছে — এই সব দেখে কি অবস্থা হতো! নিজের নিজের কথাই ভাব, তাই অনেক।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'একদিন ধ্যানে দেখলাম, হিমালয়ের মত মড়ার স্তূপ। তার মাঝখানে বসে আছি আমি।' মানে, সমস্তটা সংসারই শ্মশান। সকলের মুখে মৃত্যুর ছাপ লাগানো রয়েছে। তাই মৃত্যুর স্তূপ এই একটি চিত্র যদি কেউ ধ্যান করে, জপ করে, তবে সিদ্ধ হয়ে যায়। চৈতন্য হয় কই?

কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীঃ।
২০শে ভাদ্র ১৩৩০ সাল, বৃহস্পতিবার।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় 'শ্রীম-দর্শন' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগেও আছে পরমহংসদেব ও মায়ের কিছু নূতন কথা, স্বামীজী-প্রমুখ তাঁহাদিগের অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর কথামৃতকার দ্বারা 'কথামৃতে'র ব্যাখ্যা। উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল আদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা।

প্রথম ভাগের পটভূমিকা মিহিজামের অরণ্য। কাননে যেন সিংহ সর্ব বাধা-বিনির্মুক্ত — ইহাই শ্রীম-র স্বরূপ। আনন্দময় ভাবরাজ্যে তিনি বিচরণ করিতেছেন। কখনও নিম্নভূমিতে অবতরণ করিলেও গীতা উপনিষদ্ আদি শাস্ত্রালোচনায় স্বীয় মনবুদ্ধিকে নিযুক্ত রাখিতেছেন।

সাধুব্রহ্মচারীর জীবন-সংগঠনও শ্রীম-র অন্যতম কর্ম মিহিজামে। তাই সেখানে শ্রীম-র আচার্যভাব — সরস সবল ও সুদৃঢ় পুরুষার্থব্যঞ্জক।

কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের পটভূমিকা কলিকাতা মহানগরী। এখানে শ্রীম সকল প্রকার ভক্তগণে পরিবৃত। সাংসারিক সুখদুঃখের আবর্তনে ভক্তগণ অশান্ত। তাহাদের ভাব নিজের উপর আরোপ করিয়া শ্রীম শরণাগত, প্রার্থনাপর — যেন বড় ঘরের পরিচারিকা। দিবানিশি 'কথামৃত' বর্ষণে ম্রিয়মাণ ভক্তগণকে সঞ্জীবিত করিতেছেন। নৈরাশ্যের অগ্নিময় নীড় ভঙ্গ করিয়া সুখশান্তির আনন্দময় ধামে লইয়া যাইতেছেন।

শ্রীম বলিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নরদেহধারী সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি সংসাররূপ জ্বলন্ত অনলে বিদগ্ধ ভক্তগণকে অভয় দিয়া বলিতেছেন,'আমায় ধর', 'আমার ধ্যান করলেই হবে'। আবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞানভক্তি, বিবেকবৈরাগ্য, শান্তিসুখ, প্রেমসমাধি — আমার ঐশ্বর্য।'

শ্রীম ভক্তগণকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন আর ভরসা দিয়া বলিতেছেন, শ্রীভগবান এই সেদিন নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভয় কি? তাঁহার সহিত একটি প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করিয়া সংসারে থাক। পিতা, মাতা, বন্ধু, প্রভু প্রভৃতির একটি অনুকূল সম্পর্ক কল্পনা-দ্বারা নিশ্চয় করিয়া কার্য আরম্ভ কর। পরে এই কল্পনার

সম্পর্কই বাস্তব রূপ ধারণ করিয়া ভক্তের হৃদয়-মন অধিকার করিবে। তখন ভক্ত হইবে দুইটি মানুষ — একটি সাংসারিক জীব, অপরটি চিন্ময় ভগবদংশ। সাংসারিক জীবরূপে সুখদুঃখের নানা আবর্তে পতিত হইয়া যখন নিমজ্জমান হইবে, তখনই ভগবানের সম্পর্কিত অপর চিন্ময়রূপটি জাগ্রত হইয়া এই নিমজ্জমান দুর্বল জীবকেই মহাশক্তিশালী মহাবীররূপে পরিণত করিবে।

শ্রীম-র বারংবার প্রার্থনাসত্ত্বেও শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্দেশে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-কে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সংসারতপ্ত জনগণকে 'ভাগবত' শুনাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীম প্রহ্লাদ-জনকাদির ন্যায় অন্তরে পূর্ণ সন্ন্যাস লাভ করিয়া, সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী যাবৎ শোকতাপহারী 'কথামৃত'-রূপ 'ভাগবত' অহর্নিশ পরিবেশন করিয়াছেন।

দৈবকার্যের জন্য বৈদান্তিক সন্ন্যাস লাভ করিতে না পারিলেও শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তান্ত্রিক সন্ন্যাস লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীম বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর আমাকে ও বাবুরামকে একদিনে পূর্ণাভিষিক্ত করেন।'

বৈদান্তিক সন্ন্যাসের আকাঙ্ক্ষা শ্রীম-র ভিতর সারা জীবন জাগ্রত ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীম তাঁহার কর্মজীবনে চারি-পাঁচবার সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনবৎ কখনও কামারপুকুর, জয়রামবাটি, কখনও পুরী কাশী, কখনও বা হরিদ্বার হৃষিকেশে গিয়া তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছেন। শ্রীম-র মিহিজামের অরণ্যবাসও তাঁহার অন্তর্নিহিত ঐ বৈদান্তিক সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণারই ফল।

শ্রীরামকৃষ্ণই ঈশ্বররূপে জগতের শোকদুঃখের বিধান করিতেছেন। আবার তিনিই অবতাররূপে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিতেছেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ সংসার-দুঃখে জর্জরিত মানবগণ, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' এই চিন্ময় পদবী লাভ করুক, ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

যাহাদের সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে, শ্রীশ্রী ঠাকুর তাঁহাদিগের পরম কল্যাণ করুন, ইহাও গ্রন্থকারের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
হৃষীকেশ (তুলসীমঠ)
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৭০ সাল

বিনীত
নিত্যাত্মানন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার করুণায় শ্রীম-দর্শন ২য় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে যে আজিকার দিনে গৃহী-ভক্তদের জীবনে শ্রীম-র মুখের কথায় ও তাঁহার জীবন-বেদের মাধ্যমে ঠাকুরের কথামৃত শান্তিবারি বর্ষণ করিতেছে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হন ও অনন্ত শান্তি ও সুখের অধিকারী হন।

শ্রীম-দর্শন প্রকাশের জন্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, এম.এ. মহাশয়ের বরাবরই ঐকান্তিক ভগবৎ-সেবার পরিচয় পাইতেছি। ইদানীং তাঁহার কঠিন অসুস্থতার পর তাঁহার একনিষ্ঠ সেবাবৃত্তি অধিকতর বলবতী ও সমুজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা শ্রীশ্রী ঠাকুরের চরণে তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসী মঠ)
হৃষীকেশ, হিমালয়
গঙ্গা-দশহরা, ১৩৭৭ সাল, ১৯৭০ খ্রীঃ

বিনীত
গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীম-দর্শন দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে বোধ হইতেছে, শ্রীম-দর্শনের পাঠকসংখ্যা বাড়িতেছে। শ্রীম-দর্শন-রচয়িতা স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর প্রার্থনা ছিল, এই গ্রন্থ-পাঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সংসারদুঃখে জর্জরিত মানবগণ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' — এই চিন্ময় পদবী লাভ করুক। প্রাণপাত করিয়া স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর এই মহাগ্রন্থমালা ষোড়শ খণ্ডে গ্রথিত করিয়া পাঠকগণকে পরমানন্দ, শান্তি ও মহা সুখলাভে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীম-দর্শনকারের শরীর থাকাকালে চণ্ডীগড়স্থিত ১৯-ডি সেক্টারে শ্রীম ট্রাস্ট দ্বারা একটি স্থায়ী স্থানের জন্য জমি ক্রয় করা হয়। প্রভুর কৃপায় ঐ স্থানে এখন এক ভবন নির্মিত হইয়াছে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পীঠ" নামে। তাঁহার কার্যের প্রচার প্রসার হোক্, জনসাধারণের সেবায় তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করায় আমরা কৃতকার্য হই — ইহাই প্রার্থনা করি।

যে সাধু, মহাত্মা, ভক্ত ও বন্ধু যে-কোনভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট (শ্রীম ট্রাস্ট) বিনীত
৫৭৯, সেক্টাবর ১৮-বি, চণ্ডীগড় **প্রকাশিকা**
বিজয়া দশমী, ১৩৮৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
কলিকাতায় শ্রীম ১
দ্বিতীয় অধ্যায়
অবতার আসেন ভক্তদের কর্ম কমাতে ৮
তৃতীয় অধ্যায়
সরল জীবনযাত্রা ধর্মজীবনের সহায় ১৯
চতুর্থ অধ্যায়
শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ২৯
পঞ্চম অধ্যায়
উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন—দাসীর মত সংসারে থাকা,—উপায় ৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায়
ঠাকুর যা বলেছেন সব মন্ত্র ৫২
সপ্তম অধ্যায়
ক্যাণ্টের 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ৬৩
অষ্টম অধ্যায়
অর্থ থাকলে অর্ধ জীবন্মুক্ত ৭৫
নবম অধ্যায়
এই পাঁকের ভিতর থেকেই পদ্মফুল ফোটে ৮৮
দশম অধ্যায়
'তিনি ইচ্ছা করলে সব উল্টে দিতে পারেন'—কর্মফল ৯৪
একাদশ অধ্যায়
সব চাইতে বড় দান — জ্ঞান ভক্তি প্রেম দান ১১১
দ্বাদশ অধ্যায়
মূল কথা — তাঁর শরণাগত হয়ে সংসারে থাকা ১১৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়
'এই মুখ দিয়া তিনি কথা কন' ১৩০

চতুর্দশ অধ্যায়
উপায় — সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ও প্রার্থনা ১৪১
পঞ্চদশ অধ্যায়
কেশব সেন চিনেছিলেন ঠাকুরকে ১৫০
ষোড়শ অধ্যায়
যাতে বদ্ধ তাতেই মুক্ত, মোড় ফিরিয়ে দিলে ১৬২
সপ্তদশ অধ্যায়
'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে' — হীরা চিনে জহুরী ১৭৬
অষ্টাদশ অধ্যায়
রাম রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম ১৯৩
ঊনবিংশ অধ্যায়
আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান ও ক্রাইষ্ট ২১৫
বিংশ অধ্যায়
'অজ্ঞান'-রোগের হাসপাতাল — মঠ ২২৭
একবিংশ অধ্যায়
ভারত উঠলে জগৎ উঠবে ২৪৭
দ্বাবিংশ অধ্যায়
নিজ দেহ, পরিবার, সমাজ—তিনেতে ঈশ্বরদৃষ্টি চাই ২৫৭
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
যুদ্ধক্ষেত্রে যেন সৈনিক — এমনি ঈশ্বরভক্তি ২৭৪
চতুর্বিংশ অধ্যায়
জগতের মিলনমন্ত্র — শ্রীরামকৃষ্ণের উদার বাণী ২৯০

* * *

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তাকে লিখিত শ্রীম-দর্শনের গ্রন্থকার স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর পত্র (মূল হিন্দী পত্রের বঙ্গানুবাদ)

শুভাশীর্বাদ

পরমকল্যানীয়া শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা,

দেবী, দেবার্চনার অর্ঘস্বরূপ আপনার কৃত 'শ্রীম-দর্শন'-এর (প্রথম ভাগ) হিন্দী অনুবাদ একাধারে অতি সুন্দর, সরল, সাবলীল, প্রাঞ্জল, ভাব-ব্যঞ্জক এবং মূল রচনার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ।

অনুবাদকার্য স্বভাবতঃই নীরস। কিন্তু গ্রন্থের মূল বিষয়-বস্তুর সহিত আপনার একাত্মতা-হেতু এই অনুবাদ অতিশয় সরস ও সুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে।

ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় বৈদান্তিক এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ অতি সুকঠিন কার্য।

'শ্রীম-দর্শন'-এর মূল বিষয়বস্তু ঃ সুখ-দুঃখময় এই সংসারে কি করিয়া বেদবর্ণিত দেব-জীবন লাভ সম্ভব, তাহারই পথ-নির্দেশ।

বেদ-মূর্তি যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষায় বর্তমান জড়-সভ্যতার যুগে আচার্য শ্রীম বনের বেদান্তকে ঘরে আনিয়া মূর্ত করিয়াছিলেন আপনার জীবনে — এই ঊনবিংশ-বিংশ শতকে, ঠিক যেরূপ মূর্ত হইয়াছিল বৈদিকযুগে - তপোবনে ঋষিগণের জীবনে।

'শ্রীম-দর্শন' মহর্ষি শ্রীম-র জীবনের একটি জীবন্ত আলেখ্য, আবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রকাশকও। বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত যুগে, শ্রীম কথিত এই প্রামাণিক মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের মনোমুগ্ধকর সজীব বিস্তৃত বিবরণ ও সটীক ভাষ্য।

আপনি এই পরম আকর্ষণীয় মহাগ্রন্থ (হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া) হিন্দী ভাষাভাষী ভক্তগণের কর-কমলে পরিবেশন করিয়া এক সুমহান জ্ঞান-যজ্ঞ সাধন করিয়াছেন।

দেবী, আপনার এই মহৎ প্রচেষ্টা দেখিয়া স্বতঃই মনে উদয় হইতেছে যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক বিনীত প্রার্থনা — তিনি তাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আপনার দ্বারা 'শ্রীম-দর্শন'-এর অবশিষ্ট সকল ভাগও এইরূপ সরল, সুমিষ্ট, হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ করাইয়া লউন।

ইহাদ্বারা আপনার জীবন হইবে অধিকতর ধন্য ও মধুময় এবং সমাজ-জীবন হইবে অধিকতর উন্নত ও দেবভাব-মণ্ডিত। ইতি,

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ঋষিকেশ, হিমালয়। শুভানুধ্যায়ী
দুর্গা-নবরাত্রি, ১৯৬৫ (ইং)। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
(১৮৩৬ - ১৮৮৬)

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

শ্রীম – দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(দ্বিতীয় ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট

৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

পঞ্চম সংস্করণ
ফলহারিণী কালিকাপূজা
কৃষ্ণা চতুর্দশী, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
(২৩শে মে, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬ /৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ
(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)
(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial
(৫) A Short Life of Sri "M"
(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)
(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
Sri Ma Trust
Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
R-899, New Rajendra Nagar
New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীম - দর্শন ❁ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

৮

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ
(কালী মহারাজ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদপুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।